আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা

আফগানিস্তান হতে আমেরিকা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

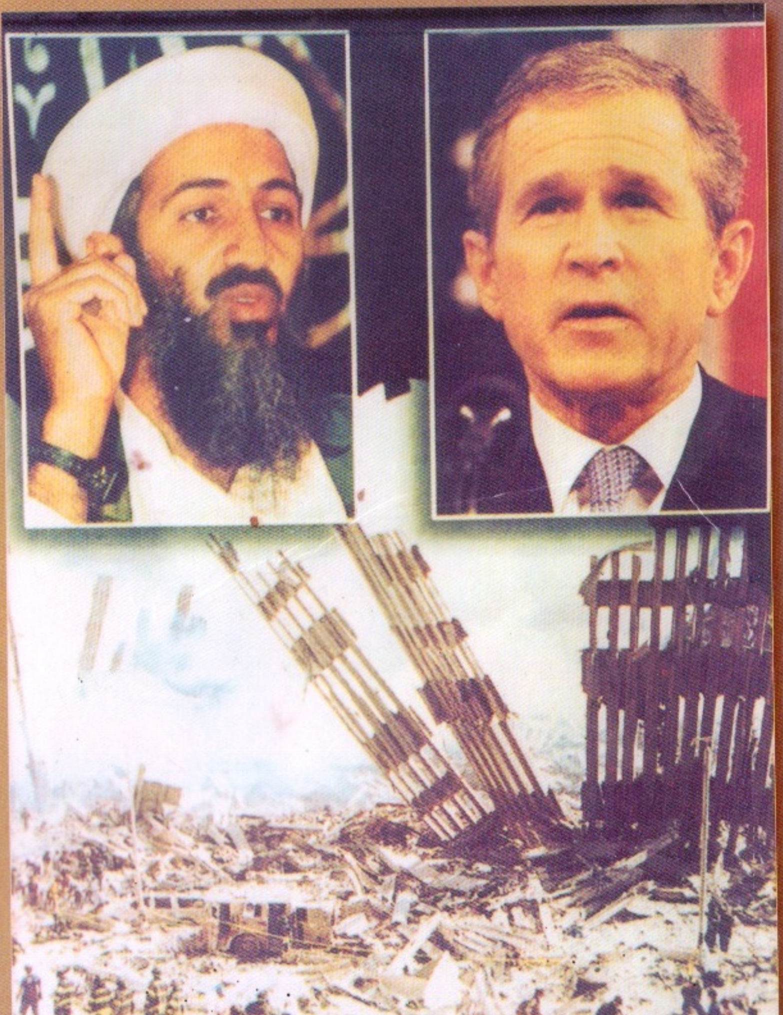

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা

আফগানিস্তান হতে আমেরিকা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

পালক পাবলিশার্স

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ
বি এ অনার্স, এম এ
স্বত্বাধিকারী - পালক পাবলিশার্স
৮/২ নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
জি পি ও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা- ১০০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪০৮
ফেব্রুয়ারী ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদের ছবি
ইন্ডিয়া টুডে'র সৌজন্যে

মুদ্রণ
প্রিন্ট এইড লিঃ
২৮/এ-২/১ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড
ফকিরেরপুল, ঢাকা - ১০০০

মূল্য ঃ দুই শত পঁচিশ টাকা

ANTARJARTIC SANTRASHER ETIKHATA : AFGHANISTHAN HOTE AMERICA [A book of International Violence] By Brig. General M. shakhawat Hossain (Rtd.). Fisrt Edition February 2002. Published by Forkan Ahmad Proprietor- Palok Publishers. 8/2 North South Road, Purana Paltan, GPO Box No. 415 Dhaka-1000, Bangladesh. Price Taka 225.00, US $ 10.00

SBN-984-445-132-09

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার পরিবারের সদস্যদেরকে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমার কথা

সেপ্টেম্বর ১১,২০০১, আমেরিকায় নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের জোড়া টাওয়ারে (Twin Tower) এবং রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সদর পেন্টাগনে ছিনতাইকৃত তিনটি যাত্রীবাহী বিমান দিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালনো হয়। এ অকল্পনীয় হামলায় প্রায় আশিটি দেশের নাগরিক নিহত হওয়া ছাড়াও অনেকে এখনও নিরুদ্দেশ রয়েছে। ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্ক মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার আটশত লোক মারা গিয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বাকীদের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি বিধায় তাদেরকেও মৃত বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। এটা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসের নজির বিহীন ঘটনা। বিশ্বব্যাপী এ হামলার নিন্দা হয়েছে। আমরাও এ ধরনের নৃশংসতার নিন্দা করি। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এ ধরনের ঘটনার নিন্দা না করে পারে না। তবে এর পরের ঘটনাগুলো নিয়ে অনেক দ্বিমত থাকতে পারে।

হামলার মাত্র একদিনের মধ্যেই হামলাকারীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে প্রায় সবাইকেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান বলেই সনাক্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, এ সন্ত্রাসের সূত্র ধরে বর্তমানে বিশ্বের একনম্বর সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত ওসামা বিন লাদেন এবং তার উগ্রবাদী সংগঠন আল-কায়দা দায়ী বলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ পৃথিবীকে স্বোচ্চার ভাষায় জানিয়ে দেয়। এর প্রেক্ষিতেই আফগানিস্তানে বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার সূচনা হয়।

আমার এক্ষুদ্র প্রয়াস এঘটনাকে কেন্দ্র করেই। আমি চেষ্টা করেছি আফগানিস্তানের অতীতের পটভূমিতে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দার বিশ্বব্যাপী তৎপরতা তুলে ধরতে। সোভিয়েত বিরোধী আফগানদের সশস্ত্র প্রতিরোধ, সে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং সে যুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি বিশেষ করে আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মত দুটি পরাশক্তির শক্তি পরীক্ষার ঘটনা। আরও তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা এবং CIA এর ভূমিকা। সে সাথে থাকছে পাকিস্তানের ISI এবং সরকারের সমর্থন ইত্যাদি। এ যুদ্ধ থেকেই পরবর্তীতে ইসলামিক জেহাদের প্রসার ঘটে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আর জেহাদের টার্গেট হয় খোদ আমেরিকা।

এসব আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক পেছনের ইতিহাসের, কিছু

www.nagorikpathagar.org

কিছু ঐতিহাসিক স্থানের এবং পূর্বতন ঘটনার বিবরণ দিতে হয়েছে। বিবরণগুলোর সিংহভাগই প্রাপ্ত তথ্য থেকে। আমি চেষ্টা করেছি প্রয়োজনবোধে তথ্যের উৎসও দিতে তবে সবসময়ই তা সম্ভব হয় নি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু মন্তব্য দিতেও চেষ্টা করেছি।

এর অনেক তথ্যের খোঁজ আমাকে সুদূর পেশাওয়ারের কিছু উপজাতীয় এলাকায় যেতে হয়েছে। সে সাথে কয়েকটি শরণার্থী শিবীরে আফগান শরণার্থীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্থান থেকে দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলো যোগাড় করতে হয়েছে। এসব ছবি দিয়ে আমাকে যারা সাহায্য করেছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এ লেখায় তথ্যগুলো সঠিক রেখে কিছু কিছু জায়গার বিবরণকে পুনঃগঠিত করতে গিয়ে কিছু ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়েছে তবে কোথাও অতিরঞ্জিত করা হয় নি। পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য করবার প্রচেষ্টায় আমি লেখক হিসেবে এটুকু স্বাধীনতা নিয়েছি।

আমি আশা করব যে, আমার মত অনেকেই বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন কারণে আফগানিস্তানের মত গরীব দেশের মুসলিম জনগণের ভোগান্তির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছে। আফগানিস্তানের অতীতের পরিস্থিতিও যেমন সাধারণ আফগানদের স্ব-ইচ্ছায় তৈরী হয় নি তেমনি হয়ত ভবিষ্যতের পরিস্থিতিও হবেনা। আমরা আশা করি এবার হয়ত বহিঃবিশ্ব আফগানদের এবং এ বিধ্বস্ত জনপদকে পুনরায় গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

আমি এ লেখায় সাহায্য করবার জন্যে আমার সহধর্মিনী ডা. রেহানা খানমের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি পালক পাবলিশার্স এবং এর স্বত্বাধিকারী জনাব ফোরকান আহমদকে বিশেষ করে পাঠকদের একটি সুন্দর পুস্তক উপহার দেয়ার জন্যে।
আশা করি আমার এ প্রয়াস অন্ততঃ কিছুসংখ্যক পাঠককের ভাল লাগবে।

ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.)
ঢাকা
ফোনঃ ৯৮৮২১৯৯

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে বর্তমান বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলায় বহু লোক নিহত হয়। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ধুলার সাথে মিশে যায় আর আমেরিকার প্রতিরক্ষা সদর পেন্টাগন হয় ক্ষতবিক্ষত। এই সন্ত্রাসী হামলা যারা করেছে তাদের এই জঘন্য কর্মকে সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে। আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্ব এই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করেছে ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল-কায়দাকে। এদেরকে আফগানিস্তানে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়া এবং ওসামাকে বিচারের জন্য আমেরিকার কাছে হস্তান্তর না করায় সে দেশের উপর নেমে আসে আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের রোষ। শুধু এই একটি কারণেই কি আমেরিকা আফগানিস্তানে বোমা হামলা চালিয়েছে, নাকি এর পিছনে আরও কারণ আছে?

আফগানিস্তানের মত একটি দরিদ্র ও পশ্চাদপদ প্রাচীন জনপদ আমেরিকার রুদ্র রোষ থেকে রক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন? মধ্যপ্রাচ্যের তেল দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে। এ জন্য কি আমেরিকা নতুন তেল-গ্যাসের সন্ধানে এবং কৌশলগত কারণে মধ্য এশীয় অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে? পাকিস্তান ও ভারত কেন আমেরিকাকে সব ধরনের সাহায়তার জন্য দুয়ার খোলার ঘোষণা দিল? কাশ্মীর, চেচনিয়ার ও ফিলিস্তিনী স্বাধীকারের দাবী কি এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আফগান সীমান্তে উইগুড় প্রদেশের মুসলমানদের দাবী বন্ধ করতে চীনের কি উপকার হবে? আফগানিস্তানের তালেবান সরকার পতনে রাশিয়ার ভূমিকা কি? আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কিভাবে ফিরে আসতে পারে? তালেবান কারা, তালেবানদের উত্থান কিভাবে হলো, মোল্লা ওমর কে, ওসামা বিন লাদেনের সাথে ওমরের কিসের এতো দহরম মহরম ছিল যার জন্য একটি দেশকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত হতে হলো, তালেবানদের এমন কি মন্ত্র জানা ছিল যার জন্য দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভূ-ভাগ শাসন করতে পারলো, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকেরা কিভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, তালেবান সাম্রাজ্য কিভাবে ধ্বসে গেল, পরাজিত ওসামা বিন লাদেন এবং আমীরুল মোমেনীন মোল্লা ওমরের সন্ধান কেন এখনও মিলে নি, আমেরিকা পাহাড় ঘেরা, বরফে ঢাকা দরিদ্র এদেশটিতে কি করতে চায়, হামিদ কারজাইয়ের লক্ষ্য কতদূরে যাওয়া, আর আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ কি এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরসহ আরও অনেক তথ্য এ বইটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আফগানিস্তানে সি আই এ, আই এস আই, কে জি বি সহ বহু দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকাণ্ডের অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে এ বইটিতে। বহু তথ্য সমৃদ্ধ এবইটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। ধন্যবাদ।

ফোরকান আহমদ
প্রকাশক ও পরিচালক

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন এন ডিসি, পি এস সি (অব.) ১৯৪৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় দু বছর পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে কাটিয়ে ১৯৭৩ সনে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৫ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডে স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯-৮১ সনে ঢাকায় সেনাসদরে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ডাইরেক্টরেটে নিয়োজিত হন। পরে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে দুটি ইনফেনট্রি ব্রিগেড ও একটি আর্টিলারি ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন।

লেখক বাংলাদেশের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে দ্বিতীয় বারের মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিখ্যাত ইউ এস এ কমান্ড এন্ড স্টাফ জেনারেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তিনি পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজে মাস্টারস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী সিনিয়র অফিসার হিসেবে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাময়ীকিতে লেখকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ জার্নালেও লেখকের 'রিসার্চ পেপার' ছাপা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও মাঝে মধ্যে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে। 'বাংলাদেশ ঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১' এই তথ্য বহুল ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সম্বলিত বইটি পাঠক সমাজে বহুল সমাদ্রিত হয়েছে।

লেখক বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানী, বেলজিয়াম, সৌদী আরব, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, গণচীন এবং জাপান।

লেখক প্রায় দু'বছরের উপরে সরকার নিযুক্ত সোনালী ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ঃ বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা	১১
সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ঃ ওয়াশিংটন ডিসি	২২
রাষ্ট্রপতি বুশের সন্ত্রাস বিরোধী প্রত্যয়	৪৫
সেপ্টেম্বর মাসের ইসলামাবাদ	৫৮
সোভিয়েত আগ্রাসন ও জেহাদের উপাখ্যান	১২২
দশ বছরের জেহাদের খতিয়ান	১৪৩
আফগান গৃহযুদ্ধ ১৯৯২-১৯৯৪	১৬২
আন্তর্জাতিক কোম্পানী-তেল-গ্যাস পাইপ লাইন ও তালেবান	১৭৫
আমেরিকা-সি আই এ এবং ইসলাম	১৯১
সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে ওসামা বিন লাদেন	২২৩
তালেবানদের আত্মকথা	২৩৮
আমেরিকান তালেবানঃ আব্দুল হামিদ ওরফে জন ওয়াকার	২৬৩
জাতিসংঘের বর্তমান ভূমিকা	২৬৭
তালেবানদের আত্মসমর্পণ ও একটি বিশ্লেষণ	২৭৩
পর্যালোচনা	২৮১
শেষের কথা	২৮৮
সংযুক্তি - ক ও খ	২৯১
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৯৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ ঃ বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা

'এর পরে পৃথিবী বদলে যাবে।'

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১, বুধবার নিউইয়র্ক শহর। সকাল ৭টার দিকে আকাশটি নীল এবং অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এ ধরনের আবহাওয়াকে সাধারণতঃ বৈমানিকরা 'অত্যন্ত পরিষ্কার' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। সেদিনও নিউইয়র্ক ও নিম্ন ম্যানহাটানের বাণিজ্যিক এলাকাগুলো মাত্র কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছিল। নিউইয়র্কের শহরতলী থেকে বিভিন্ন বর্ণের, গোত্রের ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন বেসরকারী অফিস, রেস্তোরাঁয় তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার জন্যে প্রতিদিন ভীড় জমায়। লোয়ার ম্যানহাটানের বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের' জোড়া টাওয়ারেই প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ হাজার লোক বিভিন্ন কাজে যোগ দেয়। এ সকালেও এ দু'টাওয়ারের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার জন্যে ক্রমেই অফিসগামী মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে।

এই দিনটি নিউইয়র্কের জন্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এদিনটিতেই এ শহরের পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের জন্যে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদের প্রার্থীর প্রাথমিক বাছাই হবে। এ শহরের বর্তমানে মেয়র রুডলফ গুইলিয়ানির পরিবর্তে ভবিষ্যতে মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে ফিরোলীয় লাগ্রার্ডিয়ার নামই বেশী উচ্চারিত হচ্ছিল। এখানে সিটি হলে পরবর্তী মেয়র নির্বাচন আর সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনার জন্ম দিলেও এ শহরের গ্রীষ্মের শেষের দিকে প্রচুর পর্যটক টুইন টাওয়ার আর আম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এর 'অবজারভেটোরি' টাওয়ারগুলোর উপরে উঠে সমগ্র নিউইয়র্ক হাডসন বে আর লিবার্টি স্ট্যাচু দেখবার জন্যে অধিক আগ্রহী ছিল।

সেই সকালে হাজার হাজার লোক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে

www.nagorikpathagar.org

নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দেবার জন্যে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছিল। এমনই অনেকের মধ্যে একজন হল মিঃ কার্ক ক্যালভিসেন। ক্যালভিসেন অর্থনীতি আর প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন 'ওয়াটারস্' এর রিপোর্টার। এই দিনের এ মনোরম সকালে সে এ ম্যাগাজিনের মূল কোম্পানী 'রিস্ক ওয়াটার গ্রুপস্' আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে 'ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার' বা বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের উত্তর টাওয়ারের দিকে যাচ্ছিল। রাতে তার খুব ভাল ঘুম হয় নি। তাই 'সাবওয়ে' বা পাতাল ট্রেনেই ঘুমের পর্বটা সেরে নিয়ে যখন টাওয়ারের পাদদেশে পৌঁছে তখন আটটা চৌচল্লিশ। ক্যালভিসেনের হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকে কারণ তার বৈঠক শুরু হবার কথা আটটা চল্লিশে, সে এখানেই চার মিনিট লেট। তাকে এখান থেকে একশত ছয় তলায় 'উইনডো অব দি ওয়ার্ল্ড' এ যেতে হবে। অফিসগামী ছোটখাট জনসমুদ্র ঠেলে লবীতে পৌঁছুলে গাইড তাকে জানালো 'উইনডো অব দি ওয়ার্ল্ড' এ যেতে হলে 'এক্সপ্রেস এলেভেটর' দিয়ে প্রথমে আটাত্তর তলায় উঠতে হবে সেখান থেকে পরিবর্তিত আরেকটি 'এলেভেটরে' তাকে একশত ছয় তলায় পৌঁছতে হবে। ক্যালভিসেন, নিউইয়র্কের এ টাওয়ারে বহুবার এসেছে। কেন যেন এবার তার কাছে পৃথিবীর উচ্চতম টাওয়ার দুটিকে অত্যন্ত চমৎকার লাগছিল বিশেষ করে ভোরের সূর্যের নরম আলোতে টাওয়ার দু'টিকে গর্বিতভাবে আকাশের দিকে দাঁড়ানো দেখে তার মনটাও তার দেশ আমেরিকার জন্যে গর্বে ভরে উঠতে চাইল। এলিভেটরের দিকে এগুতে এগুতে ক্যালভিসেনের মনটা এ টাওয়ার দুটোর পেছনের ইতিহাসের দিকে ক্ষণিকের জন্যে উঁকি মেরেছিল আর ভাবছিল এ দুই টাওয়ারে যত লোক কাজ করে পৃথিবীতে বহু শহর আছে যেখানে এর সম পরিমাণ জনসংখ্যাও নেই। সেই মুহূর্তে ক্যালভিসেন দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি আর কিছুক্ষণের মধ্যে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ঘটতে যাচ্ছে ইতিহাসের সব চেয়ে দুঃসাহসী আত্মঘাতী অভিযান যার ফলে পরবর্তী দু'ঘন্টার মধ্যে ম্যানহাটানের দৃশ্যপট থেকে চিরতরে অদৃশ্য হবে বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের টুইন টাওয়ার।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটান এ শহরের, তথা সমস্ত বিশ্বের ব্যস্ততম বাণিজ্যকেন্দ্র। নিউইয়র্ক কাউন্টির দক্ষিণ পশ্চিমের ছোট ছোট দ্বীপগুলো সমেত এর পরিধির মধ্যে রয়েছে, মূল ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত মার্বেল হিল বা মার্বেল পাহাড়। এ দ্বীপগুলোর পশ্চিম দিকে বিখ্যাত হাডসন নদী, উত্তর পূর্বদিকে

'স্টাইয়াটেন ডাইউভেল' নামক খাঁড়ি, পূর্বে 'পূর্বনদী' এবং দক্ষিণে 'আপার নিউইয়র্ক বে'। প্রায়ই বহিঃবিশ্বে ম্যানহাটানকে নিউইয়র্কের সাথেই একত্রিত করে ফেলে। অথচ এদুটি আলাদা জায়গা।

ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জটি ১৬২৬ সনে পিটার মাইনিউট নামক একজন নিউ নেদারল্যান্ড প্রদেশের সার্ভেয়ার স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে দেড় পাউন্ড রুপার বদলে কিনে নেয়। পরে ১৬৫৩ সনে এ এলাকা নিউ আমস্টারডাম নামক ছোট একটি শহরের মধ্যে একত্রিভূত হয় এবং আরও পরে ১৬৬৪ সনে ইংরেজদের দখলে চলে আসে। ইংরেজদের সময় থেকে শহরের নাম করণ করা হয় নিউইয়র্ক। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ শহরের প্রচুর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এখানে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় (১৭৮৫-৯০) এবং ১৭৮৯ সনে আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের অভিষেকও এই শহরেই হয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই, বলতে গেলে ১৮২৫ সনে 'এড়ি' নামক খালের উদ্বোধনের পর থেকেই ম্যানহাটানের উন্নতি আর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ১৮৯৮ সনে যখন বৃহত্তর নিউইয়র্ক শহরের গোড়াপত্তন হয় তখন থেকেই ম্যানহাটান ও অন্যান্য উপশহর যেমন ব্রুকলেন, কুইনস, রিজন্ড এবং ব্রোনকস্, নিউইয়র্কের সাথে একিভূত করা হয়।

বর্তমানে ম্যানহাটানকে বিশ্বের বাণিজ্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলে ধরা হয়। এখানেই বিশ্ব বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ব্রডওয়ে, অর্থনীতির নির্ধারক বলে পরিচিত ওয়াল স্ট্রিট, আম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, গ্রীনউইচ গ্রাম, হারলেম এবং বিখ্যাত সেন্ট্রাল পার্ক অবস্থিত। এশহরেরই সন্নিকটে রয়েছে জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় আরো রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অপেরা হাউস এবং একের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯০ সনের জনগণনায় সমগ্র নিউইয়র্কের জনসংখ্যা ছিল ১,৪৮৭,৫৩৬ জন।[১]

সাংবাদিক ক্যালভিসেন আরও একটু এগিয়ে এলিভেটরের কাছে যেতে যেতে আবার বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের সমস্ত ইতিহাসকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল। আজ যেন তার মনটা বার বার ইতিহাসের পাতায় ফিরে যেতে চাইছে।

বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র, নিউইয়র্ক শহর তথা ম্যানহাটানের প্রধান প্লাজায় ছ'টি

১। এন সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৪-২০০০।

www.nagorikpathagar.org

সুউচ্চ অট্টালিকার সমন্বয়ে গঠিত। আর এ কেন্দ্র ম্যানহাটানের দক্ষিণ পশ্চিমে হাডসন নদীর মুখে অবস্থিত। এখান থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে কিছুদূর এগুলেই অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ওয়াল স্ট্রিট। এ বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যেই টুইন টাওয়ার। নিউইয়র্ক শহরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে যে কোন পরিষ্কার দিনে এ দুটি অট্টালিকা চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনা। উভয় অট্টালিকা একশ' দশ তলা এবং এর প্রতিটির উচ্চতা এক হাজার তিনশ' পঞ্চাশ ফুট করে। মিঃ মিনোরো ইয়ামসেকি নামক স্থপতির নক্শা করা এ অট্টালিকা দুটি শতবছর দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে ১৯৭০ সনে নির্মাণ কার্য শেষ করা হলে ১৯৭৩ সনে শিকাগোতে সিয়ারস্ টাওয়ার নির্মাণ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ অট্টালিকা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এর প্রতিটি টাওয়ারে ১০৪ টি যাত্রী এলিভেটর, ২১,৮০০ জানালা এবং প্রতি তলায় এক একরের মত ভাড়া দেয়ার জায়গার সংকুলান করা হয়। উত্তরের টাওয়ারের ১০৭ তলায় পর্যটকদের জন্যে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বেও ১৯৯৩ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারীতে এ টুইন টাওয়ারের নীচে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় প্রায় ছয় জনের প্রাণহানী হয়। আর এ ঘটনার আট বছর সাত মাসের মাথায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে প্রায় (আমেরিকান সময়ে) সকাল ১০ টার মধ্যে নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী এ দুটি অট্টালিকা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে এবং একে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলেই শুরু হবে নতুন করে সংঘর্ষ যার এক প্রান্তে থাকবে পশ্চিমা বিশ্ব আর অন্যদিকে ২৭ বছরের উপর রক্তপাতে জর্জড়িত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন অথচ দরিদ্র দেশ, ইসলামী উগ্রপন্থী বলে পরিচিত, তালেবান শাসিত আফগানিস্তান।

ক্যালভিসেন এলিভেটরের কাছে পৌঁছে দেখল ঐ জায়গায় একই তলায় যাবার জন্যে বহু লোক জড়ো হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু সাদা বর্ণের আমেরিকানই নয়, এদের অনেকেই সদ্য নাগরিকতা প্রাপ্ত বহু দেশের জনসমষ্টি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার বেআইনীভাবে এ দেশে প্রবেশ করে ছোটখাট কাজে জড়িত থেকে ভাগ্যের উন্নতির চেষ্টায় রত। এদের মধ্যে অনেক উপমহাদেশীয় নারী পুরুষও রয়েছে। এমনি একজন বাংলাদেশের তরুণ সামিউল্লাহ চৌধুরী।

বাংলাদেশের কুমিল্লা নিবাসী ২৭ বছরের যুবক সামিউল্লাহ চৌধুরী[২] ১৯৮৭

২। এখানে নাম আর ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। ঘটনাটি দেশের পত্রপত্রিকা থেকে নেয়া।

www.nagorikpathagar.org

সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এপ্লাইড সাইন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেয়ার পর ভাগ্যান্বেষণে আটলান্টিক পার হয়ে দেশ থেকে সুদূর প্রবাসে এসেছে। ভাই বোনদের মধ্যে সবার ছোট সামিউল্লাহ, মাত্র ১ বছর হয়েছে বিয়ে করে নিউইয়র্কের 'কুইনস্' এ এসে উঠেছে। প্রথমে এদেশে এসে তাকে অনেক কষ্ট করে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। এখানে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ নেয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের কাজ করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা। বাড়ীতে দু'ভাই বোন আর বৃদ্ধমাতা পুত্রবধূকেও আমেরিকাতে এ অবস্থায় পাঠিয়েছে যাতে সামিউল্লাহর ভবিষ্যৎ সন্তান এখানে জন্মগ্রহণ করে এ স্বপ্নের দেশের নাগরিক হতে পারে। সামিউল্লাহ আজ প্রায় ছয় মাস যাবত 'উইনডো অব দা ওয়ার্ল্ড' এর এক রেস্টুরেন্টে চাকুরী করছে। এ অট্টালিকার বিশটি কাফে এবং রেস্তোরাঁয় প্রায় দেড়শ' ভারতীয় স্কুলের যুবক যুবতীরা খণ্ড চাকুরী করে তাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশের উপরে বাংলাদেশী। প্রায় দৌড়ের উপরেই সামিউল্লাহ ক্যালভিসেনের পাশে এসে দাঁড়ালো। তাদেরই পাশে এসে উঠলো এক সুন্দরী তরুণী। তাকে দেখে সামিউল্লাহর নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। তার স্ত্রীকে বিকেলে ডাক্তার দেখাবে বলেই দুপুরের পরের সিফটের ডিউটি বদলিয়ে আজ সকালের ডিউটি নিয়েছে। কুইনস্ এর ছোট্ট এপ্যার্টমেন্ট থেকে বের হবার সময় স্ত্রী সামিয়াকে সাবধান থাকতে বলে আসে। সামিয়া নিজেও একটি ছোট্ট দোকানে কাজ করত তবে সন্তান সম্ভাবা বলে কিছু দিন অবসর নিয়েছে। আজ বাড়ী থেকে রেব হবার সময় কেন যেন বারবার সামিয়াকে একটু বাড়তি আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। দেশে আত্মীয়স্বজনের কথাও মনে পড়ছিল। শুনেছে দেশে নির্বাচন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। মাঝে মধ্যে ইন্টারনেটে দেশীয় দু' একটি পত্রিকা পড়ার সময় পায়। সামিউল্লাহর মাঝে মধ্যে দেশের জন্যে প্রচণ্ড দুঃখ হয় বিশেষ করে নিরাপত্তাহীনতার জন্যে। প্রায় প্রতিনিয়তই অহেতুক হত্যা আর হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হচ্ছে নিরীহ মানুষ। এ বিদেশ বিভূঁইয়ে অন্ততঃ আমেরিকাতে প্রথমদিকে কষ্টকর জীবন হলেও সে অন্যান্য অনেকের মত মনে করে এখানে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত রয়েছে। ভিনদেশী নাগরিক হলেও অন্ততঃ সমান অধিকার রয়েছে। বিশ্বের এ বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশে অন্যান্য দেশের মত এত কালাকানুন নেই। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রেও ভেদাভেদ কম। নেই ধর্মীয় অনুশাসন বা স্পর্শকাতরতা। অত্যন্ত খোলামেলা ধর্মনিরেপেক্ষ দেশ যদিও আমেরিকানরা

www.nagorikpathagar.org

ইদানীং বিশ্বের সবচেয়ে বেশী চার্চমুখী খ্রীষ্টান বলে পরিচিত হচ্ছে। এলিভেটর প্রায় পশ্চাশ তলা অতিক্রম করেছে। সামিউল্লাহর পাশে দাঁড়ানো তরুণী হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু উশখুস করছিল। সেও ক্যালভিসেনের সাথে একই বৈঠকের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছে তবে একে অপরের পরিচিত নয়। কেন যেন আজ সামিউল্লাহ্‌র বারবার তার নব আগন্তুক সন্তানের কথা মনে আসছে। বিধির কি নির্মম বিধান। সেদিন ঐ এলিভেটরে দাঁড়ানো বিভিন্ন রংয়ের মানুষ কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেও বুঝতে পারে নি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। কল্পনাও করে নি যে, ঘটতে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাস যা সমগ্র পৃথিবীর চলমান ব্যবস্থা বিশেষ করে আমেরিকার উদার সমাজে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবে। সামিউল্লাহ্‌র মত অনেকেই চিরজীবনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যাবে। তার নিখোঁজ হবার পরই পরিবর্তিত পৃথিবীতে জন্ম নেবে তার সন্তান। এ সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে কেউ বলতে পারেনা।

আরও অন্যদের মত ক্যালভিসেনকেও এই তরুণীর পরিপাটি চেহারা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিধেয় সমানভাবে আকৃষ্ট করছিল। যদিও তার মন ছিল বৈঠকের দিকে তবুও অল্প সময়ের মধ্যেই জেনে নিল ঐ তরুণীটিও একই উদ্দেশ্যে ঐ একই বৈঠকে যাচ্ছে। ক্যালভিসেন ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এ তরুণীও হাজার হাজার নিখোঁজের তালিকায় যুক্ত হবে। পুরুষের স্বভাবজাত দৃষ্টিতেই ক্যালভিসেন এই নাম না জানা তরুণীর পায়ের দিকে তাকাতে তার চোখে পড়ল একটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার লাল গোলাপের ছাপে তার পায়ের গোড়ালীতে একটি উল্কি আঁকা। আগ বাড়িয়ে নাম জিজ্ঞেস করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই এক বিকট শব্দের সাথে সাথে সমস্ত এলিভেটর দোলনার মত একপাশ হতে আরেক পাশে দুলে উঠলো। আর এত বড় ধাক্কা সামলাতে না পেরে একজন আর একজনের উপরে ছিটকে পড়ল। এত বড় ধাক্কার উৎস অথবা হেতু কেউই বুঝে উঠতে পারল না। আশ্চর্যের বিষয়, কারও মাঝে খুব একটা উৎকণ্ঠা তখনও দেখা দেয় নি। অনেকেই ১৯৯৩ সনের ঘটনার কথা মনে করে আরেক দফা বোমা হামলার আশঙ্কা করছিল মাত্র। ক্যালভিসনের ঘড়িতে সময় তখন সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, নিউইয়র্ক টাইম। ঐ সময়েই বোস্টনের লোগান বিমানবন্দর থেকে ছিনতাইকৃত প্যান আমেরিকান বোয়িং ৭৬৭ যাত্রীবাহী বিমান উত্তর টাওয়ারের

www.nagorikpathagar.org

মাথায় আঘাত হানে।

স্থান বোস্টন। সেদিন ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১, বোস্টনের আকাশ ছিল চকচকে পরিষ্কার। বিমান চালনা এবং যাত্রার জন্যে অত্যন্ত অনুকূল আবহাওয়া। বাইরে তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রী ছিল মাত্র। প্রতিদিনের মতই লোগান বিমানবন্দর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। আমেরিকান এয়ারলাইন্স টারমিনালে যাত্রীদের ভীড় তেমন একটা ছিলনা। বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছিল বলে বিমান ভ্রমণও অনেক কমে এসেছিল। অনেক ছোটছোট বিমান সংস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। আমেরিকার এয়ারলাইন্সের মত এত বড় ধরনের সংস্থাকেও লোকসান পোহাতে হচ্ছে। সেদিনও যাত্রীর সংখ্যা ছিল কম।

আমেরিকান এয়ার লাইন্স ফ্লাইট-১১ একটি সুপরিসর বিমান ৭৬৭; মাত্র ৮১ জন যাত্রী নিয়ে উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মধ্যপ্রাচ্য বংশভূত যাত্রীও ছিল যাদের মধ্যে এ বিমানের ছিনতাইকারীরাও ছিল এবং পরে যাদের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যাদের সনাক্ত করা হয় তারা হল মোহাম্মদ আতা, আব্দুল আজিজ আলোমারি, ওয়ায়েল আল শেহরী, ওয়ালিদ এম আল শেহরী এবং সাতাম আল সুকমি। যাত্রী বহনকারী এ বিমানটির গন্তব্যস্থল লসএঞ্জেল্‌স। যথারীতি সকাল সাতটা ঊনপঞ্চাশ মিনিটে বিমানটি আকাশে উড়ে। প্রথমে লসএঞ্জেল্‌সের পথে পূর্বদিকে এভিয়ন ডেক অতিক্রম করেই হঠাৎ দক্ষিণ দিকে দিক পরিবর্তন করে নিউইয়র্ক শহরের দিকে গন্তব্যপথ পরিবর্তন করে। গতি পরিবর্তনের পরে বিমানবন্দরের কনট্রোল টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ বিমানটি মানে ফ্লাইট-১১, ৮ ঃ ৪৫ মিনিটে উত্তর টাওয়ারে আঘাত হানে। ফ্লাইট-১১ বিমান উড্ডয়ন এবং এ ছিনতাইয়ের ঠিক এক মিনিট পূর্বেই ইউনাইটেড্ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭৫ বোয়িং ৭৬৭ মাত্র ৬৫ জন যাত্রী নিয়ে একই বিমানবন্দর থেকে একই গন্তব্য পথের দিকে রওয়ানা হলে পথে অনুরূপভাবে ছিনতাই হয়ে এটাও নিউইয়র্কের দিকে গতি পরিবর্তন করে। এ বিমানের ৬৫ জন যাত্রীর মধ্যেও কয়েকজন মধ্যপ্রাচ্যের লোক ছিল বলে পরে প্রকাশ পায়। অনুমান করা হয় এরাই এ ছিনতাইয়ের এবং পরে উত্তরের টাওয়ারের অনুরূপ দক্ষিণের টাওয়ারে সকাল নয়টা ছয় মিনিট আত্মঘাতী হামলা চালায়।

দুটি বিমান বোস্টনের বিমান বন্দর থেকে পর পর ছিনতাই হবার পর

www.nagorikpathagar.org

আরও দুটি বিমান ছিনতাই হয়। এর একটি সকাল আটটা বেজে এক মিনিটে ইউনাইটেড এয়ার লাইন্স এর ফ্লাইট ৯৩, একটি বোয়িং ৭৫৭। এ বিমানটি ৩৮ জন যাত্রী এবং ৭ জন ক্রু সহ নিউইয়র্ক (নিউইয়র্ক হতে বেশ দূরে) থেকে সানফ্রান্সিসকোর পথে যাচ্ছিল। এর অল্প পরেই আরও একটি আমেরিকান এয়ার লাইন্স এর ফ্লাইট ৭৭; বোয়িং ৭৫৭ বিমান ওয়াশিংটন থেকে লসএঞ্জেল্‌সে ৫৮ জন যাত্রী এবং ৬ জন ক্রু সহ ছিনতাই হয়।

ওয়াশিংটন থেকে ছিনতাইকৃত বিমানটি ঐ দিন সকাল নয়টা চল্লিশ মিনিটে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সদর পেন্টাগনের পশ্চিম দিকে আত্মঘাতী আঘাত হানে। এ আঘাতে সমগ্র পশ্চিম অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আরও পরে জানা যায় এখানে মৃতের সংখ্যা ছিল ১৮৪ জনের মত। চতুর্থ ছিনতাইকৃত বিমানটি সকাল ১০ ঃ ৩৭ মিনিটে পিটসবার্গ থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে 'সানক্সভিল' নামক জায়গায় ভূপাতিত হয়ে বিধ্বংস হয়। অনেকেই মনে করে এ বিমানটি ছিনতাইকারীরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ভবনে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে নিউইয়র্কে রিপোর্টার ক্যালভিসেন এলিভেটর থেকে বের হয়ে এ প্রচণ্ড শব্দের উৎস অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপর থেকে ধোঁয়া, ধুলোবালি আর জানালার ভাঙ্গা কাঁচ গুঁড়িয়ে পড়ছিল। সে তাৎক্ষণিকভাবে এলিভেটর এলাকা ছেড়ে ঘটনাটি উপলব্ধি করবার জন্যে নিকটস্থ বারান্দায় যাবার পথে যা দেখল তা সে হলিউডের ছবিতেও দেখে নি। উপর থেকে চেয়ার টেবিল থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত পড়তে থাকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় সে আবার এলিভেটরে ঢুকে পড়ল। এ সময়ে অনেক আতঙ্কগ্রস্থ লোক এলিভেটরে গাদাগাদি করে ঢুকে পড়াতে দাঁড়াবার জায়গাও ছিলনা। এলিভেটর নীচের দিকে নামতে থাকলে উপর থেকে ধোঁয়া ক্রমশঃই ঘনীভূত হয়ে সমগ্র এলাকাটিকে অন্ধকার করে ফেলে। ক্যালভিসেন কোনরূপে নীচে নেমেই বাইরের রাস্তায় এসে পৌঁছে দেখল উত্তর দিকের টাওয়ারের উপরের দিক তখনও জ্বলছিল। তাড়াতাড়ি করে সে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনটি নিয়ে তার বান্ধবী স্যামিকে উত্তর টাওয়ারের ঘটনার বিবরণ দিতে যাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে তার চোখের সামনেই আর একটি ছিনতাইকৃত বিমান দক্ষিণ টাওয়ারে প্রায় মাঝামাঝি এসে আঘাত হানে। সে উপরের দিকে

www.nagorikpathagar.org

তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখল তাতে তার মনে হল একটি অগ্নিকুন্ডলী একদিক থেকে ঢুকে অন্যপথ দিয়ে বের হয়েছে যার তাপ সে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে অনুভব করছিল। ক্যালভিসেন, হতভম্ব ও বিমূঢ়ের মত শুধু তাকিয়েই থাকল। বিশ্বাস করতেই পারছিলনা যে, সে ব্রডওয়ের প্রেক্ষাগৃহে স্টিফেন স্পীল বার্গের হলিউডের স্পেশাল এফেক্টের ছবি দেখছিল, না এ ঘটনা বাস্তবে তার চোখের সামনে ঘটে গেছে। সময় তখন সকাল নয়টা বেজে ছয় মিনিট।

দুটি টাওয়ারই প্রায় এক ঘন্টার ব্যবধানে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। দক্ষিণের টাওয়ারটি প্রথমে সকাল দশটার সময় এবং উত্তরের টাওয়ারটি সকাল দশটা ঊনত্রিশ মিনিটে খাড়াভাবে নীচের দিকে নেমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ঐ দিনই বিকেল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রের ৭ নম্বর টাওয়ারটিও ভেঙ্গে পড়ে যায়। পরেরদিন ক্যালভিসেন তার ইন্টারনেটের ওয়েব সাইটে রিস্কওয়াটার গ্রুপের নাম দেখতে পায়। ঐ 'ওয়েবে' পড়ল যে, ঐ কোম্পানীর ষোল জন কর্মচারী এবং বৈঠকে আগত প্রায় পঞ্চাশ জন ডেলিগেট নিখোঁজ। ঠিক তেমনি দুটো টাওয়ারে সেদিন চল্লিশ হাজার মানুষের মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার জন নিখোঁজ যার মধ্যে প্রায় ২৮৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এ নিখোঁজদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন বাংলাদেশীও রয়েছে। এদের মধ্যে সামিউল্লাহ একজন। সামিউল্লাহর নিখোঁজ হবার দুদিন পরেই তার স্ত্রী সামিয়া একপুত্র সন্তান জন্ম দেয়। আজও সামিয়া তার শিশু পুত্র আর সামিউল্লাহর বৃদ্ধমাতা নিখোঁজ সামিউল্লাহর জন্যে অন্যান্য হাজার হাজার নিউইয়র্ক বাসীদের সাথে অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দ্বিতীয় টাওয়ারের আক্রমণ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশ, বিদেশী টেলিভিশনের চ্যানেলে সরাসরি দেখলেও এ ঘটনাকে হৃদয়াঙ্গম করতে প্রচুর সময় লেগেছে। সময়ের ব্যবধানের জন্যে অনেক দেশের জনগণ ঘুম থেকে উঠে এ ভয়াবহ খবর পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অনেকে এ ঘটনা বিশ্বাস করতে প্রচুর সময় নেয়। এর কারণ আমেরিকার মত বিশ্বের পরাক্রমশালী দেশ যার প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার প্রশ্ন অবান্তর, সে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং এর প্রায় প্রাণ কেন্দ্রে আঘাত হানার সাহস কারা করতে পারে এবং কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এসব যদিও তৎক্ষণাৎ নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও

www.nagorikpathagar.org

এগুলো যে সন্ত্রাসী হামলা সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিলনা।

এ হামলা শুধু নিউইয়র্কেই থেমে থাকে নি। হামলা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত সামরিক শক্তিতে বলীয়ান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর সদর দপ্তর পেন্টাগনে। এ যেন এক অতিআশ্চার্য ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

হামলার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বের হতে থাকে আর বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে কেমন করে আমেরিকার মত দেশের অভ্যন্তরে প্রায় আধঘন্টার ব্যাবধানে তিনটি আলাদা আলাদা বিমান বন্দর থেকে চারটি বিমান ছিনতাই এবং কে বা কারা এত সূক্ষ্মভাবে এ আত্মঘাতী হামলা সন্দেহাতীতভাবে পরিচালনা করতে পারে? তা ছাড়া এ ধরনের অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত সফল আক্রমণ ব্যাপক পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছাড়া কি সম্ভব হয়েছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা শেষ করার জন্যে প্রায় একবছরের উপরে সময় লাগার কথা। এখানেই প্রশ্ন থাকে যে, প্রযুক্তির মাতৃভূমি বলে পরিচিত আমেরিকার মত দেশে এ ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এ আক্রমণ কিভাবে সম্ভব? এত গোপনীয়তা রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? এতগুলো বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় নি কেন? এবং এত সময় থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় নি? এসব প্রশ্নের উত্তর খোদ আমেরিকানরাই দিতে পারবে তবে অনেক সময় লাগবে। আপাতদৃষ্টে মনে হয় আমেরিকার জনগণ এবং সরকারের বদ্ধমূল ধারণা যে, আমেরিকাকে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্যে সে দেশেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতেই যুদ্ধ করতে হবে। তাই ইতিহাসে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণ ছাড়া সে দেশের জনগণ নিজের দেশে রক্তপাত বা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে নি, যেটা কিনা তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশ অহরহ দেখছে।

আমেরিকা নিজের ভূমি ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভূমিতে যুদ্ধ করতে পটু। দুটি বিশ্বযুদ্ধেও আমেরিকার সেনারা ইউরোপে এবং দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুই পরাশক্তির অন্যতম এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের ধারক হিসেবে কমিউনিজম ঠেকাতে আমেরিকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করেছে। যেমনটা ভিয়েতনাম এবং কোরিয়া উপদ্বীপে। কোরীয় উপদ্বীপ বিভক্ত হয়েছে উত্তর দক্ষিণে শুধুমাত্র পুঁজিবাদ আর কমিউনিস্ট তত্ত্বের কারণে।

www.nagorikpathagar.org

ভিয়েতনামে ঘটেছে বিবেক বিবর্জিত যুদ্ধ যাতে মানবতা বিরোধী তৎপরতা চালিয়েছে পাশ্চাত্যের সভ্যতার প্রতীকী দেশের মারাত্মক অস্ত্র। পরীক্ষিত হয়েছে ন্যাপামের মত অমানবিক অস্ত্র। নিহত এবং বিকলাঙ্গ হয়েছে হাজার হাজার পূর্ব এশীয় জনমানব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিজম আর দ্বিতীয় পরাশক্তি রাশিয়াকে ঠেকাতে গিয়ে আমেরিকা লিপ্ত হয়েছে গোপন যুদ্ধে অথবা ছায়াযুদ্ধে (Proxy War)। এসব অদৃশ্য যুদ্ধে আমেরিকার মদদে সংগঠিত হয়েছে বহু রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থান। নির্বাসিত হয়েছে গণতন্ত্র আর মানবাধিকার। জন্ম দিয়েছিল ইদি আমিনের মত স্বৈরাচারী শাসকের। বিগত পঞ্চাশ বছরের আফ্রিকা মহাদেশে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে তা দুটি বিশ্বযুদ্ধেও হয় নি। এসব অত্মঘাতী যুদ্ধের ফলে আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা আর এশিয়ার বহুদেশ বঞ্চিত হয়েছে অন্যান্য সামাজিক উন্নতি থেকে। আজও এর জের চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্টি হয়েছে ইসরায়েল নামক এক বিষফোঁড়া। যার কারণে আজও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসে নি। ক্ষুদ্র পরিসরে আরব নিধন আর বৃহত্তর পরিসরে চলছে মুসলমানদের উপর অত্যাচার। এসব কারণেই জন্ম দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ আর সন্ত্রাসবাদী বলে খ্যাত সংগঠনগুলো। মজার ব্যাপার হল, এসব কথিত সন্ত্রাসবাদ আর সন্ত্রাসবাদীদেরকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে পশ্চিমা স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে যার বিবরণ আমরা পরে পাব।

আমেরিকার নিউইয়র্কে এবং ওয়াশিংটনে এ অভূতপূর্ব হামলার দায় দায়িত্ব বিশ্বের তথাকথিত কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আজও স্বীকার করে নি। তবে আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্ব উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠন বিশেষ করে আল-কায়দার ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে আসছে এসব ঘটার পরের দিন থেকেই। তবে এ ঘটনার সাথে আমেরিকা যে এদের দায়ী করবে এতে আমার মত অনেকেরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা (১১ই সেপ্টম্বর ২০০১ রাতে লেখা আমার প্রবন্ধ যা ছাপা হয়েছিল 'প্রথম আলো' নামক বাংলা পত্রিকায়)।

www.nagorikpathagar.org

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১, ওয়াশিংটন ডিসি

'এ সন্ত্রাসের সমুচিত জবাব দেয়া হবে।'

ওয়াশিংটন ডিসি, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১। নবনিযুক্ত এফ বি আই (FBI: ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) ডাইরেক্টর মি. রবার্ট মুলার সেদিন সকালে অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনের শুরুতে গত দিনের সমীক্ষা নিচ্ছিল। সে সময়েই একজন কর্মকর্তা এসে জানালো যে কিছুক্ষণ আগে আটটা আটচল্লিশে, একটি বোয়িং ৭৬৭ বিরানব্বই জন যাত্রী নিয়ে বোস্টন থেকে লসএঞ্জেলসে যাবার পথে নিউইয়র্কের উত্তর টাওয়ারে ধাক্কা দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সে সাথে উত্তর টাওয়ারের উপরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ মুহূর্তে আগুনের লেলিহানের মধ্যে রয়েছে। এ খবর পরিবেশনের সময় এফ বি আই এর সমস্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এমনকি সন্ত্রাস বিরোধী সেলের প্রধান মি: ডেল ওয়াটস্‌নও উপস্থিত ছিল। এ সংবাদ পরিবেশনের পরেও কারও মনে এটা সন্ত্রাস হতে পারে এমন সম্ভাবনা তখনও উঁকি দেয় নি। তৎক্ষণাৎ মিটিং অর্ধেক পথে ক্ষান্ত করে প্রায় সকলেই ডেপুটি ডাইরেক্টর মি. টমাস পিকেরিং এর অফিসে টেলিভিশনের সামনে জমায়েত হল খবর দেখার জন্যে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, নয়টা ছয় মিনিটের মাথায়, টেলিভিশনের ভাষ্যকারের উত্তেজিত কন্ঠের আওয়াজের মধ্যে সেদিন সে অফিসে সমবেত সকল কর্মকর্তা বিস্ফারিত নেত্রে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দেখল দক্ষিণের টাওয়ারে আরও একটি যাত্রীবাহী সুপরিসর ৭৬৭ বিমানের আঘাত হানা। এ আঘাত হানার সাথে সাথে মনে হল একটি আগুনের ফুল্‌কি একদিক হতে আরেক দিকে তীরের মত বেরিয়ে গেল। দক্ষিণের টাওয়ারের আঘাত হানার লক্ষ্যস্থান উত্তরের টাওয়ারে লক্ষ্যস্থান থেকে আরও নীচে হওয়ায় উপর থেকে নিম্নে চাপ

www.nagorikpathagar.org

পড়বে বেশী। সমগ্র এফ বি আই অফিস সে মুহূর্তে এ অভাবনীয় দৃশ্য অবলোকন করে কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব হয়ে যায়। দ্বিতীয় আঘাতের পর আর কোন সন্দেহই থাকল না যে, এটি সন্ত্রাসী হামলা। কিন্তু এর ব্যাপকতা দেখে মনে হয়েছিল বিমানে পারমাণবিক বোমা বহন করা হয়ে থাকতে পারে। পরে অবশ্য এধরনের ধারণা অমূলক প্রমাণিত হয়। সেদিন আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এফ বি আই ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের আরও অনেক গোয়েন্দা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বারবার ভিডিও তে ধারণ করা এ দৃশ্য পুনঃ পুনঃ দেখবে। সেদিনের এ ধরনের হামলার সম্ভাবনা কস্মিনকালেও এফ বি আই চিন্তা করে নি। আমেরিকার মাটিতেই সেখান থেকে আভ্যন্তরীণ রুটে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা এবং ছিনতাই করা বিমানের এ ধরনের ব্যবহার হতে পারে এ সত্য বিশ্বাস করতে এফ বি আই কিছুটা সময় নিলেও অনেক আমেরিকানদের কাছে এটিও অবিশ্বাস্য হয়ে থাকবে। কিভাবে একটি বিমান এ ধরনের ক্ষতি করতে পারে এমন একটি অট্টালিকার যার সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এগুলো প্রচণ্ড আগুনেও ক্ষতি হবেনা। তবে কেন এমন হল। এর উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে এফ বি আই পায় নি। তবে পরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত আসা শুরু করলে এফ বি আই এর কাছে একটি বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, এবার তারা এক অসাধারণ সন্ত্রাসী মোকাবেলার সম্মুখীন হয়েছে।

টুইন টাওয়ার বা জোড়া টাওয়ার দুটি কতগুলো স্টীলের খুঁটির উপর নির্মিত ছিল। এ নির্মাণ পদ্ধতিতে মাঝখানে একটি স্টীলের স্তম্ভের চারপাশে সম ভার বহনের জন্যে চারপাশে আঠারো ইঞ্চি ব্যাসার্ধের দু'শ' চৌচল্লিশটি স্টীল গার্ডার স্থাপিত ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ স্টীল ১০০০° সেন্টিগ্রেডেও বেঁকে যাবার কথা নয়। যে স্থানে বিমান দুটি আঘাত হানে তার উপরের অংশগুলোর ওজনের ভার সইতে না পেরে এবং বিমানের ধাক্কায় আগুনের উত্তাপ এবং জেট তেলের অবিরাম জ্বলতে থাকায় মাঝখানের কলাম গলে বাঁকা হতে থাকলে উপরের ভারে নীচের সমস্ত কলাম বসে যেতে থাকে। উল্লেখ্য, যেহেতু প্রতিটি বিমান যাত্রার প্রথম পর্যায়ে ছিল, তাই তাদের ফুয়েল ট্যাংক পূর্ণ থাকায় ধাক্কা লাগার ফলে আগুন ধরে যায় আর তার তাপমাত্রা দাঁড়ায় কমপক্ষে ১৫০০° সেন্টিগ্রেড। কাজেই পাঠকদের নিকট পরের বিষয়গুলো সহজেই অনুমেয়।

বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর এফ বি আই এর এক কর্মকর্তা মাথায় হাত

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে নিজের চুল ছেঁড়ার মধ্য দিয়ে এত বড় অঙ্কের হিসেব জানা অদৃশ্য সন্ত্রাসীকে একজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে ইচ্ছে হলনা তার। তার কাছে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সন্ত্রাস যারাই ঘটিয়েছে তারা বহুদিনের প্রস্তুতি এবং সমস্ত কারিগরী প্রশিক্ষণ নিয়েই মাঠে নেমেছে। এতে কত লোক জড়িত রয়েছে তা সে মুহূর্তে অনুমান করাও সম্ভব ছিলনা। এ কাজটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুপরিপক্ক হাতের।

সন্ত্রাস দমন ব্যুরোর ডাইরেক্টর ডেল ওয়াটস্‌ন সর্বাগ্রে ১৯৯৮ সনের পরে গঠিত স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন এন্ড অপারেশন সেন্টারের (SOIC) দিকে হেঁটে রওয়ানা দিল। নবনির্মিত এ সেন্টারটি জর্জ হার্বার্ড ওয়াকার বুশ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বর্তমান রাষ্ট্রপতির বাবার নামে নাম করণ করা হয়েছিল। এ সেন্টারটি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সকল প্রকারে যোগাযোগ এবং আড়ি পেতে শোনার সব ধরনের যন্ত্র। আরও রয়েছে ডিজিটাল ম্যাপ যাতে একসাথে পাঁচটি জায়গায় যে কোন ধরনের সঙ্কটের বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। ডেল ওয়াটসন দেশের অন্যান্য তদন্ত এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক ডেকে পাঠায়। তার উদ্দেশ্য ছিল এফ বি আই এর সমন্বয়ে এ দুধর্ষ ও অকল্পনীয় ঘটনার তাৎক্ষণিক এবং ত্বরিৎ তদন্ত করা। এর মধ্যেই অফিস থেকে অপ্রয়োজনীয় লোকদের চলে যেতে বলে ডেল ওয়াটসন তার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করে। ডেল ওয়াটস্‌ন জানে যে, সে এক অত্যন্ত জটিল কাজে হাত দিতে যাচ্ছে কারণ এফ বি আই এর কাছে বড় আকারের সম্ভাব্য সন্ত্রাসের খবর থাকলেও এধরনের সন্ত্রাস ছিল সম্পূর্ণভাবে হতভম্ব করার মত। এফ বি আই দেশবাসীকে কি জবাব দেবে? এ সংস্থার জন্মের পর থেকে এত বড় অস্বাভাবিক সংকটের মুখে আগে পড়তে হয়নি।

এফ বি আই এর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে চুরানব্বই বছর আগে ১৯০৮ সনে। এ সংস্থার জন্মদাতা তৎকালীন এটর্নি জেনারেল চালর্স জে বোনাপার্ট। আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্‌টিসের একটি অংশ হিসেবে একে গড়ে তোলে। এ সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারে হয়ে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক তদন্তগুলো হাতে নেয়া বিশেষ করে যেখানে অঙ্গরাজ্যগুলোতে তদন্তের প্রয়োজন পড়বে। ১৯২৪ সনে এটর্নি জেনারেল মিঃ

www.nagorikpathagar.org

হারলান ফিস্ক স্টোন পৃথকভাবে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মিঃ জে এডগার হুভার' কে এফ বি আই এর ডাইরেক্টর নিযুক্ত করে এ সংস্থাকে আরও কার্যকর করবার দায়িত্বে নিয়োজিত করে। মি ঃ হুভার বহু বছর এ সংস্থায় থাকার ইতিহাস রচনা করে। তিনি শুধু ডাইরেক্টর হিসেবেই থাকেন নি; বরং বলতে গেলে এফ বি আইকে শক্তিশালী করে অত্যন্ত কার্যক্ষম করে তোলার প্রয়োজনে প্রচুর সময় আর মেধা ব্যয় করে। আজও আমেরিকায় তথা বিশ্বে এফ বি আই আর মিঃ জে এডগার হুভারকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা প্রায় অসম্ভব। মি. হুভারের এ অবদানের জন্যে এফ বি আই সদরদপ্তর হুভার সেন্টার নামে পরিচিত।

ঐ সকালে মি. ডেল ওয়াটসনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়ার সুবাদে ওয়াশিংটন ডিসির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি ভবন 'হোয়াইট হাউস' এর ছাদে এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের সম্মুখের 'লাফায়েট পার্কে' এ শহরের প্রায় সমস্ত এজেন্ট নিরাপত্তার জন্যে ছড়িয়ে পড়ে। হোয়াইট হাউজের আশে পাশে সশস্ত্র এজেন্টরা যার যার কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে যায়; কিন্তু এত কিছুর পরেও সকাল নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ওয়াশিংটনে ডালাস বিমানবন্দর থেকে লস্‌এঞ্জেলেসের পথে চৌষট্টি জন যাত্রীবাহী বিমান, আমেরিকান এয়ারলাইন্স এর সুপরিসর ৭৫৭ বোয়িং, ফ্লাইট নং ৭৭, ছিনতাই হয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সদর পেন্টাগনের পশ্চিম দিকে হামলা চালায়। এ হামলায় ১৮৪ জনের মৃত্যুর সাথে এ সদর দপ্তরের অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হয়। এফ বি আই মনে করেছিল তৃতীয় ছিনতাইকারী বিমান ফ্লাইট ৭৭ হয়ত 'হোয়াইট হাউসে' আঘাত হান্‌বে। তারা ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের প্রতিরক্ষা সদর যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও হুমকির সম্মুখীন হয় নি, এভাবে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে পেন্টাগনের অবিশ্বাস্য অতিকথা (Myth) কে মিথ্যা প্রমাণিত করবে।

পেন্টাগন আমেরিকার প্রতিরক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর। এ দপ্তরকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সরকারী অফিসের অট্টালিকা বলে চিহ্নিত করা হয়। ওয়াশিংটনের আরলিংটন কাউন্টিতে অবস্থিত পেন্টাগনে তিন সার্ভিস-আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স ছাড়াও ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স এর সদর দপ্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে সবক'টি সার্ভিস এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করবার জন্যে মিঃ জর্জ এডউইন বারগস্টর্ম নামক স্থপতির নক্‌শায়

www.nagorikpathagar.org

১৯৪১-৪৩ সনের মধ্যে নির্মিত হয়। এ অট্টালিকার আয়তন প্রায় ৩৪ একর। এর ফ্লোর স্পেস প্রায় ৩৪৩,৭৩০ বর্গ মিটার। সেখানে প্রতিদিন একই সাথে প্রায় বিশ হাজার লোক কাজ করতে পারে। এ বিল্ডিংটির পাঁচটি দিক বলে ইংরেজীতে একে পেন্টাগন (Pentagon) বলা হয়। এতে যতগুলো বারান্দা রয়েছে তার যোগফল সতের মাইলের উপরে তবে এমনভাবে নির্মিত যে, এক কোণা হতে আরেক কোণায় যেতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এখানে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজারের মত গাড়ী পর্কিং করা হয়। ১৯৫৬ সনে পেন্টাগনে একটি হেলি পোর্টের স্থাপনা করা হয়।[১] এর সুরক্ষার অনেক কথিত ব্যবস্থার মধ্যে দশ কিলোমিটার ব্যাসে 'নো ফ্লাই জোনও' রয়েছে। এত সুরক্ষার মধ্যেও পেন্টাগনে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে, এর ভিত্তিপ্রস্তরের দিন থেকে ৬০ বছর পর, এ দুঃসাহসী সন্ত্রাসী অভিযান চলে। বিশ্ব এ খবরে হতবাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ষাট বছর পূর্বে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সনে পেন্টাগনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল।

পেন্টাগন এফ বি আই এর আওতার মধ্যে না থাকলেও নিউইয়র্কে প্রথম দুটি হামলার পরেও পেন্টাগনের উপরের এ হামলায় এফ বি আই এর কর্মতৎপরতার এবং তাদের এসব বিষয়ে আগাম খবরাখবর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতার উপর সন্দেহের দাগ থেকে যায়। এরই মধ্যে ছিনতাইকারী চতুর্থ বিমানটি পিটস্‌বার্গ নামক শহরের নিকট পড়ে গিয়ে ধ্বংস হবার খবর পেয়ে এফ বি আই অনেকটা স্বস্তি পায়।

এসব ঘটনার পরপরই এফ বি আই এর এজেন্টরা অতীতে প্রাপ্ত আগাম তথ্য পাওয়া এবং তার গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল কিনা নিরূপণ করার জন্যে প্রায় ২৪ ঘন্টা পূর্বের ধারণকৃত টেপগুলো বাজিয়ে দেখে। সাধারণতঃ এফ বি আই সন্দেহভাজন লোকজনের টেলিফোনগুলো সারাক্ষণ নিরিখে রেখে কথোপকথনগুলো টেপ করে ফেলে। তাদের অভিজ্ঞতায় অতীতের যে কোন বড় ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পূর্বে সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর সদস্যরা কোননা কোন পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগে কথোপকথন করে; কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ঘটে যাওয়া এত বড় সন্ত্রাসী কার্যের কোন পূর্বাভাসই বের করতে সক্ষম হলনা । তবে প্রথম দিনেই তারা যা করতে

১। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৪-২০০০।

www.nagorikpathagar.org

পেরেছিল তা ছিল বিকেলের মধ্যেই এ আত্মঘাতী হামলার এবং বিমানের ছিনতাইয়ের সাথে জড়িতদের নাম বের করে ফেলেছিল। যে দুটি বিমান ওয়াশিংটনে হামলা চালিয়েছিল সেগুলোর অপহরণকারীদের নাম পরের দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল। যে বিমানটি পেন্টাগনে বিধস্ত হয়েছিল, ফ্লাইট ৭৭ তাতে মোট পাঁচজন ছিনতাইকারী ছিল বলে তথ্যে প্রকাশ করা হয়। এদের সবাই মধ্যপ্রাচ্যের বলে বিশ্বাস। এদের নাম যথাক্রমে, খালেদ আল মিধার, মাজেদ মোকেদ, নওয়াক আল হামজি, সলিম আল হামজি এবং হানি হামজোর। আর যে বিমানটি পড়ে গিয়ে বিধস্ত হয়েছিল, এফ বি আই এর সূত্রে ছিনতাইকারীদের যে নামগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো যথাক্রমে সাইদ আল ঘামধি, আহ্মেদ আল হাজানভি, আহমেদ আল নামি এবং জিয়াদ জাহারি।

উপরের উল্লেখিত প্রতিটি ব্যক্তি আত্মঘাতী হামলা চালাতে গিয়ে আজ মৃত। কাজেই তাদের প্রকৃত পরিচয় শুধুমাত্র এফ বি আই প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমেই পাওয়া গিয়েছে মাত্র। আর এদের যোগসূত্র ধরেই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এ সন্ত্রাসী হামলা মুসলিম উগ্রপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত বলে এবং এর শীর্ষে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়দা নামক সন্ত্রাসী সংস্থার নাম জড়িয়ে পড়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে সেদিনের পর থেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একদিকে পশ্চিমা জগৎ অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অদৃশ্য সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। আমরা আরও পরে এর ব্যাপকতা এবং বিশদ ব্যাখ্যায় যাব। এ হামলার সাথে ওসামা বিন লাদেনের নাম জড়িত থাকায় তার বর্তমান আবাসস্থল দক্ষিণ এশিয়া তথা মধ্য এশিয়ায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংযোগকারী দেশ আফগানিস্তানের নাম চলে আসে। আর এ দেশের ইতিহাস এবং এর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এদেশের গুরুত্ব ও সেখানের সংঘাতের প্রেক্ষাপটই হবে পরবর্তীতে প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেদিন থেকেই সমগ্র আমেরিকাতে এফ বি আই এর তৎপরতা শুরু হয়। চলতে থাকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় তদন্ত আর ধর পাকড়ের পালা। এরই সাথে এ ধরপাকড়ের জের চলতে থাকে সমগ্র পশ্চিমা দেশে যা আজও চলছে। সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ছে আরব এবং মুসলমানদের উপর। এ পর্যন্ত প্রতিটি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আরব মুসলমান আর কোন না কোন ভাবে আল কায়দার সাথে জড়িত বলে কথিত। এফ বি আই তদন্তে এখনও অগ্রগামী রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সেদিন ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে ওয়াশিংটনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্ভাব্য আরও সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে তাদেরকে সমস্ত সরকারী অট্টালিকা খালী করতে বলা হয়। যদিও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পূর্ব নির্ধারিত সফরে ওয়াশিংটনের বাইরে তবুও হোয়াইট হাউজে আতঙ্ক বিরাজমান ছিল। প্রেসিডেন্ট পত্নী ফার্স্ট লেডিকে এফ বি আই নিরাপত্তার জন্যে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বাইরে অন্যত্র নিয়ে যায়। সেদিন আমেরিকার উপ-রাষ্ট্রপতি বর্তমান রাষ্ট্রপতির পিতার সময়কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ ডিক চেনীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। আর্শ্চযের বিষয় যে, সেদিন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত (১২ই অক্টোবর ২০০১) মিঃ ডিক চেনীর কোন খবর পত্রিকা বা টেলিভিশনেও পাওয়া যায় নি।

আমেরিকার ৪৩ তম রাষ্ট্রপতি মিঃ জর্জ ডাব্লিউ বুশ (জুনিয়র), যার পিতা জর্জ ওয়াকার বুশ (সিনিয়র) ছিলেন ৪১ তম রাষ্ট্রপতি, এমনিতেই অনেক বিতর্কিতভাবে ক্ষমতায় আসে। তাঁর আর ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ আল গোরের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট বিতর্ক। যা শেষ পর্যন্ত দেশের সুপ্রীম কোর্টে গড়ায় এবং বুশের পক্ষে আমেরিকায় বিভাজিত মতবাদ দেখা দিলে মিঃ গোর 'গণতন্ত্রের খাতিরে' তার দাবী প্রত্যাহার করলে এ বিতর্কের অবসান হয়। নির্বাচনের বিতর্ক সমগ্র দেশে এবং বিদেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এহেন পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি মিঃ জর্জ ডাব্লিউ বুশ (জুনিয়র) তার পিতার আট বছর পর রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়। কথিত আছে বৈদেশিক নীতি এবং বিদেশ বিষয়ে বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলো সম্বন্ধে মি. বুশের কোন ধারণাই ছিলনা। রাষ্ট্রপতি হিসেবে মি. বুশ তার পিতার সময়কার অনেককেই তার ক্যাবিনেটে স্থান দেয়। তাদের মধ্যে 'গালফ ওয়ার' এর অন্যতম সমর নায়ক জেনারেল কলিন পাওয়ালকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিয়োগ দেয়। আর ঐ সময়কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মি. ডিকচেনী নির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োজিত হয়। নির্বাচনে বিতর্কের কারণে প্রাথমিকভাবে মিঃ বুশ নিজের ইমেজকে দেশের মধ্যে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টায় যখন লিপ্ত ঠিক সে সময়েই ঘটে গেল বিশ্বের ইতিহাসে ভয়াবহ সন্ত্রাস।

নিজের দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের হামলার আশঙ্কাও হয়ত মি. বুশ করে নি বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর। তাই হয়ত মি. বুশ

www.nagorikpathagar.org

তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া একজন পরিপক্ক বিশ্ব নেতার মত বক্তব্য রাখতে অসমর্থ হওয়ায় প্রাথমিক পরিস্থিতি ঘোলাটে এবং তার উক্তিগুলো অসংলগ্ন বিবেচিত হয়ে বিতর্কিত হয়েছে এবং এ বিতর্ক সহজে থামবার নয়।

ঐ দিনটি মানে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনটি, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মি. বুশের জন্যে শুরু থেকেই ভাল যায় নি এবং এ দিনের পরের থেকে প্রতিটি দিনই ঘিরে থাকবে বিশ্ববিবাদ আর সংঘাতের মাঝে। সেদিন জর্জ বুশ সকালের দিকে ফ্লোরিডার এক স্কুলে ভাষণ দেবার কথা ছিল। স্মরণযোগ্য যে, এ ফ্লোরিডা রাজ্যেই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক হয়। দেশের জনগণ চেয়েছিল রাষ্ট্রপতি এতবড় ঘটনা ঘটবার পর তাৎক্ষণিকভাবে রাজধানীতে ফিরবে কিন্তু তেমনটা হয় নি। রাষ্ট্রপতি অবশ্য রাজধানীতে সেদিন বিকেলে ফিরে আসে। জনমনে এটি একটি ক্ষোভের বিষয় থাকলেও পরের ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে বুশ এ বিষয়টি পুষিয়ে নেয়।

রাষ্ট্রপতির তাৎক্ষণিক রাজধানীতে ফিরে না আসার কারণ হিসেবে তার নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের পরামর্শ ছিল বলে পরে জানা যায়। ফ্লোরিডায় রাষ্ট্রপতিকে এ মর্মান্তিক ভয়াবহ খবর জানানো হয়। সে সময় মি. বুশ ফ্লোরিডার সারাটোমায় একটি প্রাথমিক স্কুলে ছিল। নিউইয়র্কে দ্বিতীয় হামলার পরপরই হোয়াইট হাউজের স্টাফ প্রধান মি. এনড্রুকার্ড রাষ্ট্রপতিকে এ খবর জানায় এত মি. বুশ অত্যন্ত বিচলিত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান মিস্ কন্ডলিজা রাইস্ রাষ্ট্রপতিকে ঐ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। ততক্ষণে ঐ স্কুলের ছাত্র শিক্ষকগণ টেলিভিশনের মাধ্যমে এ ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে। এসব বিবরণ শোনার পরও মি. বুশ তার পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সমবেত বাচ্চাদের উদ্দেশে কিছু বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। সে মুহূর্তে তাকে এ ভয়াবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বিমর্ষিত এবং বিচলিত দেখাচ্ছিল। মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে আসছিল। তবুও মি. বুশ যতটা সম্ভব নিজেকে সামলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও এ ধরনের জাতীয় বিপর্যয়ে সে মুহূর্তে তার নিজেকে সংযত করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পরামর্শদাতাদের হাতে সঁপে দিল। প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর রাষ্ট্রপতি আবার স্কুলের প্রশাসনিক হলে ফিরে আসে। ততক্ষণে ঐ কাউন্টীর স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জমায়েত হলে তাদের

www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি মি. জর্জ ডাব্লিউ বুশ বলে 'আমেরিকার জন্যে এটি একটি কঠিন সময়।' এ কথা বলার পর পরই আরও ঘোষণা দেয় যে, সে ইতিমধ্যেই এ ঘটনার উপর বিশদ তদন্তের আদেশ দিয়েছে এবং তার ভাষায় 'এ বীভৎস কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতেই হবে।'[২] রাষ্ট্রপতি তার নিরাপত্তা কর্মীদের অনুরোধে আরও বিস্তারিত তথ্য জানার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে ওয়াশিংটনে ফেরার বদলে বার্কস্লেড বিমান ঘাঁটিতে চলে আসে। এ সময়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সরকারী উড়োজাহাজে, যেটিকে অনেকেই উড়ন্ত হোয়াইট হাউজ বলে থাকে, এয়ার ফোর্স-১ নিয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরে ন্যাবেরাস্কা রাজ্যের, ওমাহাতে অবস্থিত বিমানবাহিনী ঘাঁটিতে পৌছে। যতক্ষণ রাষ্ট্রপতির বিমান এয়ার ফোর্স-১ (এয়ার ফোর্স ওয়ান) আকাশে ছিল সেটি আকাশে দুটি এফ-১৫ এবং এফ-১৬ ফাইটারের সতর্ক পাহারায় ছিল (এ বিবরণের সাথে অনেক পাঠকই হলিউডের সাড়াজাগানো হ্যারিসন ফোর্ড অভিনীত চলচ্চিত্র 'এয়ার ফোর্স ওয়ান এর সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন)। যদিও মি. বুশের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা রাষ্ট্রপতিকে রাজধানীতে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিল তবুও নিরাপত্তা কর্মীদের চাপে তা কার্যকর হয় নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে ঐ নিউইয়র্কে সঠিক কি ঘটেছিল তার সরকারী বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় নি যদিও বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের দুটি টাওয়ারেই প্রায় একশতের উপরে গোয়েন্দা কর্মচারী সেখানকার মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে সেদিনও হাজির ছিল। কিন্তু অতদূর থেকে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা কর্মীরা বুঝতেও পারে নি যে, সেদিন ঐসব গোয়েন্দা সদস্যদের নিকট থেকে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবার কথা নয়। তাই রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল যে, পরবর্তী হামলা হোয়াইট হাউজ এবং এয়ারফোর্স ওয়ানে হতে পারে। আর সে কারণেই তারা আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে সম্ভাব্য বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চায় নি।[৩] ঐ মুহূর্তে হয়ত তারা জানতেও পারে নি যে, এটি কোন পারমানবিক অস্ত্রের হামলা ছিলনা।

এদিকে পেন্টাগনে হামলা, পিটস্‌বার্গে আরও একটি বিমান বিধ্বংস, সব মিলিয়ে ওয়াশিংটনে পরিস্থিতি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত সকল গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা বিভিন্ন

২। টাইম ম্যাগাজিন, স্পেশাল ইস্যু, সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১।
৩। নিউইয়র্ক ইস্যু ঃ সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

সরকারী ভবন গুলো খালী করাতে থাকে। এ গোয়েন্দা সদস্যের মতে ওয়াশিংটনের ইতিহাসে এ ধরনের পরিস্থিতি দু'শ বছর পূর্বে স্থাপিত এ শহরে ইতিপূর্বে ঘটে নি।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউজের জন্যে নির্ধারিত গোয়েন্দা সদস্য, পশ্চিম প্রান্তে উপ-রাষ্ট্রপতির নির্ধারিত অফিস কক্ষ থেকে মি. ডিক চেনীকে একরকম টেনে বের করে নিয়ে হোয়াইট হাউজের পিছনের মাঠের মাটির নীচে পারমানবিক অস্ত্র থেকে মুক্ত থাকার মত তৈরী করা বাংকারে নিয়ে যায়। সেখানে উপ-রাষ্ট্রপতির সাথে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের একত্র করার পর উপ-রাষ্ট্রপতিকে নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে হামলার কথা জানিয়ে হোয়াইট হাউজে সম্ভাব্য হামলার আশংকা করা হয়। একই সাথে হোয়াইট হাউজ থেকে মি. ডিক চেনীর স্ত্রী এবং ফার্স্ট লেডী লারা বুশকেও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা হয়। হোয়াইট হাউজে উপস্থিত সবার মধ্যেই কিছুটা আতঙ্কের ছায়া পড়লেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা তখনও অনেকেই উপলব্ধি করতে পারে নি। কিছুক্ষণ পরে টেলিভিশনের পর্দায় এ দৃশ্য বিশেষ করে নিউইয়র্কের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখার পরও উপস্থিত কেউই সরাসরি প্রচারকৃত ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছিলনা। এমনকি আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মিসেস লারা বুশও নয়। শুধুমাত্র হতভম্বের মত টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে ছিল। কেউ ভাবতে পারছিলনা যে, আমেরিকার মত দেশের একেবারে মধ্যস্থলে এ ধরনের সন্ত্রাস ঘটাবার সাহস পৃথিবীর কোন দেশ বা সংস্থা রাখতে পারে।

ওয়াশিংটন ডিসি (পুরো নাম ওয়াশিংটন, ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া) বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকার রাজধানী। এ ধরনের জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করবার অগ্রিম পরিকল্পনা থাকলেও সেদিন কোনভাবেই তা কার্যকর করা যায় নি। সেদিন দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসি, তৃতীয় বিশ্বের যে কোন অগোছালো শহরের মতই মনে হচ্ছিল। রাস্তার উপরে গাড়ীগুলো বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে চলতে গিয়ে বিরাট যানজটের সৃষ্টি করে ফেলেছিল। এ যানজটের ফলে সরকারী ভবন এমনকি হোয়াইট হাউজ থেকেও গাড়ীগুলো বের করে আনতে পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মীদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছিল। এ দৃশ্য অবলোকন করতে গিয়ে এক সরকারী সংস্থার নিরাপত্তা কর্মকর্তা তার অফিসে ঢুকতে না পেরে রাস্তার পাশেই গাড়ী থেকে নেমে

www.nagorikpathagar.org

উচ্চস্বরে এক পুলিশ অফিসারের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়তে গিয়ে বলে উঠল 'আমি আমাদের এ অবস্থায় মোটেও বিস্মিত নই। অন্ততঃ আমি ভাল করেই জানি আমাদের যত অগ্রিম পরিকল্পনাই থাকুকনা কেন কার্যক্ষেত্রে আমরা কখনই আমাদের কর্মকর্তাদের শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরেও নিয়ে যেতে পারব না আর নিরাপত্তাও দিতে পারব না।' রাগে দুঃখে তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল এই কর্তাগোছের ব্যক্তিটির। অন্ততঃ তার জানা মতে, এ শহরের গোঁড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ হয়ত এ ধরনের পরিস্থিতি হতেঁ পারে তা শুধুমাত্র পরিকল্পনা তৈরী করার লক্ষ্যে মনে করলেও বাস্তবে উদ্ভব হতে পারে বলে মনে করতে পারে নি। এ শহরের বয়স দু'শ দশ বছরের উপরে হয়েছে কিন্তু আজকের মত এরূপ অব্যবস্থা বোধ হয় কখনই হয় নি।

আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি মি. জর্জ ওয়াশিংটনের নামে নামকরণ করা হয় আমেরিকার রাজধানী শহরের। এ শহর কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অবস্থিত। তাই এর নামের সাথে ডিসি যোগ করে ওয়াশিংটন নামক অঙ্গরাজ্য থেকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। ১৭৯০ সনে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে এ শহরকে দেশের রাজধানীর মর্যাদা দেয়া হয়। শহরটি বিখ্যাত পটোম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত। পটোম্যাক নদীর দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এ শহরকে ভার্জিনিয়া রাজ্য থেকেও আলাদা করে। শুধুমাত্র রাজধানী শহরের জন্যে আটাশি বর্গ মাইল জায়গা মেরিল্যান্ড রাজ্য থেকে আলাদা করে নেয়া হয়। যদিও ওয়াশিংটন শহরতলী এবং মেট্রোপলিটান এরিয়া প্রায় ২,৮০৯ বর্গমাইল তবুও রাজধানী এলাকা ফেডারেল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত। উল্লেখ্য, রাজধানী এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট যে কোন অট্টালিকার উচ্চতা কংগ্রেস ভবনের উচ্চতার সমান বা বেশী হলে তা তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয়না।

এ বর্ণাঢ্য ঐতিহাসিক শহরে ওয়াশিংটন মনুম্যান্টকে ঘিরে রয়েছে চারটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। এসব দর্শনীয় স্থানের অবস্থান মনুম্যান্ট থেকে চারটি সমকোণে অবস্থিত। এদের মধ্যে রয়েছে হোয়াইট হাউজ, কংগ্রেস ভবন, লিঙ্কন আর জেফারসন মেমোরিয়াল।

এ ঐতিহাসিক শহর এবং আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন সেদিন, মানে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে, এক বিশৃঙ্খল শহরে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, নিউইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র হামলা হবার প্রায় আধা ঘন্টার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে কেবলমাত্র হোয়াইট হাউস ছাড়া আর কোথাও নিরাপত্তা জোরদার করা বা জরুরী পদক্ষেপ নেবার ব্যবস্থা করা হয় নি এমন কি কংগ্রেস ভবনেও নয়। পেন্টাগনে হামলা হবার পরেও কংগ্রেসের সদস্যদের জন্যেও জরুরী ভিত্তিতে নিরাপত্তার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। সেদিন সকালে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মিঃ ট্রিন্টলট কংগ্রেস ভবনে তার নিজস্ব চেম্বারে বসে নিউইয়র্কে আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলাকে নিন্দা করে প্রেস রিলিজ তৈরী করছিল। তখন হঠাৎ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই পটোম্যাক নদীর অপর পাড়ের পেন্টাগনের দিক থেকে ঘন কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে নিজেই তার চেম্বারের কর্মচারীদের নিয়ে নিরাপদ জায়গার জন্য বেরুতে গিয়ে দেখে তখনও পর্যটকরা কংগ্রেস ভবনের সামনে ভীড় করে আছে। মনে হল এসব পর্যটক যার মধ্যে প্রচুর বিদেশীও রয়েছে যারড এতবড় দুর্ঘটনার কোন খবরই পায়নি।[৪]

অপর দিকে রাষ্ট্রপতি বুশ এয়ারফোর্স ওয়ান এ করে সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ব্ল্যাকস্‌ডেল বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে উপস্থিত হলে তাকে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বিল্ডিং নং ২৪৫ এ নিয়ে আসা হয়। বুশ সেখানে এসেই তাৎক্ষণিক বক্তব্যে বলে 'আমাদের স্বাধীনতা আজ সকালে কিছু সংখ্যক বিবেকহীন কাপুরুষদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে'। এই মন্তব্যটুকু করেই রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করে। অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল লাতিন আমেরিকা সফর সংক্ষিপ্ত করে রাজধানীতে ফিরে আসতে আসতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে যায়। আর তখনও রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনে ফেরে নি। ওয়াশিংটনে তখন প্রায় অচলাবস্থা। কংগ্রেসভবনে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান সদস্যরা সমভাবে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি নিয়ে বিব্রত। অনেকেই আশ্চার্যান্বিতও হয় এ কারণে যে, নিউইয়র্কের এহেন দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রপতির সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা রাজধানীতে ফিরতেও সময় নিচ্ছিল। শুধু তাই নয়, এ মুহূর্তে তার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়া প্রধান কর্তব্য ছিল কিন্তু সে নিজেই রাজধনীতে অনুপস্থিত। বাহ্যত অনেকেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতির এহেন ব্যবহারে ক্ষব্ধ হয়ে উঠে। রাষ্ট্রপতির বিলম্বে রাজধানীতে পৌছার কারণ হিসাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্ত্রাসীদের হোয়াইট হাউস আক্রমণের পরিকল্পনা প্রমাণ থাকায় তারা রাষ্ট্রপতির ওয়াশিংটনে ফিরে আসায় বাধা দিয়েছিল, বলে প্রচার করলেও এতে খুশী হতে পারে নি বুশের বিরোধীরা। যদিও দেশের এহেন পরিস্থিতির

৪। টাইম: স্পেশাল ইস্যু ঃ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

প্রেক্ষিতে এ ঘটনা থেকে কেউই রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চেষ্টা করে নি। রাষ্ট্রপতির এহেন আচরণে অনেক রিপাবলিকানরা সেদিন টেলিভিশনে প্রশাসনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা কাউন্সিলর মিঃ কারেন হিউজকে ঘনঘন দেখাবার ব্যাপারটিতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সেদিন মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন অবস্থান থেকে তাকে পর্দায় তুলে ধরলেও তার চেহারায় বিষন্নতার ছাপ দেখা গিয়েছিল। তারা চেয়েছিল তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেবে যে, আমেরিকা কাপুরুষদের ভয়ে লুকিয়ে থাকার মত জনগণের দেশ নয়। কিন্তু তেমনটি হয় নি। রাষ্ট্রপতি বুশ ঠিকই দক্ষিণ লনকে পেছনে রেখে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয় কিন্তু তখন দিন পেরিয়ে প্রায় রাত আটটা বেজে তিরিশ মিনিট। ভাষণের সময় রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল। কিছু অপ্রতিভও মনে হয়েছিল। পরের দিন ঠিকই জর্জ বুশ দক্ষিণ লনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেয় যাতে সে এ হামলাকে 'একটি যুদ্ধের সূচনা' বলে আখ্যায়িত করে। আমেরিকার এ দুর্যোগের সময়ে বুশ প্রায় দশ ঘন্টা পরে জাতিকে সম্বোধন করার বিষয়টি হয়ত ভবিষ্যতেও তাকে পীড়া দেবে। শুধু তাই নয়, প্রায় তিনদিন পরে রাষ্ট্রপতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র সফরে যায়। এ বিষয়টিও ভবিষ্যতে রিপাবলিকানদের জন্য পীড়াদায়ক প্রমাণিত হতে পারে।

জর্জ বুশের (জনিয়রের) জন্যে হোয়াইট হাউস কোন অপরিচিত জায়গা নয়। ইতিপূর্বেও সে বহুবার ওয়াশিংটনে সফরের সময় তার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতে এসেছে কিন্তু কখনই নিজেকে এতটা অসহায় মনে করে নি। এ ভবনে বিগত দু'শ' বছরের ইতিহাসে খুব কম সংখ্যক রাষ্ট্রপতিরাই শান্তিকালীন সময়ে আমেরিকার মূল ভূখন্ডে এরূপ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছে।

ওয়াশিংটন ডিসি-১৬০০, পেনিসেল্‌ভিনিয়া এভিন্যুউতে আঠারো একরের উপরে স্থাপিত ১০০ কক্ষ বিশিষ্ট হোয়াইট হাউস শুধু রাষ্ট্রপতির বাসস্থানই নয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ও বটে। এ ভবনটির নকশা তৈরী করে একজন আইরিশ আমেরিকান স্থপতি ফিলাডেলফিয়ার মি. হোবান। অক্টোবর ১৩, ১৭৯২ সনে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ১৮০০ সনে আমেরিকার শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে একজন রাষ্ট্রপতি জন এডাম্‌স এবং তার পত্নী মিসেস

www.nagorikpathagar.org

এবাগেল এ ভবনের প্রথম বাসিন্দা হয়। পরে এ ভবনের সাদাটে পাথরের জন্যেই হোয়াইট হাউস নামে ১৮০৯ সন থেকে পরিচিত হলেও এ নামের সরকারী স্বীকৃতি পায় ১৯০২ সনে রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের সময়। স্মরণযোগ্য যে, ১৮১৪ সনে ব্রিটিশ বাহিনী ওয়াশিংটন আক্রমণের এক পর্যায়ে এ ভবনটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার পর মূল স্থপতির নির্দেশনায় পুনরায় বর্ধিত আকারে তৈরী সম্পন্ন হয় ১৮১৭ সনে।[৫] সেই থেকে অদ্যাবধি এ ভবনটি ঐতিহাসিকভাবেই রাষ্ট্রপতির বাসস্থান এবং প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রপতির অফিসটি যেহেতু ডিম্বাকৃতির তাই এটি 'ওভাল অফিস' নামেই পরিচিত।

স্বভাবতঃই জর্জ বুশ জুনিয়রের সে দিনটি এবং তার পরের আরও বেশ কিছুদিন নানা ধরনের ধকলের মধ্যে যাবে এবং প্রায় প্রতিদিনই তাকে তার উপদেষ্টাদের নিয়ে হোয়াইট হাউস আর ক্যাম্পডেভিডে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে ব্যস্ত থাকতে হবে। এর পর থেকে প্রতিদিনই বিশ্ব পরিবর্তিত হতে থাকবে। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর ১১,২০০১ এর পর বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রপতির কয়েকটি উক্তি মুসলিম বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১, সকাল নয়টা, স্থান স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি। ডেপুটি সেক্রেটারি স্টেট (উপমন্ত্রী পর্যায়ে) মি. রিচার্ড আর্মিটেজ স্টেট ডিপার্টমেন্টের সপ্তম তলায় একটি জরুরী বৈঠক তলব করে। বৈঠকটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যদের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মিস্ কনডালিজা রাইস্ ছাড়াও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের প্রধান সমন্বয়কারী মি. রিচার্ড ক্লার্ক এবং এফ বি আই সদর থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেয় মি. মূলার। এদের সাথে আরও যোগ দেয় সি আই এর সন্ত্রাস বিরোধী কর্মকর্তা। উপ-রাষ্ট্রপতি ডিক চেনী যোগ দেবার কথা থাকলেও সকালের পর থেকে তাকে অক্টোবর ১৩, ২০০১ পর্যন্ত টেলিভিশনে দেখা যায় নি। সূত্রে জানা যায় যে, তাকে গোয়েন্দা সদস্যরা গোপন স্থানে নিয়ে যায়। মি. ডিক চেনী হার্টের রুগী এবং দু'বার বাইপাসও করা হয়েছে। কাজেই তার প্রায় একমাসের মত দেশের এ পরিস্থিতিতে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে প্রচুর গুজব ছড়ালে প্রতিদিনের অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউ তেমন মাথা ঘামায় নি।

৫। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৪-২০০০।

www.nagorikpathagar.org

ভিডিও বৈঠক শুরু হবার কিছুক্ষণ পরেই এফ বি আই এর কর্মকর্তা মূলারের একজন সহকারী ৯ঃ ৪৫ মিনিটে তাকে জানায় যে, পেন্টাগনেও একটি ছিনতাইকৃত বিমান আত্মঘাতী হামনা চালিয়েছে। মূলার নিজে বৈঠকের সবাইকে জানিয়ে দিল যে, পেন্টাগনে আক্রমণ হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে তখন কলিন পাওয়েলের অবর্তমানে রিচার্ড আর্মিটেজ বৈঠকের আয়োজন করেছিল। পেন্টাগনে আক্রমণের কথা শুনে যে সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী স্টেট ডিপার্টমেন্ট পূর্বনির্ধারিত মিটিংয়ের স্থানে যেতে গাড়ী নিয়ে বের হয়ে পড়েছিল তারা আর বেশীদূর এগোতে পারে নি কারণ ততক্ষণে ওয়াশিংটনের রাস্তা ট্রাফিক জটে স্থবির হয়ে পড়েছিল।

অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত এবং রহস্যময় গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ'র (CIA ঃ সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি) নব নিযুক্ত পরিচালক মি. জর্জ টেনেন্ট তার অত্যন্ত পরিচিত মান্যবর পূর্বতন সেনেটর মি. ডেভিড রোবেনের সাথে সেন্ট রেগিস হোটেলে সকালের প্রাতঃরাশ করছিল। মি. টেনেন্টের অত্যন্ত শখের প্রাতঃরাশের ডিমের ওমলেট তার সামনে নিয়ে আসতেই তার সহকারী একটি সেলফোন তার হাতে দিয়ে অত্যন্ত মৃদু অথচ স্বাভাবিক কণ্ঠে ফোনের অপর প্রান্তের কথা শুনতে অনুরোধ জানালো। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেপকিন দিয়ে ঠোঁটের কোণাটা পরিষ্কার করে চেয়ার থেকে উঠে একটু সরে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তের কথা শেষে অত্যন্ত শান্ত স্বরে উত্তরে বলল,'আমাকে সম্পূর্ণ ঘটনার সংক্ষেপ বলুন'। অপর প্রান্ত থেকে উত্তর আসল, 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দু'টি টাওয়ার আক্রান্ত হয়েছে। আমরা নিশ্চিত এটি কোন দুর্ঘটনা নয়। ছিনতাইকৃত বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হামলা হয়েছে। সমস্ত দৃশ্যপটে এবং প্রাথমিক বিশ্লেষণে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি ভয়াবহ সন্ত্রাস মাত্র'। সি আই এ'র পরিচালক সময়ক্ষেপণ না করেই ফোনে তার কর্মকর্তাদের সি আই এ হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটনে অদূরে ল্যাংলে, ভার্জিনিয়া, পনের মিনিটের মধ্যে জড় হতে বলে প্রাক্তন সেনেটারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাতঃরাশ শেষ না করেই সি আই এ সদরের দিকে রওনা হল। তখনও সে বুঝতে পারে নি আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারই সন্নিকটে পেন্টাগনে আরও একটি হামলা হতে যাচ্ছে। সি আই এ'র পরিচালক কখনও ভাবতেও পারে নি যে, তাকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হবে যদিও আভ্যন্তরীণ তদন্ত তার দায়িত্বে নয় তবুও আমেরিকার বাইরে সমস্ত সন্ত্রাসী তৎপরতার খবর রাখা এবং তাদের

www.nagorikpathagar.org

গতিবিধির খবর, বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরে এফ বি আই সহ সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থাকে সর্বতভাবে প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন তারই কর্তব্য। সে এটাও অনুমান করে যে, এ সন্ত্রাসের সাথে বহিঃবিশ্ব জড়িত রয়েছে। সি আই এ-এর গোঁড়াপত্তন থেকে এ সংস্থা বিশ্বের প্রতিটি দেশে তৎপর রয়েছে। এমনকি শীতল যুদ্ধ চলাকালীন বহুদেশে এ সংস্থার তৎপরতা নিয়ে প্রচুর বিতর্কিত রাজনৈতিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এই সি আই এ'র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান ছিল আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতা এবং ছায়া যুদ্ধ পরিচালনা করা। এরই প্রেক্ষিতে সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয়ই ছিল সি আই এ'র সবচেয়ে বড় বিজয়। মি. টেনেন্টের মনে পড়ে যে, আফগান যুদ্ধ শেষে সোভিয়েতদের অসম্মানীয় পশ্চাদাপসরণের পরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির পিতা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে 'সেম্পেইনের' বোতল খুলে বিজয় উদযাপন করেছিল ঐ ল্যাংলেতেই। সে সময়ের রাষ্ট্রপতি মিঃ জর্জ ডাব্লিউ বুশ (সিনিয়র) নিজেও এক সময় সি আই এ'র ডাইরেক্টর ছিল।

সি আই এ'র জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে দুটি পরাশক্তি সোসালিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া আর পুঁজিবাদী আমেরিকার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। স্মরণযোগ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তৎকালীন তিনটি বৃহৎ শক্তি আমেরিকা, বৃটেন আর সোভিয়েত রাশিয়ার তথাকথিত মিত্র শক্তির জোট, ইউরোপে জার্মানীর এবং এশিয়ায় জাপানের মত উঠতি শক্তির পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ যুদ্ধে মিত্র শক্তির মধ্যে বৃটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি ছাড়াও সর্বতভাবে অবকাঠামোগত প্রচুর ক্ষতি হয়। অন্য দিকে সে তুলনায় এ যুদ্ধের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া আমেরিকার অবকাঠামো মূলক বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। অপরদিকে আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি নামক দু'শহরে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে জাপানে যে ক্ষতি হয় তাতে শুধু অর্থনীতিই ধ্বংস হয় নি, লক্ষ লক্ষ লোকও মারা যায়। এর দায়দায়িত্ব আমেরিকার উপরেই বর্তায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে বৃটেনের শক্তি এবং জৌলুস প্রায় লুপ্ত হয়ে পরে। অন্যদিকে আমেরিকা পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। বিপরীতে সোসালিস্ট অর্থনীতির ধারক বাহক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। ইউরোপ

www.nagorikpathagar.org

দু'বলয়ে ভাগ হয়ে পড়ে জার্মানীকে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে। পৃথিবী দু'মতাদর্শের মধ্যে বিভাজিত হয়ে পরে, শুরু হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। এসব দেশ জাতীয়তাবাদ আর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুই পরাশক্তির বলয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে অবস্থান নিতে থাকে। পৃথিবী বামপন্থী আর ডানপন্থীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর এ ব্যবস্থা চলে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর।

এহেন পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকা মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সমগ্র বিশ্বে নিজের আধিপত্য আর সোভিয়েত প্রসারের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর এ কারণে আমেরিকা সংগঠিত করে বেশ কিছু সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা আর এদের কার্যক্রমের পরিধি সমস্ত বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

এমনি একটি সংস্থা সি আই এ। এর জন্ম হয় ১৯৪৭ সনে। এটি গড়ে উঠে যুদ্ধের সময়ের গোয়েন্দা সংস্থা ও এস এস (OSS: অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস) এর ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে কিছুদিন পর্যন্ত গোয়েন্দাবৃত্তি বিমানবাহিনী আর এফ বি আই এর মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে পালন করা হতো। এ ব্যবস্থায় সমন্বয়হীন গোয়েন্দা তৎপরতার কারণ হয়ে দাঁড়ালে আমেরিকার ব্যর্থতা মিত্রদের জন্যে বিব্রতকর হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময়েও সমন্বয়ের অভাবে গোয়েন্দাবৃত্তি এবং প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য সংগ্রহে আমেরিকা মিত্রদের অনেক পেছনে পড়ে থাকে বিশেষ করে ব্রিটেনের এম আই-৬ এর তুলনায়। বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই অক্টোবর ১৯৪৫ সনে ও এস এস কে বিলুপ্ত করা হয় এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মি. হ্যারি ট্রুম্যান বিশ্বযুদ্ধ পরিবর্তিত বিশ্বে আধিপত্য রক্ষাকল্পে একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের তাগিদ অনুভব করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সনে এক অধ্যাদেশ বলে সি আই এ এবং এন এস এ (NSA: ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি) গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৭ সনেই কংগ্রেস সি আই এ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে দিকনির্দেশনা, সমন্বয় করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে পদক্ষেপের সুপারিশ করা ইত্যাদির জন্যে এন এস সি (NSC: ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল) গঠন করে সি আই এ'র কার্যপরিধি এর আওতায় নিয়ে আসে। সেই থেকে সি আই এ এন এস সি'র নির্দেশক্রমে কার্য শুরু করলেও শীতল যুদ্ধকালীন বিশ্বের নিত্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমশঃই শক্তিশালী হয়ে উঠে। সি আই এ'তে এ পর্যন্ত প্রধান

www.nagorikpathagar.org

পরিচালক হিসেবে নিয়োগ কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা পেশা ভিত্তিক হয় নি; বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকেই এর দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ; সামরিক ব্যক্তিত্ব, কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ এমনকি রাজনীতিবিদও এ পদে নিয়োজিত হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ, জর্জ বুশ (সিনিয়র) এর মত রাজনীতিবিদদের নিয়োগ।

সি আই এ চারটি ভাগে বিভক্ত। ইনটেলিজেন্স ডাইরেক্টরেট, গোপনে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে বিতরণ করে। অন্যদিকে ডাইরেক্টরেট অব অপারেশন সমগ্র বিশ্বে বিভিন্নভাবে গুপ্ত তৎপরতা পরিকল্পনা আর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। আরও রয়েছে ডাইরেক্টরেট অব সাইন্স এবং টেকনোলজী এবং সর্বশেষে ডাইরেক্টরেট অব এডমিনিস্ট্রেশন যার সাথে যুক্ত সি আই এ'র নিজস্ব নিরাপত্তার দপ্তর। এ সংস্থার প্রধান কাজ আমেরিকার জাতীয় লক্ষ্যের (National Aim) সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন করতে সহায়তা করা আর এর জন্যে বিভিন্নভাবে এ সংস্থা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র বিশ্বে।

যদিও এ সংস্থার উপরে এন এস সি'র কর্তৃত্ব রয়েছে তবুও ক্রমেই সি আই এ বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় এবং এর পরিচালকের ব্যক্তিত্বের কারণে ক্রমেই এতই শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, অনেক সময় একে 'অদৃশ্য সরকার' বা 'সরকারের মধ্য সরকার' বলে আখ্যায়িত করে। স্মরণ থাকে যে, সি আই এ'র কার্যপরিধি থেকে আভ্যন্তরীণ আমেরিকাকে বাইরে রাখা হয়েছে। ক্রমেই সি আই এ এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠে যে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই রাজনৈতিক পরিবর্তন থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী বামপন্থী আন্দোলনগুলোকে নস্যাৎ করতে স্বকীয় উদ্যোগ তৎপরতা গ্রহণ করে থাকত। অনেক সময় এসব কার্যক্রমের জন্যে সি আই এ তৃতীয় বিশ্বে যেমন ধিকৃত হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রের সরকারের জন্যে বিব্রতকর পরিস্থির সৃষ্টি করেছে। এ সংস্থার কিছু কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫৩ সনে ইরানে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত অভ্যুত্থানের নেতা মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে বিতাড়িত করে রেজাশাহ্ পেহলভীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করণ। ১৯৫৪ সনে গোয়েতেমালায় আমেরিকাপন্থী অভ্যুত্থান ঘটানো, ১৯৬১ সনে 'বে অব পিগস' সমস্যার সময় কিউবাতে ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করা ইত্যাদি। এ ছাড়াও আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থান এবং জাতীয়তাবাদী

www.nagorikpathagar.org

বলে আখ্যায়িত রাষ্ট্রীয় নেতাদের হত্যা ইত্যাদির জন্যেও সি আই এ বিশ্বে চিহ্নিত হয়ে আছে। তবে এ যাবত সি আই এ'র সবচেয়ে বড় স্বার্থক অভিযান ছিল সোভিয়েত বিরোধী আফগান যুদ্ধ।

অনেক সময় সি আই এ'র অত্যধিক তৎপরতার জন্যে সরকার এবং রাষ্ট্রকেও বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয় উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সময়ে 'ওয়াটারগেট' কেলেঙ্কারী এবং ১৯৮৫ সনের রাষ্ট্রপতি রিগানের জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্ণেল অলিভার নর্থ কথিতভাবে স্বউদ্যোগে ইরানের ইসলামিক সরকারকে অস্ত্রের চালান দিয়ে লব্ধ অর্থ দিয়ে নিকারাগুয়ায় মার্কিন স্যান্দানিস্তা সরকারকে উৎখাত করার তৎকালীন চলমান আন্দোলনকে সহায়তা করা এবং পরবর্তিতে উদ্ভাবিত বিব্রতকর পরিস্থিতি ইত্যাদি। পরে এগুলো আমেরিকার ইতিহাসে এক রাজনৈতিক কালো অধ্যায় বলে খ্যাত হয়, এ কারণেই অলিভার নর্থ আর তার তৎকালীন বস্ পয়েন্টডেক্সটার চাকুরীচ্যুত হয় আর এসবের কারণে রিগানের রাজনৈতিক সুনাম ক্ষুন্ন হয়। ইরান-কন্ট্রা বিষয়ে জড়িত থাকার অভিযোগ থেকে রিগান রেহাই পেলেও প্রচণ্ডভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

সি আই এ প্রধান মি. টেনেট অফিসে পৌঁছল ঠিকই কিন্তু বহু ঘাটাঘাটির পরও ঐ সেপ্টেম্বরের সকালে এ সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তিদের বিষয়ে পূর্বের কোন তথ্যই খুঁজে পাচ্ছিল না। এমনকি এ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেও আফগানিস্তানে স্থিত ওসামা বিন লাদেনকে নিশ্চিত ভাবে দোষী বলে সন্দেহ করলেও সূত্রমতে সি আই এ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর শেষাব্দি কতগুলো বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে নি। আর এসব বিষয়ে প্রায় প্রতিটি সংস্থা নিজ নিজ তথ্য উপস্থাপন করছিল। এসব তথ্যের গরমিল হওয়াতেই অদ্যাবধি এ সন্ত্রাসের উপর কোন শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় নি। পরে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তাও অত্যন্ত দুর্বল প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে স্থাপিত বলে মনে করা হয়। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয় যে, এ সন্ত্রাসের পেছনে 'ইসলামী কট্টরপন্থী' একাধিক দলের হাত ছিল এবং অল-কায়দা এদের অন্যতম।

এ তথ্যের উপরে ভিত্তি করে তদন্ত চলতে থাকবে বহুদিন ধরে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দা নামক সংস্থা যার তৎকালীন ঠিকানা তালেবান শাসিত আফগানিস্তান তাতে অন্তত বুশ প্রশাসনের কোন

www.nagorikpathagar.org

সন্দেহ থাকলনা। ঘটনার দিন রাতের মধ্যেই এফ বি আই তাদের তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এ তথ্যই জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলকে দিয়েছিল।

এ ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে এফ বি আই এবং সি আই এ'র মধ্যে বিপরীত মতামত পাওয়া যায়। এফ বি আই এর মতে এ সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে এবং এ সন্ত্রাস ঘটানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা একের অধিক সন্ত্রাসীদলের সদস্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এখনও এফ বি আই, প্রদত্ত সূত্রের কথিত ছিনতাইকারীদের দু'একজন ছাড়া বাকী উনিশ জনের মধ্যে সতের জনেরই প্রকৃত ঠিকানা, নাম, আর এদের বিস্তারিত বিবরণ সঠিকভাবে বের করতে পারে নি অবশ্য আরও পরে কিছু কিছু তথ্য প্রচার করে।

অপরদিকে সি আই এ'র মতে সন্ত্রাসীরা পাঁচ ছয়টি গ্রুপে বহুদিন ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং এদের সকলেই কারিগরী ভাবে উঁচুদরের প্রফেশনাল বলে মনে করে। তবে ঐ দিন সন্ত্রাসীদের পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন কপাল জোরে সঠিক এবং নির্ভেজালভাবে ঘটেছে একথা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, খোদ আমেরিকার এতোগুলো গোয়েন্দা সংস্থার নাকের ডগা দিয়ে এ দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সমগ্র বিশ্বে এদেশের র্দুবলতাকে উন্মোচন করে গেল আর এখানেই সি আই এ সমেত সকল গোয়েদা বাহিনীর ক্ষোভ।

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১, এর পর থেকেই প্রায় দুসপ্তাহ পর্যন্ত আমেরিকার অনেক গোয়েন্দা সংস্থা এ ধরনের সন্ত্রাসের সাথে ওসামা বিন লাদেনের যুক্ত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। অনেক সদস্য মনে করে যে, ওসামা বিন লাদেন নামক লোকটি আফগানিস্তানের মত একটি পশ্চাদপদ দেশের পাহাড়ের গুহা থেকে এ ধরনের অত্যন্ত নিখুঁত সমন্বয়ে এত বড় এবং ব্যাপক সন্ত্রাস ঘটানোর ক্ষমতা রাখে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাদের এ মতামতের পেছনে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল। এগুলোর প্রধান হল এত বিশাল আকারের সন্ত্রাস ঘটাতে হলে ওসামার মত একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে কোন কোন আমেরিকা বিদ্বেষী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতও থাকতে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করে। ওসামার আল-কায়দা সংগঠন বোমা হামলায় পারদর্শী হলেও এ ধরনের অকল্পনীয় হামলার পরিকল্পনা করে তাকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার মেধা রাখে কিনা সে ব্যাপারেও প্রচুর

www.nagorikpathagar.org

সন্দেহ থেকে যায়।[৬]

এতসব মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর ২৩, ২০০১ সনে সেক্রেটারি স্টেট কলিন পাওয়েল টেলিভিশনে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলে 'আমরা সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে এবং আমেরিকানদের সামনে একটি জোরালো মামলা দাঁড়া করাবো তাতে প্রমাণিত হবে ওসামা বিন লাদেন এ সন্ত্রাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত'। এর মধ্য দিয়ে সরকারীভাবে সৌদী বংশদ্ভূত ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করলেও জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট কোন শ্বেতপত্র প্রকাশের আগ্রহ দেখায় নি। এর কারণ তাদের মতে 'এখনও এমন কোন পোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নি যা জনগণ বিশ্বাস করবে।' যদিও এ বিষয়ের উপর অক্টোবর ২০০১ এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বুশ প্রশাসন বলেছে ওসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত বিধায় জনসমক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। আজও (এ লেখা শেষ করা পর্যন্ত) বিস্তারিত তথ্য জন সম্মুখে আসে নি। এ বিষয়ে সি আই এ এই সন্ত্রাস সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারে নি; বরং একজন সি আই এ কর্মকর্তা বলে, 'একদিন হয়ত সমস্ত তথ্যই সামনে আসবে তবে সেদিনটি কবে আসবে তা এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।'

এফ বি আই অনেকটা নিশ্চিতভাবেই আল-কায়দা গোষ্ঠীকে দায়ী করে সি আই এ'র থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করতে শুরু করে। এফ বি আই এর অনেক কর্মকর্তার মতে, আমেরিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা যে বহুদিনের তা ১৯৯৩ সনে একই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বোমা হামলার হোতা মিশরীয় বংশদ্ভূদ ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু রামজে ইউসুফের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়েছিল। ঐ সময় ঐ বোমা হামলার পেছনে পরিকল্পনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত রামজে ইউসুফের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় রাসায়নিক আক্রমণ থেকে শুরু করে পাতাল পথ আক্রমণের পরিকল্পনা রয়েছিল বলে বিশ্বাস। আর এর পেছনে ওসামা ও আল-কায়দার হাত ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে নি এফ বি আই বা সি আই এ।

আপাত দৃষ্টে মনে হয় আমেরিকায় এ সন্ত্রাসী আক্রমণ নিয়ে সি আই এ এবং এফ বি আই এ'র মধ্যে বেশ মতভেদ আর দূরত্ব বেড়েছে। এমনিতেই

৬। নিউ ইয়র্ককার : অক্টোবর ৮, ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার পর থেকে সি আই এ তার পূর্বের জৌলুস অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।

শীতল যুদ্ধের অবসানের পর সি আই এ'র বিশ্বব্যাপী কর্মতৎপরতা প্রচুর হ্রাস করা হয়। এসব ক্ষেত্রে অনেক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোয়েন্দা সদস্যদের ছাটাই করে সি আই এ'র বাজেট কম করা হয়। এমনকি যেসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে ইতিপূর্বে সি আই এ'র সহযোগিতা ছিল তাও ক্ষেত্র বিশেষে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর ফলে আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার মত দেশ ও অঞ্চলে সি আই এ আঞ্চলিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যে সি আই এ'র কর্মতৎপরতা থাকলেও তা আগের মত এত ব্যাপক নয় বলেই ইসরায়েলের 'মোসাদ' (MOSSAD) এর উপরে নির্ভর করতে হয় বেশী তেমনি এ সময়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরের তথ্যের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে পাকিস্তানের আই এস আই (ISI : ইন্টার সার্ভিস ইন্টালিজেন্স) এর সক্রিয় সহযোগিতা।

সি আই এর কর্মতৎপরতা কম করবার পেছনে আমেরিকার একক সুপার পাওয়ার হবার কারণই বেশী। যেখানে একসময় পাকিস্তানে সি আই এ'র উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশী সেখানে সূত্রমতে মাত্র একজন প্রাক্তন এজেন্টই করাচীতে রয়েছে। অথচ করাচীতেই বর্তমানে প্রচুর সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রিত রয়েছে বলে বিশ্বাস। তেমনি ভাবেই বাংলাদেশের ঢাকাতেও মাত্র একজন স্টেশন অফিসারই সি আই এ'র কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে প্রকাশ। যদিও বর্তমান আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস আমেরিকার বিরুদ্ধেই মাত্র তবুও সি আই এ'র কার্যক্রম মুসলিম দেশগুলোতেও অনেক কমিয়ে আনা হয়েছিল।

মাঝে মধ্যে সি আই এ'কে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করলেও তাদের খুব একটা কিছু করার মত ক্ষমতা দেয়া হতনা। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সময়ে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুসানবেতে একটি কেন্দ্র খোলা হয়। এর দায়িত্ব দেয়া হয় মি. বায়েব নামক এক অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে কিন্তু তাকে সেরূপ কোন ক্ষমতা দেয়া হয় নি। তার মতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তালেবানদের উত্থান আর সৌদী বংশদ্ভূত সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন পর্যন্ত এ সবেরই রিপোর্ট দেয়ার পরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় নি। এমনকি এসব সন্ত্রাসী

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রের বিস্তার প্রাক্তন সোভিয়েত মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোতেও হয়েছে সি আই এ'র নাকের ডগা দিয়ে। মি. বায়েবের মতে সি আই এ'র এ খর্বিত কর্মতৎপরতাই বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে।

আমি মোটামুটিভাবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সি আই এ'র অতীত এবং বর্তমানের বর্ণনা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলাম যাতে আরও পরে আশির দশকে সি আই এ'র 'ইসলামী জেহাদের' সূচনা এবং পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা সহজে তারা অনুধাবন করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপতি বুশের সন্ত্রাস বিরোধী প্রত্যয়

'এ হামলার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করবই।'

আমেরিকায় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনের সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই আমেরিকার সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যুদ্ধের আর প্রতিশোধের ভাষায় ২৪ ঘন্টা সরাসরি প্রচার করতে থাকে। এসব প্রচার একদিকে যেমনি আমেরিকান জনগণকে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধের জন্যে ক্ষেপিয়ে তোলে তেমনি সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং দেশগুলোকে সংকিত করে তোলে। আমেরিকার টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সরকারী ভাষ্যের অপেক্ষা না করেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ আক্রমণকে 'ইসলামী মৌলবাদীদের' দ্বারা সংগঠিত বলে আখ্যায়িত করে ওসামা বিন লাদেন এবং তার সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়দার উপরে সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত দিতে থাকে। পাল্লা দিয়ে শুরু হয় একতরফাভাবে নিত্য নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটন আর উত্তেজক শব্দের ব্যবহার। এসব কারণেই ঐ দিনই কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে মুসলমান আমেরিকানদের উপর হামলা শুরু হয় যা চলতে থাকে বহুদিন।

আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো প্রায়শঃই যে কোন সন্ত্রাসের পেছনে তদন্তপূর্ব অবস্থাতেই ইসলামিক মৌলবাদীদের হাত থাকার কথা নির্বিচারে প্রচার করতে থাকে। এর কারণ হিসেবে মুসলিম দেশগুলোতে এসব প্রচার যন্ত্রের বিরুদ্ধাচারণ করে বলা হয় যে, এসব চ্যানেল একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাই অধুনা কাতারের একটি আরবী ভাষার চ্যানেল 'আলজাজিরা নেটওয়ার্ক' অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এ চ্যানেল নিয়ে আমেরিকার প্রচার যন্ত্রগুলোর গাত্রদাহের শেষ নেই।

এ প্রসংগে বলতে হয় ১৯৯৫ সনে ওকলাহোমা সিটিতে ব্যাপক বোমা হামলার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ প্রায় যন্ত্রচালিতের

www.nagorikpathagar.org

মত ইসলামিক মৌলবাদীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশনা করে। এর সাথে সাথেই সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোতে তদন্তের পূর্বেই ইসলামিক মৌলবাদীদের জড়িত থাকার ভাষ্য প্রচার করে ফেলে। পরে যখন প্রকৃত ঘটনা তদন্তের পর আমেরিকার অমুসলিম দ্বারা সংগঠিত হয়েছে বলে চিহ্নিত হলে এ সমস্ত চ্যানেলগুলো আগের ভাষ্য বেমালুম চেপে যায়। যদিও এর পরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করবে বলে জানালেও ১১ই সেপ্টেম্বরের পরেও ঐ একইভাব দেখা যায়। হামলার বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচারণায় উত্তেজিত জনতাকে প্রশমিত করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমেরিকান রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ অনেক বেফাঁস কথা বলে সমগ্র বিশ্বে বিতর্কের ঝড় তোলে। এসমস্ত বেফাঁস উক্তিই পরবর্তীতে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আর পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে সৃষ্ট টানাপোড়েন জনগণ পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ ধরনের উত্তেজনার ফলে সন্ত্রাসবিরোধী মুসলিম দেশের সরকারদের জন্যে তাদের জনগণের বিক্ষোভ সামাল দিতে আজও বেগ পেতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এমনি আরও বহু পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ বুশের রাস্তা ধরে বেফাঁস কথা বলে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ যুদ্ধ কি সন্ত্রাস বিরোধী না আমেরিকার হার্ভাডের বিখ্যাত প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের তত্ত্ব 'ক্ল্যাশ অব দি সিভিলাইজেশান' (সভ্যতার সংঘাত)?

প্রচার যন্ত্রের বদৌলতেই হোক অথবা অন্য কোন অনুমেয় তথ্যের কারণেই হোক, সেদিন বিকেলের মধ্যেই আমেরিকার প্রশাসন থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সদস্য সকলেই একপ্রকার সাব্যস্ত করে ফেলে যে, এ সন্ত্রাসের জন্যে ওসামা বিন লাদেনই দায়ী। এসব উক্তি আর প্রচার যন্ত্রের অতিরঞ্জিত কথাবার্তা সমগ্র আমেরিকাকে যুদ্ধংদেহী করে তোলে। ওসামা বিন লাদেনকে প্রাথমিকভাবে যে শত্রু হিসেবে সনাক্ত করে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বলে ঘোষণা দেয় হল, যুদ্ধে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে কংগ্রেস কর্তৃক ক্ষমতা প্রদানের।

নিউইয়র্ক আর পেন্টাগনে হামলার পরের দিন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ এ সন্ত্রাসের হোতা ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' শুরু করবার মত হুমকি দিয়ে বসে। রাষ্ট্রপতি বুশ হয়ত সে মুহূর্তে বুঝতেও পারে নি যে শব্দটি সে উচ্চারণ করল সেটি তার মুখে শোভা পায় নি। তার হয়ত জানাও ছিলনা 'ক্রুসেড' শব্দটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যে কত পীড়াদায়ক উত্তেজক শব্দ।

www.nagorikpathagar.org

'ক্রুসেড' শব্দটি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা এবং পরিচালনার সাথে যুক্ত।

ইতিহাসের পাতায় মুসলমান আর খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মপ্রচার নিয়ে এবং উভয়েরই পবিত্র স্থানগুলো দখল আর পুনঃদখল নিয়ে হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস 'ক্রুসেড'। এতগুলো বছরের মধ্যে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ প্রায় ১৬টি 'ক্রুসেড' অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধগুলো সূচনা হয় মুসলমানদের নিকট হতে পবিত্র নগরী জেরুজালেমের পবিত্রতম স্থানগুলো দখল নিয়ে। প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের অক্রমণ করে জেরুজালেম নগরীর 'হোলি স্কেলপ্‌চার' চার্চ, যার সাথে জিসাস ক্রাইস্ট বা যিশুর পার্থিব জীবনের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়, সেটাকে দখল করা নিয়ে। এযুদ্ধ ক্রমান্বয়ে প্রায় দু'শ' বছর চলে এবং পরে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন খ্রীষ্টানদের সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করে মুসলমানরা সিরিয়া দখল করে নেয়। যদিও ইতিহাসে ১৬টি ক্রুসেডের (Crused) কথা উল্লেখ আছে তবুও ইতিহাসবিদরা ৮টি যুদ্ধকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে ১০৯৯ থেকে ১১৮৭ সন পর্যন্ত জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের হাতে থাকে। ১১৮৭ সনে ইতিহাস বিখ্যাত সালাউদ্দিন আইয়ুবাইড জেরুজালেম দখল করে নেয়। পরে ১২২৯ সনের মধ্যে আইয়ুবাইডরা দামেস্ক থেকে কায়রো পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসে। প্রতিটি ক্রসেডের ফলশ্রুতিতে খ্রীষ্টান বিশ্ব বিশেষ করে তৎকালীন ইউরোপে মুসলমানদের সমকক্ষ হবার জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক কৌশলের পরিবর্তন আনতে থাকে। প্রতি ক্রসেডেই খ্রীষ্টান জগতের উন্নতির একটি অধ্যায় বলে ধরা হয়।[১]

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মুখে ক্রুসেডের উক্তি যদিও পরে আর শোনা যায় নি তবে এর সমালোচনা পশ্চিমা বিশ্বেও প্রচুর হয়েছে। এর মধ্যে ইতালীর প্রধানমন্ত্রীও হঠাৎ করে পশ্চিমা সভ্যতা আর ইসলামিক সভ্যতাকে তুলনা করলে আরেক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায় কিন্তু পরে প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে। বৃটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচারও কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। সব মিলিয়ে পশ্চিমা বিশ্বই এ সংঘাতকে সভ্যতার সংঘাতে রূপান্তরিত করবার দায়িত্বে এগিয়ে থাকে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আরও একটি মন্তব্য করে সেটি

১। স্টিভেন বানসিম্যান, হিসট্রি অব দি ক্রসেড, ভলিউম -৩ (১৯৫১-৫৪ পুনঃমুদ্রিত ১৯৭৫)।

www.nagorikpathagar.org

নিয়েও প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এক সমাবেশে জর্জ বুশ বলে যে, 'আমি বিচার চাই।' আমেরিকার পশ্চিমে একটি পুরাতন পোস্টারে লেখায় যেমনটা দেখা যায়, ধরতে চাই জীবিত অথবা মৃত (Wanted: Dead or Alive) ঠিক ঐরকম' একথা সে ওসামা বিন লাদেনের উদ্যেশে বলা হয়েছিল তাতে কারোই বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। অনেকে রাষ্ট্রপতির এ উক্তিকে অত্যন্ত সস্তা আর চমকপ্রদ উক্তি বলে আখ্যায়িত করলেও এর পেছনে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে তার অন্তরজ্বালার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এ ধরনের শক্ত কথার শেষ এখানেই হয় নি। এর পরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এককভাবে শক্ত মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে।

সপ্তাহান্তে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ তার উপদেষ্টা সহকারে তার পূর্বসূরীদের মত ক্যাম্পডেভিডে চলে যায় যেখানে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিশদ আলোচনায় বসে। ক্যাম্পডেভিডে পৌঁছে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে জর্জ বুশ তার ব্যক্তিগত উষ্মা প্রকাশ করে বলে, 'আমরা এ ঘটনার প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করবই। যদি তারা গর্তের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে আমরা সেখানে ধোঁয়ার প্রয়োগ করে হলেও তাদেরকে গর্ত থেকে টেনে বের করব।' সেদিন ক্যাম্পডেভিডে রাষ্ট্রপতি বুশ দেশবাসীকে তার যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ক্যাম্পডেভিডে আসার আগের দিন, সন্ত্রাসী ঘটনার প্রায় তিনদিন পর রাষ্ট্রপতি 'গ্রাউন্ড জিরো' বলে আখ্যায়িত নিউইয়র্কের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্বচোক্ষে দেখতে এসে আবার দেশবাসীর উদ্দেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ক্যাম্পডেভিডের বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে মার্কিন কংগ্রেস এবং সিনেটের সম্মতির জন্যে উভয় হাউজকে সম্বোধন করে সমগ্র পরিস্থিতি তুলে ধরবার কথা ব্যক্ত করে সপ্তাহের ছুটির শেষে হোয়াইট হাউজে চলে আসে।

ক্যাম্প ডেভিডে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সপ্তাহান্তের ছুটির স্থান। ১৯৫৩ সনের পূর্বে ক্যাম্প ডেভিডের গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ সাময়িক অবকাশ যাপনের জন্যে নর্থ ম্যারিল্যান্ডের ফেডরিক কাউন্টির ন্যাশনাল পার্কের নিকট এ জায়গাটিকে বেছে নেয়া হয়। প্রথম দিকে রাষ্ট্রপতির ছুটির সময়ের অবকাশ

www.nagorikpathagar.org

যাপনের জন্যে ব্যবহৃত হলেও পরে রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রু ম্যানের সময়ে এ জায়গাকে পরিবর্ধিত করে সরকারী অবকাশস্থল হিসেবে স্থাপন করা হয়। ১৯৪৫ সনে পরিবধনের পর ১৯৫৩ সনে রাষ্ট্রপতি ডিওয়েট ডি আইজেনহাওয়ারের সময় এর নামকরণ করা হয় ক্যাম্প ডেভিড। এ নাম করণ আইজেনহাওয়ারের পৌত্রের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল বলে প্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে এখানে রাষ্ট্রপতির জন্যে পুরাদস্তুর অফিসের স্থান সংকুলান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উনিস্টান চার্চিলের বৈঠকের মধ্য দিয়ে বিদেশী রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদেরকেও এখানে বিশেষ উপলক্ষে স্বাগত জানানোর রেওয়াজ শুরু হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, এই ক্যাম্প ডেভিডেই ১৯৭৮ সনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের উদ্যোগে মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত আর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনের মধ্যে ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ক্যাম্প ডেভিডের পুরো এলাকা প্রায় ২০০ একরের উপরে আর রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে ৬৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।[২]

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পরের সপ্তাহে কলিন পাওয়েলকে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার এ সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন যোগাতে দায়িত্ব দিলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো সমর্থন দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বলে বিবেচিত দেশ, পাকিস্তানের শর্তবিহীন সমর্থনের। পাকিস্তানের সামরিক শাসক তার ব্যক্তিগত এবং দেশের নাজুক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই শর্তবিহীন সমর্থনে রাজী হয়। পাকিস্তানের সমর্থন আমেরিকার জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ছিল। পাকিস্তানের সমর্থনের প্রয়োজন শুধু সামরিক বা কূটনৈতিক অথবা বৃহৎ মুসলিম দেশ হিসেবেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে নি; বরং ওসামা বিন লাদেনের নিবাস কট্টরবাদী বলে পরিচিত তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিবেশী হিসেবেও প্রয়োজন হয়েছিল পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। তার উপরে রয়েছে পাকিস্তানের সমুদ্র সীমা ও উপকূল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। ইতিপূর্বে পাকিস্তানেই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে

২। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৪-২০০০।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে পরিচিত হয়। আরও পরে আমরা দেখব কিভাবে পাকিস্তান আমেরিকার ছায়াযুদ্ধের অংশীদার হয়েছিল।

এর কয়েকদিন পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 'কেপিটাল হিল' এ কংগ্রেসকে সম্বোধন করতে এলে তাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখা যাচ্ছিল। জর্জ বুশ তার রাজনৈতিক জীবনের এবং দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের জন্যে কংগ্রেস ভবনে পৌঁছল। সেদিন কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত সমস্ত সেনেটর, কংগ্রেসম্যান, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, কেবিনেট সদস্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগণ এবং ওয়াশিংটন তার এবং তার দেশের অকুন্ঠ সক্রিয় সহযোগিতা জানাতে উপস্থিত বৃটেনের তরুণ প্রধানমন্ত্রীর সামনে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ গুরুত্বসহ ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভাষণ দেয়। এ ভাষণে দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যে কোন রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস ভাষণের গুরুত্বের দিক থেকে মাহাত্মপূর্ণ বিবেচিত হবে।

জর্জ বুশের এ ভাষণ সরাসরি প্রচারিত হয় সারা বিশ্বে। এ ভাষণের মধ্যেই তুলে ধরা হয় ভবিষ্যতের কর্মপন্থা আর দাবী করা হয় বাইপার্টিজান সমর্থন। অনুমতি চাওয়া হয় বিদেশের মাটিতে প্রয়োজনে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাহিনী সরাসরি যুদ্ধের নিমিত্তে রাষ্ট্রপতিকে সৈন্য নিয়োগের ক্ষমতা প্রদানের।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে ঘটে যাওয়া সমস্ত বিবরণ তুলে ধরে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে ওসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে সঁপে দেবার আহবানের মধ্যে দিয়ে বলে যে, 'পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে এ মুহূর্তে নির্ণয় করতে হবে হয় তারা আমাদের সাথে অথবা সন্ত্রাসীদের সাথে' (Either you are with us or with them)। জর্জ বুশের এ উক্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে যার বিশ্লেষণ চলবে বহু সময় ধরে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের এ উক্তি পৃথিবীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে একক বিশ্ব শক্তির ক্ষমতার দম্ভকে। ইতিপূর্বেই সরকারীভাবে ওসামা বিন লাদেনকে এ সন্ত্রাসী হামলার হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যে আরও আগ বাড়িয়ে বলে যে, 'আজ থেকে যে কোন দেশকে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ এবং সাহায্যকারী দেশ হিসেবে সনাক্ত করা হলে সে দেশকে আমেরিকা শত্রুভাবাপন্ন দেশ বলে মনে করবে।' প্রচুর করতালির মধ্যে জর্জ বুশ আরও বলে, 'আমাদের এ যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়।' সে আরও জানায়, 'এ যুদ্ধ হবে অতি দীর্ঘসময়ের, এত সহজে এ যুদ্ধ শেষ হবার নয়।' আমেরিকার কংগ্রেস সেদিন বুশকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন দেয়। আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন- চীফ, জর্জ বুশ সমগ্র দেশে সশস্ত্রবাহিনীকে প্রস্তুত করে রণক্ষেত্র দক্ষিণ এশিয়ার দিকে পাঠানোর হুকুম জারি করে।

এর মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির হুংকারের জবাবে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের রাষ্ট্রদূত মোল্লা মোহাম্মদ জাইফ জানায়, 'ওসামা বিন লাদেন এ আক্রমণের সাথে জড়িত নয় এবং সে আফগাস্তিানের মেহমান কাজেই তাকে কোন প্রমাণ ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা এবং তাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করতে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার প্রস্তুত নয়।' এর জবাবে আমেরিকা পুনরায় তালেবান সরকারকে আহ্বান করলে এবারও তালেবান সরকার তাদের পূর্ব স্থানে অনড় থাকে। এ সব বাকবিতন্ডার মধ্যে আমেরিকা তার মিত্র দেশগুলো বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া এবং বাকী মুসলিম দেশগুলো থেকে সমর্থন আদায় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে।

এ প্রস্তুতি শেষে আরব সাগর আর 'গালফ' এরিয়াতে এবং উত্তরে রাশিয়াকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজী করিয়ে, আফগানিস্তানের উত্তরে কাজাকিস্তান আর উজবেকিস্তানকে যুদ্ধের লজিস্টিক বেস হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কূটনৈতিক সফলতার কারণে কাবুলে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতিদানকারী তিনটি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ছাড়া সৌদী আরব আর ইউ ই এ তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিলে আফগানিস্তান কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন আর সামরিক শক্তি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে। আমেরিকাকে সাহায্য করতে সামগ্রিকভাবে সামরিক আর কূটনৈতিক দিক থেকে বৃটেন সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। বৃটিশ বিমানবাহী রণতরী এবং বোমারু বিমান ও ফাইটার বিমানগুলো আমেরিকার যুদ্ধ উপকরণের সাথে যোগ দেয়। সে সাথে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার জর্জ বুশের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক মিশনে নেমে পড়ে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ভাষণ আর কংগ্রেসের সায় সব মিলিয়ে বিশ্বের একদিকে যেমন কূটনৈতিক আর সামরিক প্রস্তুতি চলতে থাকে তেমনি অনেক মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে তাদের সরকার আমেরিকাকে সমর্থন জানালে

www.nagorikpathagar.org

জনগণের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। জর্জ বুশ যে সব দেশকে সামরিক অভিযানের জন্য সক্রিয় সহযোগিতার অনুরোধ করে তার মধ্যে বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম প্রধান দেশ থাকলেও প্রধানতঃ দক্ষিণ এশিয়া আর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোই মুখ্য হয়ে থাকে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল মোশারফ তৎক্ষণাৎ এ সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণে এ সমর্থন প্রদানের প্রেক্ষিতের বিশদ ব্যাখ্যা দেয়।

আমেরিকা এ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলে। আমেরিকা ও বৃটেনের নেতৃবৃন্দ বিশ্বকে তথা মুসলিম এবং আফগান জনগণকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, এ প্রস্তাবিত যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আর তাই সামরিক শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি এ যুদ্ধ মানবিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে পরিচালনা করা হবে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের সূচনা হিসেবে আফগানিস্তানের গরীব জনগণের জন্য ইউ এন ও'র মাধ্যমে খাদ্য শস্য পাঠানোর প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবার প্রয়াশ নেয়। কথিত সন্ত্রাসীদের অর্থনৈতিক আর সামাজিক অবরোধের পদক্ষেপ হিসেবে দুই পর্যায়ে মোট পঞ্চাশ ব্যক্তি এবং সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিশ্বব্যাপী তাদের অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান ও তালেবানদের একাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে।

যে সমস্ত ব্যক্তি এবং সংস্থার নাম অবরোধের তালিকার মধ্যে স্থান পায় তার মধ্যে ওসামা বিন লাদেন তার আল-কায়দা আরও অনেক তথাকথিত দাতব্য সংস্থার নামও রয়েছে। উল্লেখ্য, এ সব সংস্থা এবং ব্যক্তি বেশীর ভাগ মধ্যপ্রাচ্যের হলেও সবাই মুসলমান। এ অভিযানের নাম প্রাথমিক পর্যায়ে বাইবেলের থেকে নেয়া 'ইনফিনিট জাস্টিস' রাখলে এটা নিয়ে আরও এক পশলা বিতর্কের সূত্রপাত হলে এর নাম পরে পরিবর্তিত হয়ে 'এনডিওরিং ফ্রিডম' রাখা হয়। পাঠকদের সুবিধার্থে এ যুদ্ধের বিবরণ ঐ নামেই পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

যদিও আমেরিকা এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত যুদ্ধে তার মিত্রদের সহযোগিতায় পরিচালনা করার কথা বললেও বিশেষ কারণে পাকিস্তান আর উজবেকিস্তান ছাড়া আর কোন মুসলিম দেশের সক্রিয় সহযোগিতার তেমন

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজনও পড়ে নি বা চায় নি। সোভিয়েত সহযোগিতার কারণে আমেরিকা উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তানের মত আফগানিস্তানের সীমান্তের দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল।

একথা সত্য যে, সীমিত আকারে হলেও সমগ্র বিষয়টি বৃহৎ আঙ্গিকে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। ১৯৯৩ সন থেকে চলে আসা বিতর্কিত তত্ত্ব 'সভ্যতার সংঘাতের' কথা বারবার সুধী এবং সাংবাদিক মহলে উচ্চারিত হতে থাকে, এমনকি প্রকাশ্যে না হলেও ভেতরে ভেতরে প্রতিটি মুসলিম দেশে প্রফেসর হানটিংটনের এ তত্ত্ব প্রভাবিত করে তোলে। একদিকে মুসলিম বিশ্ব আফগানিস্তান সমেত এমনকি ওসামা বিন লাদেন সহ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর এ জঘন্যতম হামলার নিন্দা করলেও আফগানিস্তানের উপর জোটের হামলাকে সমর্থন করতে পারে নি। তবুও এর বিরুদ্ধাচারণও করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, অনেক স্থানে বিক্ষোভ সশস্ত্র দাঙ্গায় রূপ নিলে সে সব সরকার দারুণ বিব্রত অবস্থায় পড়ে।

প্রফেসর হানটিংটন, তার তত্ত্বে উল্লেখ করে যে বিশ্বে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির পরে বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ইস্যুর উপর যুদ্ধ হবার আশঙ্কা অনেক কমে এলেও এ যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা থাকবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে। অনেকগুলো সভ্যতার নাম করা হলেও মূলতঃ খ্রিষ্টীয় সভ্যতাকেই পশ্চিমী সভ্যতা বলা হয়েছে যদিও ল্যাতিন আমেরিকাকে এর থেকে বাদ দেয়া হয়। হানটিংটনের মতবাদে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার মুসলীম দেশগুলো, যেগুলোকে বহু আগে 'ক্রিসেন্ট অব ক্রাইসিস্' নাম করণ করা হয়েছিল, এ দুয়ের মধ্যেই এ সংঘাত হবে। স্মরণ থাকে যে, আমরা যেমনটা পূর্বেই দেখেছি যে, ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশ' বছর পরে দু'শ' বছর প্রত্যক্ষভাবে ক্রুসেড এবং ইসলাম ধর্ম অবির্ভাবের পর থেকেই হাজার বছর পরোক্ষভাবে দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘাত চলেছে। হানটিংটনের তত্ত্ব সে ঐতিহাসিক সত্যকেই মনে করিয়ে দেয়। আরও উল্লেখ্য যে, বিগত শতকে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ইসলাম ধর্মের অভূতপূর্ব জাগরণ এবং সম্প্রসারণ ঘটেছে। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই ইসলাম বলতে গেলে দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।

এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে, একথা জর্জ বুশ যতটা না

www.nagorikpathagar.org

অনুধাবন করেছে তার বেশী করেছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। যদিও আমেরিকায় মুসলমান বিরোধী হিংসাত্মক কর্মকান্ডে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উৎকণ্ঠিত হয়ে সাম্প্রদায়িক সমপ্রীতির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয় তবুও এ দুই সমাজের মধ্য যে ফাঁটল ধরেছে তা সহজেই উপশম হবার নয়।

আমেরিকার মতই বৃটেনেও সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয় বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে। সে দেশে এমনিতেই বর্ণবাদের উপস্থিতি রয়েছে। এসমস্তই পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মুসলিম বিশ্বের ভুলবুঝাবুঝি বিশেষ করে জনমনে যে ধরনের আশঙ্কা রয়েছে সেটাকে কিছুটা হলেও নিরসনের জন্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বুশের সাথে সামরিক সহযোগিতা ছাড়াও স্বউদ্যোগী হয়ে কূটনৈতিক সফরে রেব হয়। গন্তব্য ছিল দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ। এ সফরে আপাতদৃষ্টিতে সফলতাও লাভ করে।

তবে এ কূটনৈতিক সফরের প্রাক্কালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে তার দেশের অপারেশন 'এনডিউরিং ফ্রিডমে' যোগ দেবার জন্যে সমর্থন আদায় করতে গিয়ে বলে, 'আফগানিস্তানের কট্টর মৌলবাদী তালেবান সরকার আমাদের শত্রু আর ওসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়দাকে ধ্বংস করা আমাদের লক্ষ্য।' ব্লেয়ার জর্জ বুশের মতই বলে যে, এযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধেও নয়, আফগান জনগণের বিরুদ্ধেও নয়। এ যুদ্ধ সন্ত্রাস আর তাদের সাহায্যকারী সরকার তালেবানদের বিরুদ্ধে। ব্লেয়ার বুশের মনভাবের প্রতিধ্বনি করলেও বুশের মত উত্তেজক ভাষা সযত্নে পরিহার করে। বৃটেন ও আমেরিকার সাথে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ওমান উপসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে টহলরত বৃটিশ এয়ারক্রাফট কেরিয়ায় আমেরিকার টাস্কফোর্সের সাথে আরব উপসাগরে যোগ দিয়ে আফগানিস্তানের উপরে প্রথম পর্বে বিমান হামলার প্রস্তুতিতে যুক্ত হয়।

সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ 'এনডিউরিং ফ্রিডম' এর কূটনৈতিক পর্যায়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার স্বউদ্যোগে পাকিস্তান, ভারত, ওমান এবং মিশর সফর করে। তার সফরসূচীতে সৌদী আরব থাকলে সৌদী কর্তৃপক্ষ অন্য এক অজুহাত

www.nagorikpathagar.org

দেখিয়ে ব্লেয়ারের সে সময়ে ঐ সফরে সম্মতি দিতে অস্বীকার করে।

সৌদী আরব ওসামার জন্ম স্থান এবং একসময়ের কর্মক্ষেত্র ছিল। কাজেই সেখানে তার সহমর্মী গোষ্ঠী থাকা স্বাভাবিক। স্মরণ থাকে যে, ওসামা বিন লাদেন তার মতে 'সৌদী আরবের পবিত্র ভূমিতে বিধর্মী মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে ঘাঁটি করতে দিয়ে পবিত্র ভূমি অপবিত্র করেছে বলে সৌদী সরকারকেও দায়ী করেছে। কাজেই সৌদী আরব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমেরিকার সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৯১ সনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর এবং ইরাক কর্তৃক সৌদী আরবকে আক্রমণের হুমকির প্রেক্ষিতে ওসামা বিন লাদেন সৌদী বাদশাহকে বহিঃবিশ্বের সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগ এবং এতে তার (ওসামার) নিজস্ব আল-কায়দা দ্বারা ইরাকীদের আক্রমণ করবার প্রস্তাব দেয়ার পর তা সৌদী বাদশাহ কর্তৃক প্রত্যাখিত হবার পর থেকে ওসামা বাদশাহের বিরুদ্ধে চলে যায়। কাজেই সৌদী আরব সরকার সে মুহূর্তে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। এর পূর্বে ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধের প্রস্তুতিকালেও সৌদী আরব সে দেশ থেকে মার্কিন বাহিনীকে অন্য কোন মুসলিম দেশে আক্রমণের অনুমতি দেবে না বলে জানালে আমেরিকা এটাকে খুব ভালভাবে নেয় নি।

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০১ এর মধ্যে বৃটিশ এবং আমেরিকান রণতরী, তিনটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এবং প্রায় ১০০ শত বিমান বহর নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। এ ছাড়াও বি-১, বি-২ (অদৃশ্য বিমান ঃ Stealth bombes) এবং বি-৫২ এবং অত্যাধুনিক ধরনের হেলিকপ্টার নিয়ে প্রকাশ্যে হামলার অপেক্ষায় থাকলেও ইতিমধ্যেই স্পেশাল সার্ভিস ফোর্সের প্রায় পাঁচটি গ্রুপ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে আল-কায়দার ঠিকানাগুলো খুঁজে বের করতে এবং সম্ভব হলে সেগুলোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে প্রবেশ করানো হয়। ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ। অপারেশন 'এনডিওরিং ফ্রিডম' শুরুর অপেক্ষায়। আমেরিকার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে মধ্যযুগীয় একটি দেশের অত্যন্ত দরিদ্রতম তালেবান বাহিনীর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি সামরিক ইতিহাসে বিরল হয়ে থাকবে। তবুও তালেবানরা ওসামাকে হস্তান্তর করাবার ব্যাপারে অনড়।

অবশেষে ৭ই অক্টোবর বাংলাদেশের সময় প্রায় রাত নয়টায় বহুল

www.nagorikpathagar.org

আলোচিত 'এনডিউরিং ফ্রিডম' এর প্রথম ধাপে সমস্ত রাত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে, তালেবানদের শক্ত ঘাঁটি বলে বিবেচিত শহর কান্দাহার আর ঐতিহাসিক শহর জালাবাদকে কাঁপিয়ে বোমা আর আরব সাগরের রণতরীগুলো থেকে টমাহক মিসাইল হামলার মধ্যে শুরু হয় সন্ত্রাস ও তালেবান বিরোধী যুদ্ধ। এর পরিণতি কত ব্যাপ্ত হতে পারে সেদিন বোঝা যায় নি, হয়তো এ অভিযানের সুদূর প্রসারী ব্যাপকতা বুঝতে আরও কিছু সময় লাগবে।

নিউইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০০১। মেয়র রুডলফ জুলিয়ানী সিটি হলে সমবেত সাংবাদিকদের জানালো যে, ধ্বংসস্তূপ সরানো সম্পূর্ণ করতে প্রায় একবছর সময় লাগতে পারে। সে সাথে ভারাক্রান্ত স্বরে ঘোষণা দিল যে, একসপ্তাহ অনুসন্ধান চালাবার পর আর কোন জীবিত ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তখনও মাত্র ১৮৮ টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বেশীর ভাগ মৃতদেহগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন অবস্থায় থাকায় সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। কাজেই DNA পরীক্ষার জন্যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের ব্যবহৃত চিরুনী বা ঐ ধরনের কিছু নিয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করতে অনুরোধও করল।

মেয়র জুলিয়ানী প্রায় আট মিলিয়ন নিউইয়র্কবাসীদের প্রতি তাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেও সে নিজেই জানে যে, এখনও প্রচুর সময় লাগবে ব্রডওয়েতে আগের মত জমজমাট ভিড় হতে। জুলিয়ানী শহরে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করতেও ভুলে নি। নিউইয়র্কের ফায়ার ফাইটার আর পুলিশের প্রায় ২৬৬ জন নিখোঁজ হয়েছে তাদের উদ্দেশে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাতেও ভুললনা। এদের আত্মত্যাগের কথা সমগ্র আমেরিকাবাসী মনে রাখবে বলে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মেয়র অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে ভাবাবেগে আপ্লুত হল। জুলিয়ানী যে ভয়াবহতার মধ্যে দিনগুলো কাটিয়েছে তা হয়ত তার জীবনকে বদলে দেবে। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপ তখনও জ্বলছিল।

এই একসপ্তাহ পরেও মি. কেলভিসেন বারবারই মনে করছিল সেই দিনটির কথা। তার বেঁচে থাকার কথা। মাত্র কয়েক মিনিট দেরী হওয়াতে সেদিন সে ১০৬ তলায় পৌঁছতে পারে নি যার ঠিক নীচ দিয়েই আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল। গেল সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ক্যালভিসেন তাদের লন্ডন অফিসে ফোন করলে জানতে পেরেছিল যে, সেদিন তাদের বৈঠকে যোগদানকারী অনেকেই

www.nagorikpathagar.org

নিউইয়র্কের বাইরের এবং লন্ডন অফিসের কর্মকর্তা ছিল। তাদের কেউই হয়ত বেঁচে নেই অথবা তাদের কথা কেউ বলতে পারবেনা। কেলভিসেন পরে জানতে পারল প্রায় ৮০ টি দেশের প্রচুর লোক সেদিন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে সেই ভোরেই উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে নিখোঁজদের সংখ্যায় দ্বিতীয় ছিল বৃটেনের নাগরিক, আরও অনেকের মধ্যে ২৩০ জন ভারতীয়, ১২০ জন পাকিস্তানী এবং ৫০ জন বাংলাদেশী নাগরিকও নিখোঁজ রয়েছে।

আজ পর্যন্ত (১৬ অক্টোবর) নিখোঁজ ৬,৬৮৮ জন এবং মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে ৪৩৮ জনের, এর মধ্যে পুলিশ এবং ফায়ার ফাইটাররাও রয়েছে। ক্যালভিসেন এর মধ্যে কয়েকবারই কিছু ফুল নিয়ে গ্রাউন্ড জিরোতে গিয়েছে (পরে অবশ্য এ সংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকে)। কিন্তু সে জানে হয়ত তার জীবদ্দশায় আমেরিকার গর্ব ম্যানহাটানের বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রের এ দুটি টাওয়ার আর দেখবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস যারা এ সন্ত্রাসের নেপথ্যে রয়েছে তারা হয়ত জীবনেও এ এলাকার প্রাণচাঞ্চল্য দেখে নি। এ প্রাণচাঞ্চল্য আজ ধূলিস্যাৎ হয়ে পরিণত হয়েছে বেদনা বিধূর স্মৃতিতে। এ সন্ত্রাসের সাথে যাদের নাম জড়িত বলে প্রচার করা হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে শতকরা ৯০ ভাগ আমেরিকানরা খবরও রাখে নি। এ অজ্ঞতা আর অবজ্ঞা আমেরিকানদের বহিঃবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু মি. কার্ক ক্যালভিসেন বুঝতে পেরেছে এ হামলার পর পৃথিবী বদলে যাবে, অনেকাংশে বদলে যাবে আমেরিকানদের ধ্যান-ধারণা। বহিঃবিশ্বের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করবে তরুণ আমেরিকানরা, জানতে চাইবে ওরা আমাদের কেন ঘৃণা করে?

এ নজিরবিহীন সন্ত্রাস বদলে দেবে আমেরিকার রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণাকেও। আমেরিকার উদার নাগরিক অধিকার কিয়দাংশে সীমিত করবে। কয়েকটি নতুন আইন প্রয়োগ হবে যা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের অতীতের উদার নাগরিক অধিকারকে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে। এসব নতুন সন্ত্রাস বিরোধী আইন যেগুলো বর্ণবৈষম্যের মত ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনায় রয়েছে যা ভবিষ্যতে জন্ম দেবে আন্তরাষ্ট্রীয় বিবাদ।

www.nagorikpathagar.org

সেপ্টেম্বর মাসের ইসলামাবাদ

'আমরা এ সন্ত্রাসের নিন্দা করি।'

ইসলামাবাদ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সময় আনুমানিক রাত ৮টা। পাকিস্তানের চতুর্থ সামরিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশারফের কর্মসূচীর প্রায় শেষ লগ্নে আই এস পি আর এর (ISPR: ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস্) কর্মকর্তা মেজর জেনারেল রাশেদ কোরেশী রাষ্ট্রপতিকে নিউইয়র্কে প্রথম আত্মঘাতী হামলার পরপরই টেলিভিশনে প্রাপ্ত খবর দিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির চেহারা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান টেলিভিশনের প্রতিটি চ্যালেনে নিউইয়র্কে এ অমানবিক সন্ত্রাস এবং হাজার হাজার নিরীহ মানুষের আহাজারি সরাসরি দেখাতে আদেশ দিয়ে এবং রাষ্ট্রপতিকে (তাকে) পূর্ণ বিবরণ দিতে নির্দেশ দিয়ে সামনে রক্ষিত টেলিভিশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

জেনারেল পারভেজ মোশারফ, জেনারেল জিয়াউল হকের রাস্তা ধরে পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে। জিয়ার মতই একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধান তবে তার আরও একটি বাড়তি পদবী এখনও বহাল রয়েছে যেটি হল প্রধান নির্বাহী বা সি ই।

জেনারেল মোশারফ পাকিস্তানের প্রথম সেনা শাসক যে পাকিস্তানের কোন বড় প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে নি। মোশারফের জন্ম হয়েছিল দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪৩ সনে বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। দেশ বিভাগের পর তার বাবা পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে আসে। শৈশবের বেশ কয়েক বছর তুরস্কে কাটায়। লেখাপড়া শেষে ১৯৬৪ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্যাপটেন হিসেবে পাকিস্তান আর্মির এলিট ফোর্স বলে খ্যাত এস এস জি (স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ) তে যোগ দেয়। বৃটেনে রয়েল ডিফেন্স কলেজের ছাত্র মোশারফ ১৯৯৫ সনে লেফটেনেন্ট জেনারেল পদে উন্নীত হয়। মোশারফ ১৯৭৯-৮৯ সনে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় আফগান মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে বেশ কিছু বছর যুক্ত থাকার সুবাদে অতীতের এবং বর্তমানের আফগানিস্তানের শীর্ষ যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে সুপরিচিত। ১৯৯৮ সনে বেশ কয়েকজন সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ মোশারফকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করে। অক্টোবর ১২, ১৯৯৯ সনে অদ্ভুত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে নওয়াজ শরিফের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেশের চতুর্থ সামরিক শাসকের পদে আসীন হয় জেনারেল পারভেজ মোশারফ।

মোশারফ তার পূর্বসূরী সামরিক শাসকদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এক্ষণে পাকিস্তানে পারমাণবিক দেশে পরিণত হয়েছে। এ অস্ত্রায়ণ অবশ্য গণতান্ত্রিক সরকারের সময়েই হয়েছিল।। মোশারফ সেনাপ্রধান হবার কয়েকমাসের মধ্যেই ভারত শাসিত কাশ্মীর আর পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত কার্গিল নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে সমাপ্ত হলেও নওয়াজ শরিফ আর ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। সেই থেকে ভারত মোশারফকে সে দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদে সাহায্য করার জন্যে এককভাবে দায়ী করে। মোশারফের সামরিক অভ্যুত্থান আর সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিবেশী আরেক পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রি ভারতের সাথে ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েনে দুদেশের সম্পর্কের অবনতি চরমে পৌঁছে। এদিকে গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার কারণে পশ্চিমা বিশ্ব, ইনটারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (IMF) বিশেষ করে আমেরিকা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ইতিপূর্বেও ভারত পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরেও নিষেধাজ্ঞার আওতাতেই ছিল। এ দু'তরফা ধাক্কার মধ্যে পড়ে পাকিস্তানের অর্থনীতি প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি অবস্থায় পড়েছে।

অন্যদিকে ভারতের প্ররোচনায় পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অজুহাতে কমনওয়েলথ থেকেও সাসপেন্ডেড হয়ে রয়েছে। ভারতের প্রচার যন্ত্রগুলো মোশারফকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ধর্মীয় কট্টরবাদীদের হাতে জিম্মি হয়ে

www.nagorikpathagar.org

কাশ্মীরে সন্ত্রাস ছড়ানো এবং আফগানিস্তানে কট্টরপন্থী তালেবান সরকারের ঘনিষ্ট বলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব তৎপর হয়েছিল। এতসবের মধ্যেও ১৭ই আগস্ট ২০০১ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপায়ীর আমন্ত্রণে মোশারফ দিল্লী হয়ে আগ্রাতে শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। বিগত ৫০ বছরের চলমান সমস্যা কাশ্মীরের উপর দু'দেশের বিপরীতমুখী অনড় মতাদর্শের কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ বৈঠক ভাল ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, দিল্লী যাবার কয়েকদিন পূর্বেই মোশারফ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বারবার হোঁচট খাচ্ছে। তবে ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০০১ এ ইউএন জোনারেল এসেম্বলীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ দিনে মোশারফ হয়ত বুঝতে পেরেছিল যে, সে বৈঠকও হবার নয়। ভারত বিনা অজুহাতেই এ বৈঠক নাকচ করে দেয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গন এবং শীতল যুদ্ধ অবসানের পর থেকেই। এতদঅঞ্চলে চীনের প্রভাবকে খর্ব করার জন্যে আমেরিকা‍ে ভারতের প্রয়োজন এককালের ঘনিষ্ট মিত্র পাকিস্তানের চেয়ে বেশী হয়ে পড়াতে ক্রমেই দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ভারতমুখি হয়ে পড়ে। এ নিয়েও একটা ঠান্ডা লড়াইয়ের শুরু হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এ দু প্রতিবেশীর মধ্যে। আর কাশ্মীরই থেকে যায় উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মোশারফের এজেন্ডায় কাশ্মীর সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে বিশ্বের বিত্তশালী দেশগুলো পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং নির্বাচন উত্তর বেসামরিক সরকার গঠনের নিশ্চিত অঙ্গীকার চাইছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সুপ্রীমকোর্ট ২০০২ সনের অক্টোবরের মধ্যে দেশে নির্বাচন করাবার জন্যে ১৯৯৯ সন থেকে মাত্র তিন বছরের সময় বেধে দিয়েছে।

এদিকে আশির দশকে আফগানিস্তানের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধ তার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসার পর থেকে প্রায় পনের লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানের মাটিতে রয়ে যায়। এর উপরে বর্তমানে সীমান্তে অনেক জায়গায় তালেবানদের কঠোর শাসন বিরোধীদের পালিয়ে আসা এবং তালেবানদের সাথে বিরোধীদের সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি

www.nagorikpathagar.org

থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেও আফগান শরণার্থীদের ভীড় বেড়েছে। এখনও সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানে এবং অন্যান্য বড় শহর সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ আফগান শরণার্থী পাকিস্তানে রয়ে গেছে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চাদাপসারণের বছর খানেকের মাথাতেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আর তাই অন্ন ও বস্ত্রের তাগিদে আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কাজের খোঁজে স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে গেছে। এসব উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর সংস্পৃক্ততায় সীমান্ত সংলগ্ন এবং বড় শহরগুলোতে অপরাধ বেড়েই চলেছে।

অন্যদিকে আশির দশকের আফগান যুদ্ধের পরিণতিতে পাকিস্তানের সামাজিক পরিস্থিতিও অনেক বদলে গেছে। সমাজে আর রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গান কালচার। অবৈধ অস্ত্রের প্রসার বেড়েছে প্রায় দশগুণ। একে ৪৭-৫৭ সিরিজের রাইফেল প্রস্তুত করবার অবৈধ কারখানাগুলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় এলাকায় কুটির শিল্পের আকার ধারণ করেছে। আফগান যুদ্ধের বদৌলতেই পাকিস্তানে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় ড্রাগ মাফিয়া। রাজনৈতিক ছত্রছায়া আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কারণে এসব ড্রাগ লর্ডরা সীমান্ত প্রদেশের ট্রাইবাল এরিয়াতে বসবাসরত বলে এদেরকে সচরাচর স্থানীয় আইনেও ধরা সম্ভব হয়ে উঠেনা। অতীতে বহু রাজনীতিবিদ এদের নিরাপত্তা দিয়েছে। এদের মধ্যেই একজন ছিল আইয়ুব আফ্রিদী।

আইয়ুব আফ্রিদীর নিবাস আফগান সীমান্ত সংলগ্ন শহর লান্ডিকোটালে। সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সময় CIA এবং ISI এর পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তানে উৎপাদিত পপি থেকে হেরোইন এবং আফিমের চোরাচালানীর সাথে জড়িত থেকে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ মাদক চোরাচালানী গ্যাং এর গডফাদারে পরিণত হয়। অবৈধ ব্যবসায়ে বিত্তবান আইয়ুব আফ্রিদীর সাথে আশির দশকের সমগ্র আফগান জেহাদে CIA এবং ISI এর কর্তাব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তারই প্রেক্ষিতে প্রথমে মুসলিম লীগ ও পরে বেনজীর ভুট্টোর সরকারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট হবার সুযোগ হয়। এক পর্যায়ে আইয়ুব আফ্রিদীর বিরুদ্ধে আমেরিকার DEA (DEA: ড্রাগ এনফোর্সিং এজেন্সি) মামলা করলে তাকে সেখানে পাঠানোর অনুরোধও জানান হয়। বেনজীর ভুট্টোর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় আফ্রিদী নিস্তার পায়। বেনজীর ভুট্টোর স্বামী আসিফ জারদারীর বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

অনেক অভিযোগের মধ্যে আইয়ুব আফ্রিদীর সাথে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের অংশীদারিত্বের অভিযোগও উত্থাপিত হয়। অবশ্য এ অভিযোগ বেনজীর ভুট্টো এবং জারদারী খণ্ডন করে। আইয়ুব আফ্রিদী আফগান জেহাদে CIA এবং ISI এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা আর এক মুজাহিদ।

মোশারফের সমস্যা এখানেই শেষ নয়। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গাতে প্রায়ই বহু প্রাণহানী ঘটে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে রয়েছে প্রায় পনের শতাংশ শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। প্রতিটি শিয়া মুসলমান নিধনে ইরান পাকিস্তানের নিকট তাদের উদ্বেগের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। পাকিস্তানে শিয়া বিরোধী সন্ত্রাসী দল 'সিপাহী সাহাবা' আফগানিস্তানের আশ্রয়ে লালিত বলে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তালেবান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানীদের সাথে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে রাজী হয় নি। সূত্রে প্রকাশ, এদের প্রশিক্ষণের জন্যেও আফগানিস্তনের মাটিতে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে। মোশারফের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মঈন উদ্দিন হায়দার কয়েকবার কাবুল সফর করেও হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে।

মোশারফ ইদানীং কাবুলে তালেবান সরকারকে নিয়ে প্রচণ্ড বিব্রতকর পরিস্থিতিতে রয়েছে। একদিকে ক্রমেই কাবুলে তালেবান সরকার অসহনীয় ভাবে কট্টরপন্থী পথ বেছে নিয়েছে যার প্রভাব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় পড়ছে অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়দার প্রভাব বাড়ছে যা হয়ত একদিন পাকিস্তানকেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে।

১৯৯৯ সন থেকেই এই ওসামা বিন লাদেনের জন্যই আফগানিস্তান আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। ১৯৯৮ সনের আফ্রিকায় দুটি আমেরিকান দূতাবাসে বিস্ফোরণের জন্য আল-কায়দাকে দায়ী করে তাকে হস্তান্তরের জন্য তালেবানদের চাপ দিলে তারা রাজী না হওয়াতে ইউ এন ও-তে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব আনা হয়। এ প্রস্তাবের পরও সাড়া দেয় নি তালেবানরা। এর পরপরই ১৯৯৮ সনে আরব সাগর থেকে আমেরিকা মিসাইল আক্রমণ করে ওসামার জালালাবাদের সন্নিকটে খোস্তে কথিত হেডকোয়ার্টারে; কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় নি। ওদিকে ১৯৯৮ সনের বোমা হামলার জন্য আমেরিকার কোর্ট ওসামাকে পলাতক অবস্থায় বিচার করে দোষী সাব্যস্ত

www.nagorikpathagar.org

করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আজও তালেবানরা তাকে আফগানিস্তানেই নিরাপত্তা দিয়ে রাখছে। এ নিয়েও মোশারফের প্রচুর বিড়ম্বনা। প্রায়ই মোশারফের উপর আমেরিকার চাপ আসছে তালেবানদেরকে প্রভাবিত করতে। মোশারফ নিজেও জানে যে, তালেবান এবং এদের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানকে আগের মত তেমন তোয়াজ করে না কারণ তারা মনে করে পাকিস্তান ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে। বামিয়ানে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস বন্ধ করার অনুরোধ কান্দাহারে তালেবান ধর্মীয় নেতা মোল্লা ওমরকে পাঠালে মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মোশারফকে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে দেয়। এতে মোশরফ এবং তার সরকার যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়।

মোশারফ একবারই মোল্লা ওমরের মুখোমুখি হয়েছিল, গতবছরের মানে ২০০০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন প্রথমবারের মত কান্দাহার সফর করে। তার সফরের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল মোল্লা ওমরের সাথে সরাসরি বৈঠকে যদি তালেবান আর আমেরিকার মধ্যে ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে টানাপোড়েন প্রশমিত করা। একই সাথে পাকিস্তানের সন্ত্রাসীদের আফগানিস্তানে আশ্রয় না দেয়া। মোশারফের মধ্যস্থায় মোল্লা ওমর খুশী হতে পারে নি তবে ভবিষ্যতে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াবার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সফর শেষ হলেও এ সফরের যোগফল নিয়ে মোশারফ উচ্ছ্বসিত হতে পারে নি। এর পরেই পাকিস্তান আমেরিকাকে ওসামার ব্যাপারে সরাসরি তালেবানদের সাথে যোগাযোগ করবার অনুরোধ জানায়। এতে বোঝা গেল যে, তালেবানরা পাকিস্তানের মধ্যস্থতা মানতে রাজী হয় নি।

যদিও রাজনৈতিক অঙ্গনে মোশারফকে শক্তভাবে চ্যালেঞ্জ করবার মত পাকিস্তানে বর্তমানে তেমন কোন ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ নেই তবুও ধর্মীয় উগ্রবাদীরা প্রায়ঃশই সশস্ত্রবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে বিবৃতি দিতে থাকে আর এ ধরনের বিবৃতি বহিঃবিশ্বে পাকিস্তানকেও কট্টরপন্থী রাষ্ট্র বলে অন্তত বেসরকারী ভাবে চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তানে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা দু'জনই দেশান্তর। এর মধ্যে একজন নওয়াজ শরিফ আর অন্যজন বেনজীর ভুট্টো। মোশারফের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকলে তা হয়ত হবে তারই কোন সতীর্থ জেনারেল। বিভিন্ন বৈদেশিক সূত্রে প্রকাশ যে, সেনাবাহিনীতে তালেবান সমর্থক রয়েছে বলে ধারণা করা হয় এবং এর সাথে কিছু কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারদের নামও জড়িত আছে। তবুও মোশরফ রাষ্ট্রপতি হবার পরও কোনরূপ রদবদল

www.nagorikpathagar.org

করতে চায় নি বা উদ্যোগ নেয় নি। এর কারণ এদের মধ্যে অনেকেই তার ঘনিষ্ট সহচর এবং তাকে ক্ষমতায় বসানোর পেছনে এদের অনেকের অবদান রয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির প্রধান সমস্যা তার নিজস্ব পূর্ব পরিচিতি। পাকিস্তানে মোহাজের সম্প্রদায় প্রায়শঃই নিজেদের সংখ্যলঘু মনে করে এবং বহুদিন থেকে তারা তাদের নিজস্ব পরিচয়ের জন্যে সিন্ধু প্রদেশকে বিভাজিত করে আলাদা প্রদেশের জোর দাবী জানিয়ে আসছে। জেনারেল পারভেজ মোশারফের মত প্রায় ৯০ ভাগ মোহাজের ভারত বিভাগের পর সিন্ধু প্রদেশের করাচী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। মোহাজেরদের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বৃহত্তর প্রদেশ পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নিকট যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে সে দেশের সমাজের দুটি ভাগ সহজেই চোখে পড়ার মত। সমাজের নিরক্ষর অথবা অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মীয় উদারতার অভাব কম, কাজেই এদের সহজেই ধর্মীয় কট্টরবাদী নেতারা আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে সুশীল এবং শিক্ষিত সমাজ যারা ধর্মীয় আচার মেনে চললেও গোড়াপন্থীদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায়না। ঐ দেশে ধর্মীয় কট্টরবাদীদের পুনরুত্থান হয় জেনারেল জিয়াউল হকের এগারো বছরের শাসন আমলে এবং বিশেষ করে ১৯৭৯-৮৯ সন পর্যন্ত চলমান আফগান যুদ্ধের সময়ে। জিয়াউল হক পাকিস্তানের ইতিহাসকে বদলে দিতে চেয়েছিল এবং তার সময়ে ধর্মীয় অনুশাসনকে প্রশ্রয় দেয়া হয় সর্বাগ্রে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জন্ম দেয়া হয় ধর্মীয় কট্টরবাদের। জিয়া স্বভাবতঃই নিজেকে মুসলিম বিশ্বের অগ্রগামী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। জিয়ার সৌভাগ্য যে, সে সময় তার মতবাদকে আমেরিকাও যথেষ্ট মদদ দিয়েছিল।

জেনারেল পারভেজ মোশারফ শৈশবে বহুবছর তুরস্কে কাটানোর ফলে তুরস্কের নেতা মোস্তাফা কামাল পাশার নব্যতুরস্ক স্থাপনার প্রক্রিয়াকে পুনসমর্থন করত। পাকিস্তানকেও গোড়াপন্থীদের হাত থেকে বের করে তুরস্কের পথে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে আগাম কিছু করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। যদিও পাকিস্তানের অতীত রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক পার্টিগুলো তেমন অগ্রগতি করতে পারে নি তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের প্রতিপত্তিকে খাটো করে দেখা যায়না বিশেষ করে কিছু কিছু ধর্ম ভিত্তিক পার্টির নেতাদের। এদের মধ্যে প্রখ্যাত জে ইউ আই (জামাতে উলেমায়ে ইসলাম) নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান, মওলানা সামিউল হক আর জামায়াতে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী (পাকিস্তান) এর মওলানা কাজী হোসেন আহমেদ এদের দুজন কোন একমসয় মন্ত্রী পরিষদেও ছিল। বিশেষ করে প্রথমে উল্লেখিত ধর্মীয় নেতার সাথে আফগানিস্তানের তালেবানদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। মওলানা ফজলুর রহমান নিজে একজন পশতুন এবং বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ধর্মমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯৪ সনে তালেবানদের উত্থানের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। মাওলানা ফজলুর রহমানের সাথে মোল্লা ওমরের তাত্ত্বিক সম্পর্কও সুদৃঢ়। পাকিস্তানের ফৌজি রাষ্ট্রপতি সবমিলিয়েই খুব একটা সুখকর পরিস্থিতিতে নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় টেলিভিশনের সামনে বসে মোশারফ বাকরুদ্ধহীন হয়ে ভাবছিল এ ঘটনা কোনদিকে গড়াবে। তার মিলিটারী প্রশিক্ষণ, সামরিক ইতিহাসের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আর প্রায় দু বছরের কাছাকাছি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করতে অসুবিধে হয় নি যে, এটি একটি সন্ত্রাসী কাজ এবং এর পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাহমান ঘটনা যুক্ত। তাছাড়া তার পশ্চিম সীমান্তের রাষ্ট্রে আফগানিস্তানে আমেরিকা কর্তৃক ঘোষিত একনম্বর সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনের উপস্থিতি। এসব মিলিয়ে তার উপরে একটা চাপ আসা স্বাভাবিক। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আগামী দিনের কথাগুলো চিন্তা করে শংকিত হয়ে উঠে। মনে পড়ে এ ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার চাপ এবং তাকে (ওসামাকে) হত্যা করার বিভিন্ন সময়ের ব্যবস্থার কথা। শুধু তাই নয় এ একই কারণে তার সরকার এবং গুপ্ত সংস্থাগুলো আমেরিকার অব্যাহত চাপের মুখে রয়েছে।

ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে তার অবস্থানও আমেরিকার সাথে ভাল যায় নি বা যাচ্ছেনা। ১৯৯৮ সনে পশ্চিম আফ্রিকার তানজানিয়া আর নাইরোবীর আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলার পর আমেরিকার মিসাইল হামলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সহযোগিতা ছিল। এ হামলা ব্যর্থ হবার পরপরই আমেরিকা ওসামাকে ধরিয়ে দেয়া বাবদ পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষাণা করে। এসব প্রচেষ্টা এখানেই ক্ষান্ত থাকে নি।

১৯৯৯ সনে আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন পাকিস্তানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর অর্থনৈতিক অবরোধ বিলুপ্তির পরিবর্তে বিন লাদেনকে হত্যার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের

www.nagorikpathagar.org

তৎকালীন সেনা প্রধান এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ জেনারেল মোশারফ কিছুই জানত না বলে প্রকাশ। এ পরিকল্পনায় আমেরিকার সি আই এ-এর আদলে গড়ে উঠা আই এস আই (ISI) জড়িত ছিল এবং বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেনা প্রধানকেও জানাবার প্রয়োজন মনে করে নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার সি আই এ'র তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ২০০ কমান্ডোর বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনাটি কার্যকর করবার পূর্বেই পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং জেনারেল মোশারফ ক্ষমতা দখল করলে আমেরিকা সে পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। এ ঘটনা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি অনেকদিন পরে জানতে পারে। তবে এ সামরিক অভ্যুত্থানকে আমেরিকা সহজভাবে না নিলেও বাহ্যত তেমন কোন কঠিন পদক্ষেপও গ্রহণ করে নি।

রাষ্ট্রপতি মোশারফ টেলিভিশনে নিউইয়র্কে আত্মঘাতী যাত্রীবাহি বিমান হামলার দৃশ্য দেখতে দেখতে এম এস পি (মিলিটারি সেক্রেটারি টু প্রেসিডেন্ট) জানালো আই এস আই প্রধান (ডাইরেক্টর জেনারেল) লেফটেনেন্ট জেনারেল মাহমুদ আহমেদ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কথা বলবে। ততক্ষণে ওয়াশিংটনে আমেরিকার সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগনে ছিনতাইকারী সমেত আত্মঘাতী হামলা হয়ে গেছে যা রাষ্ট্রপতি মোশারফ টেলিভিশনে দেখল মাত্র। জেনারেল মাহমুদ তার রাষ্ট্রপতি এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফকে ঘটনা জানালো এবং আজই (সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১) সেক্রেটারি রামস্‌ফিল্ডের সাথে তার সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের কথা ছিল যা হয়ত বাতিল করতে হবে। এদিকে তার পরেরদিন দেশের উদ্দেশ্যে ফিরে আসার কথা থাকলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে দু'একদিন দেরী হতে পারে। সমস্ত ঘটনা শুনে মোশারফ অত্যন্ত শান্ত গলায় তাকে পেন্টাগন থেকে বিশদ বিবরণ নিয়ে সে সাথে পাকিস্তানের তরফ থেকে সমবেদনা জানিয়ে দিতে বলে সে আই এস আই প্রধান কে সাবধানে থাকতে বলে কথোপকথন শেষ করল। আরও কিছুক্ষণ পরে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এককালের ঝানু কূটনীতিবিদ আব্দুল সাত্তারকে ডেকে পাঠালো।

পাকিস্তানের আই এস আই আর আমেরিকার সি আই এ'র (CIA) সাথে একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকলেও তা বিগত আফগান যুদ্ধের আগে এতটা গভীর কখনই ছিলনা। বিগত আফগান যুদ্ধের সময় আই এস আই শুধু

www.nagorikpathagar.org

কলেবরেই বৃদ্ধি পায় নি এর কার্যক্ষমতা এবং ব্যাপ্তি বেড়েছিল প্রায় দশগুণ। পুরো যুদ্ধের সময় এবং পরে সি আই এ'র হয়ে এ ছায়া যুদ্ধ আই এস এ'র মাধ্যমেই পরিচালিত হয়[৭]। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে অবদান এবং আই এস আই কে এর সাথে সফল ভাবে সম্পৃক্ত করণ এবং আরও অনেক কারণে ঐ সময়কার আই এস আই প্রধান জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান খানের নাম আফগান যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। আখতার আব্দুর রহমানকে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে অনেকই মনে করে। নিজে পশতুন হওয়াতে তার নিজস্ব সহমর্মিতা এ যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। আই এস আই থেকে সরে আসার পরও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক সোভিয়েত বিরোধী আফগান যুদ্ধ পরিচলানার ভার ঐ সময়কার জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ আখতার আব্দুর রহমানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। এই আখতার আব্দুর রহমানও ১৭ই আগস্ট ১৯৮৮ সনে জিয়াউল হকের সাথে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। সে দুর্ঘটনার কারণ আজও নিঃসন্দেহাতীতভাবে উৎঘাটিত হয় নি। এ দুর্ঘটনা ঘটে সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চাদাপসরণের প্রায় এক বছর পূর্বে।

খোদ পারভেজ মোশারফ আই এস আই এর কার্যপদ্ধতি এমনকি এর সংগঠন সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে বিশেষ ধারণাই পায় নি বা তার কার্যপরিধির মধ্যে বর্তায় নি। তবে এ সংস্থার সাথে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী প্রধানের সম্পর্কের কথা তার ভালভাবেই জানা ছিল। শুধুমাত্র সেনা প্রধান অথবা জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের কর্মকাণ্ডের আওত্তায় সরকারীভাবে এ সংস্থার সাথে কোন সম্পর্কই গড়ে উঠে না। তবে সশস্ত্রবাহিনীর আভ্যন্তরীণ এবং আন্তসীমান্ত সামরিক খবরাখবর সরাসরি জয়েন্ট সার্ভিসেস হেডকোয়াটারকে জ্ঞাত করা আই এস আই এর কর্তব্যের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে বিদেশে দূতাবাসগুলোর মিলিটারী এটাচীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডও এই সংস্থাই দেখে থাকে।

পাকিস্তানের অদৃশ্য সরকার বলে খ্যাত আজকের আই এস আই এর জন্ম পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরপরেই তবে তখন থেকে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এর আকার এবং কার্যপরিধি সীমিত ছিল। সে সময়ে আই এস আই কাশ্মীর এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের পার্বত্য চট্রগ্রামে উত্তর পূর্ব ভারতীয় রাজ্যের বিদ্রোহীদের সকল

www.nagorikpathagar.org

প্রকার সাহায্য করা থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে নজর রাখাই ছিল আই এস আই এ'র প্রধান কাজ। তবে শুরু থেকেই আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সামরিক সহযোগিতার আওতায় সি আই এ কর্তৃক এবং পৃথক একটি চুক্তিতে এবং ফ্রান্সের এস ডি ই সি ই (SDECE) ফ্রান্সের বর্হিবিশ্ব গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা আই এস আই প্রশিক্ষিত হয়।[১] আই এস আই এর পরিধি আরও ব্যাপক হয় যখন জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল হয়। ভুট্টো ১৯৭১ সনের পরে পাকিস্তানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং নিজের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করবার জন্যে আই এস আই কে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে নজর রাখার জন্যে কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোগ করে। এরই আওতায় পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি বড় এবং মাঝারি শহরে এর গতিবিধি বাড়তে থাকে। এ ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান রয়েছে।

আই এস আই'র রাজনৈতিক ব্যবহারের পথ ভুট্টোই শুরু করে। নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে ভুট্টোর বিচারের যাবতীয় তথ্যাদিও এই সংস্থা যোগাড় করে যার প্রেক্ষিতে তাকে ফাঁসীতে ঝুলতে হয়। ১৯৮৫ সনে বেনজীর ভুট্টোর একমাত্র ভাই শাহনেওয়াজ ভুট্টোকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ রয়েছে এ সংস্থার বিরুদ্ধে। যদিও বেনজীর ভুট্টোর এ অভিযোগ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক প্রত্যাখান করে।

মোশারফের ক্ষমতা গ্রহণের বেশ কয়েকমাস পর প্রাক্তন আই এস আই প্রধান মাহমুদ আহমেদকে নিয়োগ দেয়া হয়। যে সব জেনারেল মোশারফকে ক্ষমতায় আসতে সহযোগিতা করে মাহমুদ আহমেদ তাদেরই একজন হলেও বেশ কিছুদিন থেকে তার গতিবিধির ভিন্নতর খরবাখবর মোশারফের গোচরে আসতে থাকে। এসবের অকাট্য কোন প্রমাণাদি না থাকায় মোশারফকে সতর্ক থাকতে হয়েছে। তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মোশারফ উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আরও কয়েকজন জেনারেলসহ মাহমুদ আহমেদকে অকালীন অবসর দিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির অফিসের টেলিভিশনে তখনও আমেরিকার সন্ত্রাসী হামলার ধারাবিবরণী চলছিল সে সময়েই খুব দ্রুতগতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল সাত্তার এসে রাষ্ট্রপতিকে তার সাথে ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ডঃ মালিহা

১। জেনস্ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি নিউজ ঃ জুলাই ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

লোদীর সাথে কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানালো। একই সাথে রাষ্ট্রপতিকে এ হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দেবার জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া দেখিয়ে অনুমোদন করে নিল। মোশারফ তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে প্রায় ঘন্টাখানেক এ হামলার উপর তার (সাত্তারের) বিশ্লেষণ মনোযোগের সাথে শুনে রাত বারটার দিকে ছোট একটি বৈঠকে আব্দুল সাত্তারকে তার ব্যাখ্যা এবং প্রাপ্ত তথ্য বিস্তারের সাথে জানিয়ে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার রূপরেখা নির্ধারণের খসড়া তৈরীর আদেশ দিল। অপরদিকে সামরিক ফোনে সিজি এস এর সাথে কথা বলে পরের দিন কোর কমান্ডারদের নিয়মিত বৈঠক একদিন পিছিয়ে দিতে বলে আরও কিছু দরকারি ফোন সেরে বাকী প্রোগ্রাম বাতিল করে 'ফ্রেস' হতে উঠে গেলে পাকিস্তান টেলিভিশনের খবরে এ হামলার বিপক্ষে মোশারফের এবং পাকিস্তানের তরফ থেকে নিন্দা সূচক খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ বুধবার ইসলামিক মাসের ২২ জামাদিউস সানি ১৪২২ হিজরী, স্থান কান্দাহার, দক্ষিণ পূর্ব আফগানিস্তান। বিগত দশবছরের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত এ শহর। বর্তমানে তালেবানদের কেন্দ্রস্থল বলে এতদঅঞ্চল বিখ্যাত কিন্তু আর কয়েকদিনের মধ্যে আফগানিস্তান, কান্দাহার, কাবুল এবং অন্যান্য শহর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। কান্দাহার সোভিয়েতদের দখল এবং অতপর সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে মাত্র চার ঘন্টা সড়ক পথের দূরত্বে অবস্থিত এ শহর এক সময় বেলুচিস্তানের সাথেই ছিল। কান্দাহার প্রদেশের নামেই শহরের নাম। এখানে একটি বড় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে তবে এখন আভ্যন্তরীণ রুটেই ব্যবহার হয়ে থাকে তাও সপ্তাহে তিন দিন। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আফগান এয়ার লাইন্সের এরিয়ানা বিমান বহরের বিমানগুলো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এ শহর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে আরও একটি ছোট কিন্তু অত্যাধুনিক বিমান বন্দর। এটি ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এর বর্তমান মালিক ওসামা বিন লাদেন বলে জানা গেলেও এ পর্যন্ত সাধারণ আফগান কখনই তাকে স্বচক্ষে দেখে নি। কোন এক সময় এ ছোট্ট বিমানবন্দরটি ব্যবহৃত হয়েছিল আফগান বাদশাহের জন্যে পরে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের

www.nagorikpathagar.org

এক পর্যায়ে এটি মুজাহিদদের হাতে চলে এলে এখানে কান্দাহার এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে জরুরী ভিত্তিতে যুদ্ধ উপকরণ পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। আরও পরে ওসামা বিন লাদেন ঐ জিহাদের সময়েই এটিকে সংস্কার করে এবং মাটির নীচে বিমানবন্দর চালনার যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। উল্লেখ্য, সে সময় বহু অআফগান এ যুদ্ধে ওসামার সাথে যোগ দেয়। আমরা সে কথা পরের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করব। মজার ব্যাপার হল এপর্যন্ত এ বিমানবন্দরটি ছাড়া আর প্রায় সব বিমানবন্দরেই আমেরিকা বোমা হামলা চালিয়েছে।

পরে এ দোলাটি নামক বিমান বন্দরে ২৬ নভেম্বর ২০০১ আমেরিকার ১০০০ মেরিন সৈন্য অবতরণের সাথে শুরু হয় বর্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব 'সুইফট ভিক্টোরি' যা প্রতিদিন খবরের কাগজগুলোর শিরোনামে থাকবে।

আমরা ফিরে আসি কান্দাহারে চলমান বিবরণের আঙ্গিকে-

কান্দাহার বিমানবন্দর থেকে কিছু দূরেই এককালীন কান্দাহার প্রদেশের গর্ভনরের 'সিন্দু' প্রাসাদ। ভেতরে অত্যন্ত সাদামাটা। দেয়ালে অতিমূল্যবান বেশ কিছু দামী পেইন্টিং নষ্ট করে ফেলে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। গোড়া মুসলমানদের দ্বারা শাসিত দেশ আফগানিস্তানে ছবি বা পেইন্টিং জাতীয় কিছুর জায়গা নেই। এটা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী? আফগানিস্তানের নিজস্ব কোন টেলিভিশন স্টেশন জনসাধারণের জন্যে নেই। শুধুমাত্র একটি রেডিও স্টেশন আছে। যা হোক এ প্রাসাদের ভেতরে অনেক সশস্ত্র পাহাড়া ডিঙ্গিয়ে দুটি রুম। পাহাড়ায় সব তালেবান সৈনিক। তেমন কোন নির্দিষ্ট ইউনিফরম নেই। মাথায় কালো পাগড়ী আর হাতে একে-৪৭ রাইফেল, কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত ক্রস করা দুটি এম্যুনিশান চেইন যার মধ্যে প্রায় ২০০ রাউন্ড গুলী ধরে, পরণে ঢিলা আফগানী সালোয়ার কামিজ, মুখভরা দাঁড়ি। এই হল তালেবানদের রাইফেল ম্যান।

সতর্ক প্রহরা পার হলে দুটো রুম যা বাইর থেকে ভেতরে দেখা যায় না তবে পেছনের দরজার কাছেই একটি মসজিদ। মাগরেবের নামাজ বেশ কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। মসজিদ থেকে সপ্রতিভভাবে কয়েকজন বের হয়ে জায়গা করে দিল শীর্ণকায় মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাঁড়ি আর মাথায় বেশ বড়

www.nagorikpathagar.org

কালো পাগড়ী ডান চোখের উপরে আচ্ছাদিত। অতি সাধারণ পোশাকে নামাজ এবং জিকির শেষে বের হতেই পাশের একজন তার কানেকানে কিছু জানালো। একটি আচ্ছাদনের নীচের ডান চোখটি গত সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় 'কাফের' দের শেলের ভগ্নাংশের আঘাতে নষ্ট হবার পর থেকেই সেলাই করা। কিছু একটা খবর শোনার পর অন্য চোখটি জ্বলজ্বল করে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে নিজের জন্যেই হয়ত কিছু বলল তালেবানদের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় গুরু আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ। এই সেই ব্যক্তি যার কথা তালেবানদের জন্যে শেষ বাক্য। এর উপরে আর কোন কথা নেই। মোল্লা ওমর নিজেকে ইসলামের একজন সামান্য খেদমতকার 'মুজাহিদ' বলে নিজেকে আখ্যায়িত করতে ভালবাসে।

মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর সম্বন্ধে খুব বেশী একটা কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এমনকি জীবনে একটি ছবি উঠিয়েছিল তাও এক পশ্চিমা সাংবাদিক ঝুমের সাহায্যে। এ ছবিটি উঠিয়েছিল যেদিন মোল্লা ওমর তার পূর্বের ছোট ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কান্দাহারের 'খারকা মোবারক'[@] নামের মসজিদের স্ট্রংরুমে রক্ষিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পরিধেয় বস্ত্র কথিত আলখাল্লা খানা নিজের হাতে নিয়ে তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরে। তারপর থেকে তার আর কোন ছবি দেখা যায় নি। মোল্লা ওমর যে নামে সাধারণতঃ পরিচিত, হয়তবা ইতিহাসে বহু কারণে বিতর্কিত হয়ে থাকবে তবে আফগানিস্তানের ইতিহাসে সেই একমাত্র ব্যক্তিভে িণত হয়েছে যার অত্যন্ত কঠিন অনুশাসনের কারণে আফগানিস্তানের প্রায় ৯০ ভাগ এলাকার মানুষ একক শাসনে ছিল বা থেকেছে। আফগানিস্তান এ পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধবাজ উপজাতীয় নেতাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে তাদের শাসনেই চলেছে। কাবুলে অধিষ্ঠিত কোন সরকারই এককভাবে আফগানিস্তানের পঞ্চাশ ভাগ এলাকাতেও প্রভাব ফেলতে পারে নি। এমনকি বাদশাহ জহির শাহের সময়েও নয়।

ওমর, দক্ষিণ পূর্ব আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের মেয়ইওয়ান্দ জেলার অখ্যাত সিংগেসার গ্রামের এক অত্যন্ত সাধারণ কৃষকের ঘরের ছেলে। শৈশবে গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে। এ মাদ্রাসায় তালিম শেষ

[@] নবী করিম হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর কথিত ব্যবহৃত আলখাল্লাটি কান্দাহারের যে মসজিদে রক্ষিত ঐ স্থানটির স্থানীয় নাম 'খারকা মোবারক।'

www.nagorikpathagar.org

করবার আগেই সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তরুণ বয়সে 'আই এস আই' আর 'সি আই এ' সমর্থিত 'জেহাদের' ডাকে মৌলভী ইউনুস খালিসের 'হিজব-ই-ইসলামী' (খালিস) গ্রুপে এবং পরে মৌলভী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদীর দলে যোগ দেয়[৫] সেখানেই তার সাথে পরিচয় ঘটে আরেক নেতা গুলবদিন হেকমতইয়ারের সাথে। একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে ওমর সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। জেহাদের প্রায় শেষের দিকে একটি আর্টিলারি শেলের স্প্রিন্টার এসে তার ডান চোখে আঘাত হানে। যুদ্ধের শেষে এ ধর্মপ্রাণ তরুণ তার দেশের এবং ধর্মের ডাকে জেহাদ শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করে মাদ্রাসার অসম্পূর্ণ তালিম পূর্ণ করবার জন্যে গ্রামে ফিরে আসে।

সমস্ত জেহাদে তার কাছে একটি একে-৪৭ রাইফেল আর আর পি জি (RPG: রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড) এদুটোই সবচেয়ে পছন্দের হাতিয়ার হয়ে উঠে। যুদ্ধের পর থেকে আজ অবদি মোল্লা ওমর এই অস্ত্র দুটি নিজের কাছেই রেখেছে। সোভিয়েতদের পশ্চাদাপসরণের পর ওমর মাদ্রাসার পড়া শেষ করে বাপ-দাদার কাজে যোগ দিলেও গ্রামের মসজিদটিতে প্রায় প্রতিদিন ধর্মের কথা বলতে ভালবাসত এবং বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর জিকিরেই কাটাতো। তখন হয়ত সে জানতনা যে, একদিন আবার তাকে এ হাতিয়ার উঠাতে হবে ন্যায় আর সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে, আর হয়ে উঠবে তার মতাদর্শে গড়া তালেবান নামক একশক্তির তাত্ত্বিক গুরু আর সেই সাথে তাকে জানবার উৎসাহী হয়ে উঠবে তাবৎ দুনিয়া। ওমর একবার মাত্র পাকিস্তানে গিয়েছিল, তা ছাড়া সে আজ পর্যন্ত নিজের দেশের রাজধানী কাবুলেও একবারের বেশী যায় নি। করাচীতেই মোল্লা ওমরের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে ওসামা বিন লাদেনের। তখন আফগান জেহাদের প্রথম দিক। তারপর ওমরের সাথে ওসামার আর সাক্ষাৎ হয় নি তবে ওসামার আফগান জেহাদে অবদান আর আফগানিস্তানের জন্যে তার জেহাদে সক্রিয় যোগদান সবকিছুই এ লোকটির প্রতি ওমরের

---

[৫] মৌলভী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদী, জহির শাহের সময়কার সংসদ সদস্য এবং মধ্যমপন্থী বলে পরিচিত। প্রথমে ইউনুস খালিসের সাথে থাকলেও পরবর্তীতে হারকাত-ইনকিলাব-ই-ইসলামী নামক সংগঠন গড়ে তোলে। কাবুলে ১৯৯২ সনে রাব্বানী সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতিও নিযুক্ত হয়। মোল্লা ওমর, নবী মোহাম্মদের একজন কমাণ্ডারে উন্নীত হয়েছিল। লোগার প্রদেশের এ পশতুন নেতা বর্তমানে পেশাওয়ারে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধা বাড়িয়েছিল। এর পরে ১৯৯৬ সনে ওসামার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ওসামা তখন নিজের দেশ হতে বিতাড়িত নাগরিকত্ব হারা ভবঘুরে জীবন যাপন করছিল। ঐ পর্যায়ে প্রায় চার বছর সুদানে থাকার পর আবার সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে আফগানিস্তানে ওমরের শরণে এলে প্রথামত ওমর তাকে আফগানিস্তানে শরণ দেয়। করাচী ছাড়াও ওমর দুএকবার কোয়েটা এবং একবার পেশাওয়ারে গিয়েছিল। ঐ একবারই তার আফগান সীমান্তের বাইরে যাওয়া। কান্দাহার হতে কাবুলে স্থানান্তর হওয়া প্রসংগে তার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তার মতে যেদিন সমগ্র আফগানিস্তানে তালেবানদের কর্তৃত্ব কায়েম হবে সে দিনই সে স্থায়ীভাবে কাবুলে যাবে। ওমর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আব্দুর রশিদ দোস্তাম অথবা বোরহান উদ্দিন রাব্বানী কাউকেই চেনে না। দুনিয়া সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই এবং ধারণা রাখতেও চায়না। অত্যন্ত ধার্মিক বলে রাসূলুল্লাহ্‌র পরিধেয়টির ওপরে অগাধ বিশ্বাস। সে ঐ পিরহানটি মোট দুবার জন সম্মুখে বের কর হয়েছিল। একবার আহমেদ শাহ আবদালীর সময়ে ১৭৪৮ সনে যখন এ অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল ঐ সময়ে ঐ পিরহান বের করে আহমেদ শাহ আবদালী বাতাসে মেলে ধরলে কলেরা কমে আসে। আর দ্বিতীয় বার তালেবানদের হাতে কাবুল শেষবারের মত আক্রমণের পূর্বে এবং ওমরের নেতৃত্ব গ্রহণের সময়।[২]

ওমর জীবনে একবারই বিদেশী সংবাদিকদের দোভাষীর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। সেখানে এক প্রশ্নের উত্তরে ওমর বলেছিল যে, 'আফগানরা অত্যন্ত অন্তর্মুখী সহজ সাধারণ নাগরিক তাদের নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের ভূখন্ডের উপর লোভ নেই।' ওমর ইদানীং পাকিস্তানের সৈনিক শাসককে পছন্দ করতে পারছেনা। তার মতে পাকিস্তানারা মনে করে তালেবান সরকার তাদের তাবেদার সরকার যা সত্যি নয়।

ওমর কান্দাহার থেকেই কাবুলে ছোটখাট মজলিশে সুরা পরিচালনা করে। দেশের যে কোন পরিস্থিতিতে ওমরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে ছয়জন মেম্বর সম্বলিত মোল্লাদের কাউন্সিল কাবুল আর কান্দাহারের মধ্যে যোগাযোগ করে। মোল্লা ওমর সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করে। সে যোগাযোগের আধুনিক

২। টাইম ঃ মার্চ ৩১ ঃ ১৯৯৭।

www.nagorikpathagar.org

উপকরণে বিশ্বাসী নয়। তার অতি সাধারণ বসার ঘরের এককোণে যৎসামান্য বিছানার কাছেই রক্ষিত বড় ধরনের একটা সিন্দুক, তাতে রয়েছে বস্তায় ভর্তি অগণিত মার্কিন ডলার এবং আফগানী, প্রয়োজনে মুঠো ভর্তি করে ডলার অথবা আফগানী যুদ্ধরত তালেবান ইউনিটকে অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটাতে মাঝে মধ্যে পাঠিয়ে থাকে। এই অতি সামান্যে মানুষ তুষ্ট। সাধারণ মানুষ মনে করে ঈমানই একমাত্র শক্তি এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটবার নয়। এই অত্যন্ত সাধারণ আফগান আর কয়েকদিনের মধ্যে পৃথিবীর বহুল আলোচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবে। আমেরিকা ওসামার সাথে ওমরকে ধরবার জন্যেও খরচ করবে বিলিয়ন ডলার, তছনছ করবে সমগ্র আফগানিস্তান, যুদ্ধে ব্যবহার করবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি সম্পন্ন মারণাস্ত্র।

মোল্লা ওমর তার বসার ঘরের মেঝেতে তার আরও কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে বসে আফগান কাওয়াতে চমুক দিয়ে একজন তরুণ অ-আফগান সম্ভবত আরব বংশদ্ভূত মধ্যবয়েসী সৈনিককে নিম্ন স্বরে কিছু আদেশ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে তার নিকটতম সহকারীকে আবার ঐ একই পদ্ধতিতে নিম্নস্বরে কিছু নির্দেশ দিয়ে কাবুলে যোগাযোগ করে তার নির্দেশ পৌঁছাতে বলে খোলা ছাদের দিকে প্রস্থান করল। আমীরুল মোমেনীনের চারজন সহযোগী তার পেছনে পেছনে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করে ছাদে চলে এল। এদের মধ্যে একজন ওমরের মুখপাত্র বয়সে তরুণ মোল্লা ওয়াক্কিল আহমেদ।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর যে নির্দেশ কাবুলে পাঠালো তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী তৎপরতাকে নিন্দা করে বিবৃতি প্রকাশ করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা ওয়াক্কিল মোতাওয়াক্কিল কে নির্দেশ দিল। সে নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সময় রাত প্রায় এগারোটার দিকে ইসলামবাদে অবস্থিত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জাইফ সাংবাদিক সম্মেলনে এক বিবৃতি দিয়ে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার উপরে নিন্দা জানায়।

ওমর ছাদের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রিয় শহর কান্দাহারের হাজার হাজার বাতির দিকে তাকিয়ে আল্লাহর তৈরী দুনিয়ার প্রশংসাসূচক দোয়া পাঠ করল। ওমর তার নেতৃত্বে তালেবানদের উত্থানকে আল্লাহর মেহেরবাণী বলে আর নিজেকে আল্লাহর খেতমতে নিয়োজিত সামান্য বান্দা মনে করতে ভালবাসে। তার বিশ্বাস একজন মোমেন মুসলমান হয়ে ইসলামের খেতমতে জীবন বিসর্জন দিতে পারলে সে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করবে। কেন যেন

www.nagorikpathagar.org

তার এ কান্দাহার শহর ছাড়া আরও কোথাও ভাল লাগবে বলে মনে হয়না। যদিও কান্দাহারের পুরানো ইতিহাস সে কোনদিনই জানতে চেষ্টা করে নি বা প্রয়োজনও মনে করে নি।

সে রাতে কান্দাহার শহরের উপরের আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। দূরের হিন্দুকুশ পাহাড়ের উপরে তারাগুলো মিটমিট করছিল। ওমর ভাবছিল তার জীবনের বহু সংঘাতপূর্ণ রাতের কথা। ইসলামে খেদমতের কথা। তার ধারণায় মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সঠিক ইসলামের চর্চা নেই এমনকি সৌদী আরবেও নয়। যদিও ইরানে একটা ধর্মীয় অভ্যুত্থান হয়েছিল তাও একান্ত শিয়া প্রধান দেশে। সে ইরানও এখন পরিবর্তন হচ্ছে। ওমর ইমাম খোমেনীর কথা শুনেছে তখন সে মাদ্রাসায় পড়ে। তবে ইমাম খোমেনী তার দেশকে ঠিক রাখতে পারে নি-সে দেশের মহিলাদের চাকুরী করতে দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। পাশের দেশ পাকিস্তানে প্রচুর নেক মুসলমান রয়েছে তবে সে দেশের শাসকদের তার পছন্দ নয়। ওমরের ইসলাম মাদ্রাসায় লালিত, সে জানে তার ইচ্ছাগুলোকে তার দেশেই প্রণয়ন করছে, কাজেই এতে অন্য কোন দেশের ক্ষোভ থাকতে পারেনা। কোনদিন মুসলিম বিশ্ব যদি সত্যিকারের ইসলাম চর্চায় ব্রতী হয় তবে তার চেয়ে খুশী কেউই হবে না।

বেশ অদূরে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। সেগুলোর ছোট ছোট বাতি তার চোখে পড়ছে। সেখানেই তার বেশ কয়েকজন মেহমান ইসলামের খেদমতগার রয়েছে যারা তাকে দ্বীনের প্রসারের জন্যে প্রচণ্ড সাহায্য করছে। তাদের চোখ দিয়ে সে বহিঃবিশ্বকে দেখছে। কান্দাহার, তার প্রিয় শহর কান্দাহার। ওমর ভাবে একদিন এ শহর ইসলামী বিশ্ব মানচিত্রে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। এ শহরটি তার অত্যন্ত প্রিয়। সোভিয়েত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় কান্দাহারের যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে আর বের হতে পারে নি। বিশ্বের কোন দেশই এগিয়ে আসে নি তাদের শহরগুলোর সংস্কারের জন্যে অর্থ যোগাড় করে দিতে। এমনকি এত বিত্তশালী মুসলিম দেশগুলোও নয়।

পশ্চিমা বিশ্বকে ওমর ঘৃণা করে। তার মতে এসব দেশ কখনই মুসলমানদের ভাল চায় নি। যুদ্ধের সময় মুজাহিদদের প্রচুর সাহায্য করলেও পরে আর কখনও এ মুখো হয় নি। যুদ্ধের পরে আফগানিস্তানের দিকে কেউ ফিরেও দেখে নি। তার কাছে প্রফেসর ইউনুস খালিসকে একজন নেক বান্দা মনে

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল, কিন্তু সেও দেশের জন্যে কিছুই করতে পারে নি। যুদ্ধ শেষে ওমর এসব নেতাদের স্বরূপ দেখেছে। দেখেছে হিকমতইয়ারের হটকারিতা। আজ এসব নেতারা বেশীর ভাগই বিদেশের মাটিতে প্রচুর প্রাচুর্যের মধ্যে। এদের কারো প্রতি ওমরের আর শ্রদ্ধা নেই। যুদ্ধের পর দেশের উন্নতি এরা করতে চায় নি; বরং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আজ আফগানিস্তানের এ দশার জন্যে এরাই দায়ী।

কান্দাহার একসময়ের অত্যন্ত ব্যস্ততম শহর। কান্দাহার হয়ে হেরাতের মধ্য দিয়ে মধ্যএশিয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগ। আরও পূর্বেদিকে পাকিস্তানের কোয়েটার সাথে সংযোগ থাকায় বেলুচিস্তান হয়ে সরাসরি ভারতে যাওয়া যায়। উত্তরে জালালাবাদ কাবুল হয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত এর যোগাযোগ বিস্তৃত। এ জনপদ অতি পুরানো সভ্যতার ইঙ্গিত এখনও দেয়। একসময় দারাইউস-১ এর সাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল পরে আলেকজান্ডার এ জনপদকে দখল করলেও বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। আলেকজান্ডারের পর সেলুকাস-১, ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাথে যুদ্ধে হেরে গেলে এতদঅঞ্চল মৌর্য শাসনে চলে আসে। আজও গ্রীকদের এবং অশোকের সময়কার প্রচুর পুরাকীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো যুদ্ধ আর অজত্নে বিলীন হবার পথে। পরে মোগল, তুর্কী, গজনবীদের হাতবদল হতে থাকে। বহুবার কান্দাহার নামক এশহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। একবার মঙ্গলদের আক্রমণে চেঙ্গিস খাঁর হাতে, আরেকবার তুর্কী যুদ্ধবাজ তৈমুর লঙ্গ এর হাতে। আরও পরে এ জনপদে বৃটিশদের সাথে আফগানদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়।

আজকের কান্দাহার এককভাবে পশতুন অধ্যুষিত শহর যদিও অন্য উপজাতিদের উপস্থিতিও কম নয়। পশতুনদের মধ্যে প্রাধান্য রয়েছে দুররানী, গ্রিজলি এবং কাকারদের।

কান্দাহারের আশেপাশের গ্রামগুলো একমসয় বেশ স্বচ্ছল ছিল। কৃষি ভিত্তিক হলেও এখানে বেশ কয়েকটি পশমি কাপড়ের কারখানা রয়েছে। সে সাথে রয়েছে এখানকার ফলের ব্যবসা কেন্দ্র। কান্দাহারের ফলের খ্যাতি রয়েছে প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে।[৩]

আরও কিছুক্ষণ পর সমজিদ থেকে এশার নামাজের আযান ভেসে এলো।

৩। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৪-২০০১।

www.nagorikpathagar.org

'আমীরুল মোমেনীন' এশার নামাজের প্রস্তুতির জন্যে ছাদ থেকে নীচের দিকে নামার প্রস্তুতিতে ঘুরে দাঁড়ালো।

ওদিকে প্রায় একঘন্টার পথ অতিক্রম করে মোল্লা ওমরের বিশেষ দূত এবড়ো থেবড়ো রাস্তা পার হয়ে পাহাড়ের ঢালুতে ছোট্ট একটি নাম না জানা গ্রামের পাদদেশে পৌঁছলো। এ নাম না জানা দূত বিগত বিশ বছর ধরে আফগানিস্তানে সুদূর মিশর থেকে এসে প্রায় স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে গেছে। সেই কবে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জেহাদে সামিল হবার জন্যে কায়রো ছেড়েছে তার সঠিক দিনক্ষণ আর মনে পড়েছেনা। তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল পুলিশের তাড়া খেয়ে। সে 'ইসলামী জেহাদের' একজন তরুণ সদস্য ছিল। এখনও সে আল জিহাদের সদস্যই রয়েছে। তবে এখন তার কাছে আফগানিস্তানই ভাল লাগে।

পাহাড়ের নীচে যে টয়োটা ডবল কেবিন ছোট লরীতে সে এসেছিল তার পেছনে চারজন তালেবান রক্ষী বসা। তাদের বসিয়ে রেখে হাতে একে-৪৭ রাইফেলটি নিয়ে প্রায় দশ মিনিট পাহাড় বেয়ে উঠে একটি ছোট মাটির ঘরে এসে দরজায় দু'বার করাঘাত করলে কে একজন দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে আসে। ছোট একটি ঘর একটি বাতি জ্বলছে তার পাশে কয়েকজন অস্ত্রধারী আধা সৈনিক নামাজের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাদেরই একজন উঠে এসে করমর্দন করে তাকে বসিয়ে পেছনের দরজা খুলে একটি আঙ্গিনা পার হয়ে আরও ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে এসে আগন্তুককে তার অস্ত্র সেখানেই রেখে বিনয়ের সাথে ভেতরে নিয়ে গেল। পেছনে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট আঙ্গিনার মত। সেটা পার হয়ে যখন তারা আরও একটি ছোট্ট মাটির ঘরে ঢুকল তখন এশার আযান হচ্ছিল। তারা দুজনেই ওখানে নামাজ সেরে এবার প্রায় পাহাড়ের ভেতরে খোদাই করা সুরঙ্গের মুখে পৌঁছলে একজন পঞ্চাশোত্তীর্ণ 'মোমিন' এসে তাদের আরও ভেতরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে পাতা ফরাসের উপর বসিয়ে সাথের পদপ্রদর্শককে চলে যেতে বলে মিশরীয় আবরী ভাষায় তাকে তার আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করল। সব শুনে ওমরের দূতকে আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে সেখান থেকে একটা কম্বলের পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল। ওমরের দূত আল্লাহর এ বান্দাকে খুব ভাল করেই চেনে। এর নাম আবু বাসের আল-মাছরি। প্রায় দশ বছর ধরে সেও মিশর থেকে আফগানিস্তানে তার নেতার সাথে যোগ দেয়। সে ডা. আইমান আল জাওয়াহিরীর অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

ঘনিষ্ঠ সহচর এবং সে সুবাদে আল কায়দা গোষ্ঠীর নেতা ওসামা বিন লাদেনের বিশ্বাসভাজন।

ওমরের দূতকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। তাকে প্রায় অন্ধকার পথে দুমিনিটের মত হেঁটে আরও একটু ভেতরে নিয়ে এলো। পাহাড়ের ভেতরে ছিমছাম একটি ছোট কামরা সাদৃশ্য জায়গায় কম্বলের উপরে তিন জন লোক বসা। মাঝখানে যে বসা তার মাথায় সাদা পাগড়ি। এ ধরনের পাগড়ি দক্ষিণ সৌদী আরব এবং ইয়েমেনে পরতে দেখা যায়। শুভ্র সালোয়ার কামিজের উপরে একটি কমব্যাট জ্যাকেট পাশে রাখা একে ৪৭- রাইফেল। পেছনে আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের একটা বড় আকারের মানচিত্র।

মাঝখানে উপবিষ্ট হালকা পাতলা আল্লাহ্‌র বান্দা প্রায় মধ্য চল্লিশে তার বয়স। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি অত্যন্ত সৌম্য মূর্তি, লম্বায় প্রায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, হাতের কাছে বহু বছরের ব্যবহৃত একটি ছড়ি। সব মিলিয়ে একটি শান্ত এবং উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দুটি মনে হয় মুখের ভাষা পড়তে জানে। আজকে সমগ্র বিশ্ব তাকে এক নামে চেনে। এই ব্যক্তি আর কেউই নয় স্বয়ং ওসামা বিন লাদেন। আর তার বাঁয়ে বসা আল-কায়দার চালনা শক্তি বলে পরিচিত ডা. আইমান আল জাওয়াহিরী। ওমরের দূত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে হাতের ইশারায় বসতে বলল। এই ওসামা বিন লাদেন প্রবাদ পুরুষকে প্রথমবারের মত এত কাছে থেকে দেখল। সম্মানে তার মাথা নুয়ে আসতে চাইল।

ওসামা বিন লাদেন ওরফে শেখ ওসামা বিন লাদেন, যুবরাজ, আমীর, আবু আব্দুল্লাহ, মুজাহিদ শেখ, হাজি, ডাইরেক্টর। বিভিন্ন জায়গায় তার অনুসারীদের কাছে এসব বিভিন্ন নামে পরিচিত। যদিও তার আফগানিস্তানের এবং আফগানদের সাথে ওসামার প্রায় ২১ বছরের পরিচিতি তবে এখানে বিগত সাত বছর ধরে একটানা বসবাসরত। তার সংস্থা আল-কায়দার সদর দপ্তর এখন কান্দাহারে একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা। ১৯৯৬ সনে সুদান থেকে সরাসরি এখানে চলে আসার পর বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ওসামা তার জীবনকে, তার ভাষায় ইসলামের জন্যে উজার করে দেবার প্রত্যয় নেয়। নিজেকে নিগৃহীত সাধারণ মুসলমানদের একজন সামান্য খাদেমে পরিণত করতেই তার অব্যাহত প্রয়াস। বাকী জীবন ইসলামের নামে জেহাদ করাই

www.nagorikpathagar.org

এখন তার একমাত্র ধ্যান-ধারণা। অত্যন্ত ধার্মিক এ ব্যক্তিটির কর্মপদ্ধতি পাশ্চাত্যের এবং প্রায় সব মুসলিম দেশের প্রধানদের কাছে সন্ত্রাসবাদ আর সাধারণ জনগণের নিকট নিগৃহীত জনগণের সোচ্চার বিদ্রোহ বলে পরিগণিত (তবে এতে সবাই সম্মত এমনও নয়)। এক কথায় মুসলিম বিশ্বে তাকে যেমন একদিকে অনেকেই ভালবাসে আবার তেমন সংখ্যক মুসলমানরা ঘৃণা না করলেও খুব একটা আলোচনায় আনতে চায়না। ওসামা বিন লাদেন এখন বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী বলে আমেরিকা তথা সমগ্র পশ্চিমা জগতে পরিচিত। প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর প্রধানদের নিকট আতঙ্কের এক নাম ওসামা বিন লাদেন। যার মাথার মূল্য দুই মিলিয়ন ডলার থেকে পাঁচ এবং পরে পঁচিশ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

সৌদী আরবে ১৯৫৭ সনে এক বিরাট ধনাঢ্য পরিবারে ওসামা বিন লাদেনের জন্ম। বাবা মোহাম্মাদ বিন লাদেন মধ্যপ্রাচ্যে বিখ্যাত বিন লাদেন গ্রুপ অব কোম্পানীর মালিক ছিল। তার বাবার মৃত্যু হয় নিজস্ব উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় ১৯৬৬ সনে। ওসামার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। স্কুলের ছাত্র ওসামা বাপের ৫৩ জন ছেলে মেয়ের মধ্য ১৭ তম ছেলে সন্তান। বাবার পুরো নাম মোহাম্মদ বিন ওউদ বিন লাদেন। তার অনেক স্ত্রীর মধ্য ওসামার মাতা সিরীয় রমণী বলে তথ্য পাওয়া যায়। মোহাম্মদ বিন লাদেন ইয়েমেন থেকে সাধারণ চাকুরীর খোঁজে আরও অনেক ইয়েমেনীদের সাথে ১৯৩২ সনে সৌদী আরবে পৌঁছে। ঐ সময়ে সৌদী আরবে বহু ইয়েমেনী কায়িক প্ররিশ্রমের কাজে নিয়োজিত হতো। তেমনি পরিস্থিতিতে মোহাম্মাদ বিন লাদেন 'এ্যারামকো' (ARAMCO) দি অ্যারেবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানীতে রোজ প্রায় বিশ সেন্ট মজুরীতে রাজমিস্ত্রীর সহকারী হিসেবে কাজ পায়। ইয়েমেনের হাদরামাউত থেকে আগত অনেকের সাথে এক রুমে বসবাসরত এ তরুণ প্রতিদিনের মজুরীর সিংহভাগই জমিয়ে রাখত। বেশ কয়েক বছর পরে তার জমানো টাকা দিয়ে নিজস্ব একটি ছোট নির্মাণ কোম্পানী স্থাপন করে। প্রথমে অতি ক্ষুদ্র কাজ থেকে শুরু করে মোহাম্মদ বিন লাদেন নিজের মেধা, অধ্যবসায় আর অত্যন্ত কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ক্রমেই সৌদী আরবে একটি বিশ্বস্ত নামে পরিণত হয়। অত্যন্ত ধার্মিক এবং দয়ালু বলে পরিচিত মোহাম্মদ বিন লাদেন ১৯৫০ সনের দিকে রিয়াদে সৌদী বাদশাহের জন্যে নব প্রস্তাবিত একটি প্রাসাদের নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব পেলে তার ভাগ্য ক্রমশঃই সুপ্রসন্ন হতে শুরু করে। উল্লেখ্য, সে এসময়ে এবং গোটা পঞ্চাশ

www.nagorikpathagar.org

দশকে সৌদী আরব তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মন্দা কাটিয়ে উঠে এবং তেল রপ্তানীকারক অগ্রগামী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তখন ইবনে সউদ সৌদী আরবের বাদশাহ। ইবনে সৌদ ১৯৫৩ সনে মৃত্যুবরণ করে।

ক্রমেই মোহাম্মদ বিন লাদেনের ভাগ্য খুলতে থাকে। ধর্মভীরুতা, সততা এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্যে মোহাম্মদ বিন লাদেন ধীরে ধীরে সৌদী বাদশাহদের আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হলে পারবারিক ঘনিষ্টতা বাড়তে থাকে। তার কপাল আরও খোলে যখন বিন লাদেন কোম্পানীকে পবিত্র হেজাজ প্রদেশের মরুভূমি চিরে জেদ্দা থেকে পবিত্র নগরী মদীনা শরিফের 'সুপার হাইওয়ে বানানো' এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। সময়ের বহু আগে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ রাস্তা তৈরী শেষ করবার পর থেকে আর পেছন ফিরে দেখে নি মোহাম্মদ বিন লাদেন অথবা লাদেন গ্রুপ অব কোম্পানী। ক্রমেই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে লাদেনের নির্মাণ কোম্পানীর নাম সর্ব শীর্ষে চলে আসে। তার এসব কাজের জন্যেই তাকে নিজস্ব উড়োজাহাজে ঘুরে বেড়াতে হতো। প্রায়সই সে ফজরের নামাজ মক্কা শরিফের মসজিদুল হারামে, ঐ একই দিনে জোহরের নামাজ মদীনা শরিফের মসজিদে নব্বীতে এবং মাগরেবের নামাজ জেরুজালেমের মসজিদুল আল আকসায় পড়তে হত। মোহাম্মদ বিন লাদেন ঐ সময়েই ইসলামের তিনটি পবিত্র মসজিদের সংস্কার এবং পরিবর্ধনের দ্বায়িত্বও পায়। এ তিনটি মসজিদ হল মক্কায় মসজিদুল হারাম, মদীনায় মসজিদ-ই-নব্বী এবং জেরুজালেমে আলকুদ আল শরিফ (আল-আকসা)। সেই হতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ পবিত্র স্থানগুলোর সংরক্ষণের এবং সংস্কারের কাজ বিন লাদেন কোম্পানীই করত। এমনি ছিল মোহাম্মদ বিন লাদেনের জীবন। শেখ মোহাম্মদ বিন লাদেন ইসরায়েল কর্তৃক জেরুজালেম দখলের একবছর পূর্বেই মারা যায়।

বিন লাদেন কোম্পানীগুলোর খ্যাতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে কাজের জন্যে আরও কয়েকটি কোম্পানী খুলতে হয়। এর মধ্য জর্দানের সমস্ত বড় রাস্তা, আম্মানের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর তৈরী করার জন্যে পৃথিবীর বহুদেশের ইঞ্জিনিয়ার আর কনসালটেন্ট নিয়োগ করার সুবাদে পশ্চিমা দেশ এমনকি খোদ আমেরিকার অনেক বড় বড় কোম্পানীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাবার মৃত্যুর পর তার পরিবারের সদস্যদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগির সমস্যা দেখা দিলে সৌদী বাদশা ফয়সাল স্বয়ং বিন লাদেন কোম্পানীগুলোর সমস্যার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছোট একটি কোম্পানী নিয়োগ করে চলিত ব্যবসা তদারক করবার জন্যে। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি অন্য ভাইদের হয়ে ওসামা বিন লাদেন বেশীর ভাগ ব্যবসা তদারক শুরু করে। ততদিনে ওসামা কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বের হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত লাজুক আর ধার্মিক ওসামা বিন লাদেন তার বাবার মতই সততা আর নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে অতি সত্তর প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। বাবার সম্পত্তির ভাগের ৮০ মিলিয়ন ডলারের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার পর নিজস্ব কোম্পানী আল হিজরা স্থাপনা করে। অল্পদিনের মধ্যেই ওসামা বিন লাদেন এবং তার কোম্পানী তার বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়লে এর কার্যপরিধি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে।

ওসামার জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন আসে যখন তার নির্মাণ কোম্পানীকে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র দুটি মসজিদ মক্কাশরিফের কাবাঘর সহ মসজিদুল হারাম আর মদীনা শরিফের হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর রওজামোবারক সহ সমজিদে নব্বীর সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে পুনরায় নিয়োজিত করা হয়। প্রায় দু বছরের উপরে ওসামা বিন লাদেন এ দুই পবিত্র স্থানে কাটায় এবং এ সময়েই তার ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে ওসামা এ দুই মসজিদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সুবাদে। মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশের নাগরিকদের সাথে ভাবের আদান প্রদান হয়, এতে তাবত মুসলিম দুনিয়া সম্বন্ধে তার বেশ ভাল ধারণা জন্মায়।[৪] তার জীবনের আর একটি ইচ্ছা ছিল তার বাবার মত আল কুদ্স (জেরুজালেম) এর মসজিদে নামাজ পড়া কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি কারণ ১৯৬৭ সনের যুদ্ধের পর এবং তার মতে বেশীর ভাগ আরব মুসলমান দেশগুলোর শাসকদের হটকারিতায় জেরুজালেম সহ সমগ্র পশ্চিম তীর এবং গাজা ভূখন্ড ফিলিস্তিনীদের হারাতে হয়। আজ ফিলিস্তিনীদের দুর্দশা তাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। তার মতে আরবদের হাতে এত টাকা পয়সা আর

৪। আনহোলি ওয়ারস ঃ পৃষ্ঠা ১১৭-১১৯।

www.nagorikpathagar.org

তেলের মত অস্ত্র থাকতেও ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের হাতে মুসলিম নিধন সহজেই হজম করে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর তাবেদার হয়ে পড়েছে।

ওসামা বিন লাদেন জেরুজালেমের ব্যাপারে সবসময়ই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। তার কারণ প্রায়ই তার বাবা ঐ পবিত্র নগরীতে নামাজ আদায় করত আর মাঝে মধ্যে ওসামাকে জেরুজালেমের কাহিনী শুনাতো।

জেরুজালেমের প্রতি ওসামার প্রচুর দুর্বলতার কারণে সে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করত। ১৯৭৯ সন থেকেই সাদাত ইসরায়েলের সাথে এককভাবে আতাত করতে ব্যস্ত ছিল আর এ কারণেই মধ্যপ্রাচ্যে ঐক্যের কোন সম্ভাবনাই সে দেখে নি। জর্ডানের বাদশাহ হুসেনকে, তার পিতামহ আবদুল্লাহর হটকারিতার নিদর্শন বলে মনে করত। প্রতি বছরই হজ্বের সময় ওসামার সাথে মিশরীয়দের সাক্ষাৎ হতো। অনেকের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে ওসামা মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড আর আল-জিহাদের (গিহাদ) সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে শুরু করে।

ক্রমে ওসামা বিন লাদেন নিজের দেশের সরকারের অ-ইসলামী কীর্তিকলাপ, আমেরিকার তাবেদারি আর দুর্নীতির কারণে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। বহুবার এসব নিয়ে সরকারের সমালোচনা না করবার জন্য সৌদী রাজকীয় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান যুবরাজ তর্কী তাকে সাবধান করতে থাকে। ক্রমেই ওসামা ভেতরে ভেতরে একটা কিছু করবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে থাকে।

জেরুজালেম নগরীর ইতিহাস পৃথিবীর তিনটি ধর্ম-ইসলাম, খ্রীষ্টান আর ইহুদী ধর্মের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ নগরীর 'ডোম অব রক' বা আল-আক্‌সা মজসিদই এক সময় মুসলমানদের প্রথম 'কেবলা' (নামাজে সেজদার দিক) পরে তা কোরআনের এক সূরার মাধ্যমে রসূলাল্লাহর সময়েই কাবার দিকে পরিবর্তিত হয়। বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের নিকট তাই জেরুজালেম ধর্মীয় দিক থেকে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। তা ছাড়া এ নগরীর কথা পবিত্র কোরআন শরীফে বহু জায়গায় উল্লেখিত রয়েছে। এ ছাড়াও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও জ্ঞাত যে, এই জেরুজালেম মসজিদ থেকে শবে-মেরাজের

www.nagorikpathagar.org

সেই পবিত্র রাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আসমানী যাত্রা করেন।[৫] এ চার হাজার বছরের পুরাতন শহর মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জয় করেন। ৬৮৮-৬৯১ ডোম অব রক বা পাথরের আচ্ছাদন (প্রথম কেবলা) নামক জায়গায় হযরত ওমর (রাঃ) নির্মিত মসজিদ যা মসজিদে ওমর বলেও পরিচিত, জায়গায় তৎকালীন খলিফা আব্দুল মালেক আল-আকসা মসজিদ তৈরী করেন। এই 'ডোম অব রকস্' ইহুদীদের নিকটও অত্যন্ত পবিত্র। তাই এ জায়গা নিয়েও বর্তমানে এ দু ধর্মের বিশ্বাসী বিশেষ করে প্যালেসটিনিয়ান আর ইসরায়েলীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রবাহমান। স্মরণযোগ্য যে, ২০০০ সনের শেষের দিকে ইসরায়েলের তৎকালীন মন্ত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী (২০০১ সন) এরিয়েল শেরনের মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিয়ে 'ইনতেফাদা' বা প্যালেসটিনিয়ান গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয় আর রক্তপাত চলতে থাকে বিগত বছরেও।

'ডোম অব রকের' একই এলাকায় রয়েছে খ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্র গীর্জা 'হোলি স্কেলেপচার'[৬] এটি পুনঃনির্মাণ হয় ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। আর সমগ্র এলাকাটি যা একটি দেয়ালে বেষ্টিত, ইহুদীরা 'টেম্পল মাউন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এ জায়গাকেই হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মিত টেমপল অব সলোমন (সোলায়মান) বা 'টেম্পলাম ডোমিনী' বলে মনে করে। উল্লেখ্য, হযরত সোলায়মান (আঃ) ইহুদীদের নবী বলেও পরিচিত। এরই বাইরের পশ্চিম দেয়ালই হচ্ছে বিশ্বের ইহুদীদের পবিত্রতম ধর্মীয় যাত্রার জায়গা 'ওয়েলিং ওয়াল'। এরই অদূরে মাউন্ট জিয়ন, যেখানে ইহুদী ধর্মমতে কিং ডেভিড (সম্ভবত হযরত দাউদ আঃ) এর সমাধি বলে শ্রুত এবং পবিত্রস্থান।[৬] আর এ সমস্ত পবিত্র জায়গাগুলো প্রায় একই স্থানে পূর্ব জেরুজালেম নগরীতে। কাজেই

হোলি স্কেলেপচার ঃ এ স্থানটি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্যে অত্যন্ত পবিত্র কারণ এখানেই যিশু খ্রীষ্টকে (হযরত ঈসা (আঃ) রোমানরা ক্রসিফিক করে হত্যা করে। এখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয় এবং এখান থেকে স্বর্গের পথে উথান হয়। যদিও এ স্থান নিয়ে খ্রীষ্টানদের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। খ্রীষ্টাব্দ -৭০ এ জেরুজালেম নগরী ধংসপ্রাপ্ত হলে ১২৪৯ সনে এ স্থানকে পুনঃনির্মাণ করে বর্তমান অবস্থান আনা হয়।

৫। এ এল তি উই : জেরুজালেম ইটস্ প্লেস ইন ইসলাম এন্ড এরাব হিসট্রি ঃ ১৯৬৯।

৬। ষ্টিভেন রুনচিম্যান : এ হিসট্রি অব ক্রুসেড : তৃতীয় ভলিউম।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর বৃহত্তর তিনটি ধর্মাবলম্বীদের জন্যেই জেরুজালেম নগরী অত্যন্ত পবিত্র। তবে ইহুদীরা স্বভাবতঃই মনে করে যে, তারাই এ নগরের প্রকৃত দাবীদার কারণ তাদের মতে কিং ডেভিড (হযরত দাউদ আঃ) এর রাজ্য ইসরায়েলের রাজধানী শহর ছিল জেরুজালেম। যেমনটা আগেই বলেছি এ শহরের পূর্ব জেরুজালেম যা ১৯৪৮ সনে জর্দানের তৎকালীন বাদশাহ আব্দুল্লাহ[২] দখল করেছিল। ১৯৬৭ সনে, এ জর্দানই পরাজিত হয়ে শহর সহ সম্পূর্ণ পশ্চিম তীর তুলে দেয় ইসরায়েলের হাতে।

এ শহরের বিবরণ সংক্ষেপে এ জন্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা দেশের সংঘাত বিশেষ করে আরব ইসরায়েলের সংঘাত জেরুজালেম কেন্দ্রিক। বর্তমানের এবং এই বইয়ের প্রেক্ষিত বুঝতে হলে এ সামান্য ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি। এ শহরের ইতিহাস নিয়ে প্রচুর বই সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত হয়েছে।

---

(২) বাদশাহ আব্দুল্লাহ ঃ জর্দানের বর্তমান তরুণ বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন হোসেনের প্রপিতামহ বাদশাহ আব্দুল্লাহ তৎকালীন ট্রান্সজর্দানের প্রথম বাদশাহ ছিলেন। তার পিতা একসময় হেজাজের আমীরও ছিলেন। জর্দানের বাদশাহের পরিবার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধর বলে পরিচিত। ১৯৪৮ সনের ১৫ই মে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার একদিন পরেই আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ সময় একমাত্র জর্দানই তার এরাব লিজিয়ন নামক সেনাবাহিনী দিয়ে আজকের পশ্চিমতীর এবং পূর্বজেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলো দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, ইয়ারায়েল এবং জর্দান কর্তৃক দখলকৃত এ সমস্ত জায়গাগুলোই প্যালেস্টাইনের অংশ ছিল। এ দখল আর যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে প্রায় ৪,০০,০০০ প্যালিস্টিনিয়ান আরব জর্দানে শরণার্থী হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের সময় বাদশাহ আব্দুল্লাহ ষড়যন্ত্র করে জেরুজালেমের অর্ধেক দখলের পরপরই তৎকালীন ইসরায়েলের সাথে শান্তি চুক্তিতে সই করে বলে রটে যায়। যা হোক দখলকৃত ২,১০০ বর্গমাইল ক্ষেত্র ১৯৫০ সনে জর্দান তার সার্বভৌমত্বে নিয়ে আসে। এ ব্যবস্থা তখন মাত্র ব্রিটেন এবং পাকিস্তান ছাড়া আর কেউ স্বীকার করে নি। বাদশাহ আব্দুল্লাহ নিজেকে মসজিদে আল-আকসার রক্ষক বলে ঘোষণা করেন। অতপর জুলাই ২০, ১৯৫১ সনে জুমার নামাজ শেষে জেরুজালেম নগরীর আল-আকসা মসজিদের সামনেই এক প্যালেস্টিনিয়ান যুবকের হাতে বাদশাহ আব্দুল্লাহ নিহত হয়। আব্দুল্লাহর পুত্র তালাল উত্তরাধিকার হলেও একবছরের মাথায় মানসিক রোগের জন্যে তদীয় পুত্র হোসেন বিন তালাল ১৮ বছর বয়সে মে ২, ১৯৫৩ সনে জর্দানের বাদশাহ এর পদে অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সনে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সনের দখলকৃত সমস্ত পশ্চিমতীর আর সম্পূর্ণ জেরুজালেম নগরী ইসরায়েল পুনঃ দখল করে।

www.nagorikpathagar.org

ফিরে আসা যাক ওসামা বিন লাদেনের ইতিবৃত্তে। ইসলায়েলের আরবদের প্রতি মনোভাব, আমেরিকার তরফ থেকে ইসরায়েলকে আস্কারা দেয়া তদুপরি সমগ্র আরব বিশ্বে ক্ষমতা আর অর্থলোলুপ রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্রের দুর্বলতা এসবের বিরুদ্ধে ওসামা অন্তরজ্বালায় ভুগতে থাকে। এরই মধ্যে ওসামার নিজস্ব কোম্পনীর ব্যাপক বিস্তৃতি ছাড়াও প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক হয়ে পড়ে। এত ধন সম্পত্তি থাকার পরও ওসামার জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নি।

এরই মধ্যে ১৯৭৯ সনে বিশ্বের দুটি বিপরীতমুখী ঘটনা ওসামা বিন লাদেনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এর একটি হল ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সনে মধ্যপ্রাচ্য আমেরিকার শক্ত ঘাঁটি আর অকৃত্রিম বন্ধু বলে পরিচিত তেল সমৃদ্ধ ইরানে ইসলামিক (শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক) রেভ্যুলিউশন (অভ্যুত্থান) যার মাধ্যমে রেজা শাহের উৎখাত আর ধর্মীয় নেতা খোমেনীর আবির্ভাব। আর অন্যটি ঐ একই বছর ইরানের পার্শ্ববর্তী আরেকটি মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণ এবং দখল করণ।

ইরানে শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনীর ইসলামিক রেভ্যুলিউশন এবং এতদঅঞ্চলে আমেরিকার বিরুদ্ধাচারণ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বে এক নতুন জাগরণের সূচনা করে। ওসামা বিন লাদেনের মধ্য ইরানের ঘটনা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয় ঘটনা যেটি এর পর থেকে শুধু বিশ্ব ব্যবস্থাতেই পরিবর্তন আনে নি বরং সমগ্র বিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্বে এক বিশাল পরিবর্তন এনেছে আর সেটা হল সোভিয়েতদের আফগানিস্তান দখল। আর এ বিষয়টি ওসামাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। তার ভেতরে ইসলামের নামে জেহাদ করবার অদম্য স্পৃহা জেগে ওঠে। তার এ বাসনা পূর্ণ হতেও বেশী সময় লাগে নি। ভাগ্যের কি পরিহাস আজ ওসামা বিন লাদেনকে এই সুদূর আফগানিস্তানে প্রায় নির্বাসিত হতে হয়েছে আর তাকে পৃথিবীর একনম্বর সন্ত্রাসী বলে সনাক্ত করেছে সেই আমেরিকা যে একদা তাকে জেহাদ পরিচালনায় হাতে খড়ি দিয়েছিল।

এটা ঘটেছিল ১৯৮১ সনের দিকে যখন আমেরিকার তৎকালীন সি আই এ এর পরিচালক তার সৌদী প্রতিপক্ষ কামাল আধাম এবং পরে প্রিন্স তুর্কী

www.nagorikpathagar.org

আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সাহায্য সহোযোগিতার জন্যে বেসামরিক সংস্থাগুলোর সাহায্য খুঁজছিল। সে সময়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সৌদী অর্থ সাহায্যের। সৌদী আরব আমেরিকার ডাকে সাড়া দিয়ে 'জেহাদ' পরিচালনার জন্যে প্রচুর অর্থ সরকারী কোষাগার থেকে দিলেও দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং বড় কোম্পানীগুলোকে সাহায্য করতে আবেদন জানালো। এরই প্রেক্ষাপটে সৌদী রাজপরিবারের সদস্য এবং দেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আজিজ সরাসরি এসব ব্যক্তিদের তার দেশের হয়ে সাড়া দিতে আহবান জানালে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পায়। এর মধ্যে বিন লাদেন গ্রুপের হয়ে ওসামা বিন লাদেনও উপস্থিত ছিল। ওসামা বিন লাদেন কোন সময়ক্ষেপণ না করে নিজ উদ্যোগে সরাসরি পাকিস্তানের পেশাওয়ারে এসে উপস্থিত হল। সেই থেকে তার আফগান যুদ্ধ আর আফগানিস্তানের সাথে পরিচিতি । তারপর অনেক ঘটনা আর অনেক সময়ের ব্যবধান। ১৯৯৬ সন থেকেই ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে তার যুদ্ধের সময়কার আল-কায়দা সংস্থার সাথে অসমাপ্ত জেহাদে পুনঃ লিপ্ত হয়। আজ প্রায় ২৬ টি দেশে আল-কায়দা (বেস বা মূল) প্রসারিত। ওসামা বিন লাদেনের জীবনে সি আই এ'র সংস্পর্শে আসার পর থেকে বহু পরিবর্তন হয়েছে। যা আমরা আরও পরে এ আল-কায়দা গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনাকালে দেখতে পাব। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১৯৯৭ সনে বিন লাদেনের উপর সি আই এ এ'র যে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় তাতে ওসামা বিন লাদেনের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে অবদান এবং সি আই এ এর সাথে সম্পৃক্ততার কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।[৭]

তখন প্রায় আটটা বেজে বিশ মিনিট। মোল্লা ওমরের প্রেরিত দূতের সম্পূর্ণ বক্তব্য শোনার পর ওসামা বিন লাদেন চোখ তুলে মৃদু স্বরে জাওয়াহিরীকে যা লিখে ওমরের দূতের হাতে দিতে বলল তার তর্জমা করলে কতকটা এই দাঁড়াবে যে, আমেরিকার হামলার সাথে ওসামা বিন লাদেন কোনভাবেই যুক্ত নয় তবে এ হামলার সে সরাসরি নিন্দাও করছেনা; বরং এ হামলা যারা করেছে তাদের সাহসের প্রশংসা করছে। এ হামলার খবরটি ওমর পাঠালেও বেশ

৭। রবাট ল্যাসি, দিকিব্ভম (লন্ডনঃফোনটানা /কলিন্স ১৯৮৭ পৃ ৫০৭ এবং সি এন এন/ ল্যারি কিঃ লাইভ ঃ ২১ অক্টোবর ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ পূর্বে জাওয়াহিরী নিজস্ব পদ্ধতিতে খবরটি জানতে পেরে আমীর অর্থাৎ ওসামাকে জানিয়েছিল। ওমরের দূত ওসামার বার্তা নিয়ে কান্দাহার অভিমুখে ফেরত যাত্রা শুরু করল রাত তখন প্রায় ন'টা।

ডা. আইমান আল জাওয়াহিরী, ওসামার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও ওসামাকে প্রচুর সম্মান করে। সেও তার জীবন ইসলামের খেদমতের জন্যে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবেনা। মিশরের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য এ সোম্যমূর্তিমান শিশু শৈল্য বিষেশজ্ঞ (পেডরিয়াটিক সার্জন) প্রায় দশ বছরের উপরে আল-কায়দায় পুনরায় যোগ দেয়। সেও ওসামার মত আফগান যুদ্ধে মিশর থেকে যোগ দিয়েছিল। এখানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় ওসামা কর্তৃক কান্দাহারে স্থাপিত চারটি হাসপাতাল দেখাশোনা করত। এসব হাসপাতাল যুদ্ধাহত মুজাহিদদের জন্যে ওসামার ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই তৈরী করা হয়েছিল।

আইমান-আল-জাওয়াহিরী ১৯৫১ সনে কায়রোর অন্যতম শিক্ষিত প্রভাবশালী বংশে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতামহ কায়রোর বিশ্ব বিখ্যাত আল-আজহার মসজিদের ইমাম ছিল। এ মসজিদের প্রভাব সারা মধ্যপ্রাচ্যে তথা মুসলিম বিশ্বে আজ অব্দি আবিসংবাদিত। তার পিতামহের আরেক ভাই তৎকালীন আরব লীগের প্রথম মহাসচিব ছিল। তার পিতামহের ছোটভাই ৭৩ বছর বয়স্ক মাহফুজ আজ্জম প্রখ্যাত ক্রিমিন্যাল আইনজীবী এবং গতবছর মিশরের নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া লেবার পার্টির প্রেসিডেন্ট। এ পার্টি উগ্র ধর্মীয়পন্থী বলে মিশর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে। জাওয়াহিরীর পিতা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজির প্রফেসর ছিল এবং ১৯৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করে। জাওয়াহিরী এই একই কলেজ থেকে ১৯৭৪ সনে ডাক্তারী পাশ করে এবং পরে সার্জারীতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে।

আইমান জাওয়াহিরী ইসলামের উপরে কয়েকটি বইও রচনা করে বিখ্যাত হয়। তার একটি তরজমাকৃত বইয়ের নাম 'বিটার হারভেস্ট'। ঐ বইটিতে মুসলিম বিশ্বের বর্তমানে নিষিদ্ধ সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের[@] কিছু বিশ্লেষণ

@ মুসলিম ব্রাদারহুড : আরবি ভাষায় আল ইখওয়ান আল মুসলিমন। ১৯২৮ সনে ইসমাইলিয়া মিশরে ইংরেজদের অধিপত্য আর ইরেজী প্রভাব থেকে ইসলামকে মুক্ত রাখার জন্যে এক স্কুল শিক্ষক হাসান আল বান্না কোরান ও সুন্নাভিত্তিক শিক্ষার উপরে ভিত্তি করে সমাজ প্রতিষ্ঠার উপরে জোর দেবার জন্যে এ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৮ সনের পরে এ সামাজিক আন্দোলন প্রায় মধ্যাপ্রাচ্যে সামাজিক আন্দোলনের বদলে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ক্রমেই এ আন্দোলন

www.nagorikpathagar.org

মূলক তথ্য রয়েছে। ডা. জাওয়াহিরী ১৯৭০ সনে ছাত্রাবস্থা থেকেই ইসলামিক জেহাদ (আল গিহাদ) নামক সংস্থার শীর্ষ নেতায় পরিণত হয়। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৮১ সনের ৬ই অক্টোবর এই আল-জিহাদের সদস্যরা সৈনিকের বেশে ১৯৭৩ সনের রমজান মাসের আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের বার্ষিকী উদযাপন সামরিক প্যারেডে তৎকালীন মিশরীয় রাষ্ট্রপতি আনোয়ার-এল-সাদাত কে হত্যা করে। এ হত্যার পেছনে সাদাতের সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭৮ সনে ইসরায়েলের সাথে ক্যাম্পডেভিডে শান্তি চুক্তিতে দস্তখত এবং ১৯৭৭ সনের ১৯-২০ নভেম্বরে সফরের কারণ সমূহ রয়েছে। এই শান্তি চুক্তি এবং সাদাতের সফরকে মিশরের ইসলামী সংগঠনগুলো বিরোধিতা করে আসছিল। আইমান জাওয়াহিরী এবং আল-জিহাদের মত আরও অনেক সংগঠনের মতে এ দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব ঐক্যের ফাটল ধরিয়েছে এবং এটা সাদাতের আমেরিকার সাহায্যে নিজের গদীকে পাকাপোক্ত করবার প্রয়াসের এক ধাপ ছিল মাত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল, এসব ইসলামী সংস্থাগুলো আলাদা হলেও বৃহত্তর আঙ্গিকে ১৯২৮ সনে মিশরের এক অখ্যাত স্কুল মাস্টার হাসান-আল-বান্না দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদার হুডের ছত্রছায়ায় লালিত।

এ হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও অনেকের সাথে আইমান জাওয়াহিরীকেও গ্রেফতার করা হয় কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণাদির অভাবে কিছু দিন কারাভোগের পর ১৯৮৪ সনে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।[৮] মুক্তি প্রাপ্তির দু বছর পর

মিশরের রাজতন্ত্রের বিরোধীতায় রূপ নিতে থাকলে হিংস্রতার পর্যায়ে চলে যায়। ব্রাদারহুডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্র শেষ করে পিত্তর ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। ১৯৫২ সনে জেনারেল নাজিবের সামরিক অভ্যুত্থান রাজতন্ত্রকে শেষ করলেও ব্রাদারহুডকে প্রশ্রয় দেয় নি। এর পরে নাসের ক্ষমতায় আসলে ব্রাদারহুড গোপন সংগঠনে পরিবর্তিত হয়। অক্টোবর ২৬, ১৯৫৪ সনে আলেকযান্দ্রিয়ায় প্রসিডেন্ট নাসেরের ব্যর্থ প্রাণ নাসের চেষ্টা করার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে শীর্ষ স্থানীয় ছয় নেতাকে দেশদ্রোহিতার দায়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় এবং আরও কিছু নেতাকর্মীদের অনেক বছরের জন্যে কারাদন্ড দেয়া হয়। তবুও বিগত শতাব্দীর সত্তর এবং আশির দশকে এ মুভমেন্ট সাধারণতঃ গোপন সংগঠনের মাধ্যমে সমগ্র মাগরেব বলে পরিচিত উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে আর মধ্যপ্রাচ্য সীমিত ভাবে প্রসারিত হতে থাকে। মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনকেই উগ্রপন্থীদের প্রথম সংগঠন বলে ধরে নেয়া হয় এবং আরও পরে ব্রাদারহুড থেকেই জন্ম নেয় অন্যান্য উগ্রপন্থী ইসলামিক দলগুলো। এত প্রসারের পরও সিরিয়ায় এর এক অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা হয়। আরও পরে মিশর এবং জর্দানে সিমিত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রাদারহুডের অনেক নেতা প্রকাশ্যে চলে আসে। মিশরে সাদাত ক্ষমতা গ্রহণের পর ব্রাদারহুডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। অবশ্য এর সম্পূর্ণ কারণ ছিল সাদাতের নিজস্ব রাজনীতি। ব্রাদারহুড এখনও নিষিদ্ধ।

৮। জেনস্ ইন্টারন্যাশনাল নিউজ : অক্টোবর ৭, ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

জাওয়াহিরী সৌদী আরব হয়ে ১৯৮৬ সনে পেশাওয়ারে সি আই এ পরিচালিত সোভিয়েত বিরোধী 'জেহাদে' যোগ দিতে এসে ওসামার আল-কায়দার সাথে জড়িয়ে যায়।[৯] আজও জাওয়াহিরীর বিরুদ্ধে তার দেশেই তার অবর্তমানে আল-জিহাদ আর তার বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়েরকৃত রয়েছে। পশ্চিমা দেশের ডা. আইমান আল জাওয়হিরীকে শ্বেতপত্র অনুযায়ী আল-কায়দার তাত্ত্বিক গুরু বলে চিহ্নিত করে তাকে দ্বিতীয় নম্বরের সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করেছে। আর এই আল-জাওয়াহিরীর সম্বন্ধে আরও পরে আফগান যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পারব।

ওসামা বিন লাদেনের সাথের তৃতীয় ব্যক্তির নাম আতেফ, বয়স প্রায় ৫৭ বছর। আতেফকেও সাদাতের হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে যথেষ্ট প্রমাণাদি না থাকায় ছাড়া পায়। আতেফও মিশরীয় অধিবাসী এবং কায়রোবাসী প্রাক্তন পুলিশ সুপার। আতেফও জাওয়াহিরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় থেকেই আল-কায়দা আর ওসামা বিন লাদেনের সাথে জড়িত। আতেফ আল-কায়দা সামরিক বিভাগ দেখাশোনা করে। প্রথমে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে জড়িত থাকলেও আল-জিহাদের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে গণ্য করা হয়। আতেফ, বিন লাদেনের সাথে আত্মীয়ের সম্পর্কও স্থাপন করেছে। আতেফের এক মেয়ের সাথে ওসামার এক ছেলেকে বিয়ে দিয়েছিল তাও এই আফগানিস্তানেই।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ কাবুল রাত ১১টা। স্থান তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । মন্ত্রী মোল্লা ওয়াকিল মুতাওয়াক্কিল। বিদেশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ের তালেবান মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক জ্ঞান রাখে বলে মনে করা হয়। তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীও অন্যান্য মন্ত্রীদের মত ওমরের নির্দেশনাতেই মন্ত্রণালয় চালাত। এমনিতেই তার হাতেও কূটনৈতিক কর্মকান্ডও ছিল অত্যন্ত সীমিত কারণ তালেবান সরকারকে মাত্র তিনটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছিল। মন্ত্রী একবারই আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘে গিয়েছিল তালেবান সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখতে। সেই তার আমেরিকায় যাওয়া। প্রচণ্ড বড় শহর তবে তার কাছে ভাল লাগে নি। জেদ্দায় যেতে হয়েছে বহুবার আর ইসলামাবাদ তার বেশ পছন্দের জায়গা। যাই হোক মন্ত্রীর কাজটি অত্যন্ত সাদামাটা। টেবিলের

৯। রোজ আল ইউসেফ, ম্যাগাজিন, ইজিপশিয়ান গেজেট প্রকাশিত : অক্টোবর ১০, ১৯৯৩।

www.nagorikpathagar.org

সামনে দুটো চেয়ার রাখা, পাশে তিনটি টেলিফোন। মোতাওয়াক্কিল তালেবান সুরার দশজন উচ্চপর্যায়ের নেতাদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ নেতা। তবে অনেকেই ওয়াকিল মোতাওয়াক্কিলকে ততটা চরমপন্থী বলে মনে করেনা। মোতাওয়াক্কিল নিজেও তালেবানদের কঠোর ইসলামী অনুশাসনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারে নি। তবে সুরা এবং মোল্লা ওমরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করাও সে সঠিক মনে করে নি। মোতাওয়াক্কিল ভালভাবেই বুঝতে পারে যে, আফগানিস্তান এখন যে সংকটে পড়তে যাচ্ছে তাতে তালেবানদের ক্ষতিতো হবেই তদুপরি দেশেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। এ দেশে বিদেশী শক্তির পুনার্বিভাব হবারও আশংকা রয়েছে। রয়েছে আর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের।

অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এই মোতাওয়াক্কিল। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই সে আফগান রেডিওতে ছোট্ট একটা খবর শুনল অবশ্য আরও কিছু পরে নিউইয়র্ক আর পেন্টাগনের খবরগুলো ইসলামাবাদে তার পুরাতন সহযোগী বর্তমানে রাষ্ট্রদূত মোল্লা সালাম জাইফের কাছেই শুনল। আর এখন মাত্র কান্দাহারে 'আমীরুল মোমেনীন' এর কাছ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পেয়ে তার সেক্রেটারিকে এ দুর্ঘটনা বা সন্ত্রাসী হামলাকে ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য তৈরী করার কথা বলে পকেটে রক্ষিত ছোট্ট অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী বহুব্যান্ডের রেডিও শোনার চেষ্টায় ব্যস্ত। মোতাওয়াক্কিল বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে বেশ কিছু খবরাখবর রাখে। তার মতে এ এক অকল্পনীয় ঘটনা আর এটি সন্ত্রাসী হামলা বলে প্রমাণিত হলে প্যালেস্টাইন আর ইসরায়েল বিবাদের প্রেক্ষিতেই মধ্যপ্রাচ্যের কোন সংগঠন দ্বারা সম্ভব হতে পারে। তবে সে জানে এর প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হবে তাদের অত্যন্ত পছন্দের আরব আফগান মেহমানরা। এদেরকে মেহমান বলা বোধহয় ঠিক হবেনা। নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এদেশকে এসব আরবরা নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া এদের সবার প্রচণ্ড অবদান রয়েছে আফগানিস্তান থেকে কাফের সোভিয়েতদের তাড়ানোর ব্যাপারে। বিশেষ করে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থ আর বুদ্ধি দিয়ে আফগানিস্তানের বিগত পাঁচ বছর সরকার গঠনেও সাহায্য করেছে। এ তালেবান সরকার অন্ততঃ যুদ্ধবাজ নেতাদের আধিপত্য শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

মোতাওয়াক্কিলের পরিষ্কার মনে আছে আফ্রিকায় আমেরিকান দূতাবাসে

www.nagorikpathagar.org

হামলায় নেতৃত্ব দেবার সন্দেহ ওসামা বিন লাদেনের প্রাণনাসের জন্যে জালালাবাদের খোস্ত এলাকায় ১৯৯৮ সনের তালেবানদের সম্মতি ছাড়াই টমাহক ক্রুজ মিজাইল মেরেছিল তবে খুব বেশী ক্ষতি হয় নি। মোতাওয়াক্কিল পরে শুনতে পায় ঐ মিযাইলের বেশ কয়েকটা এখনও অবিস্ফারিত রয়ে গিয়েছিল। এরই সূত্র ধরে পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সম্পর্কে অনেক চ্ছেদ পড়েছিল। পৃথিবীর মানুষগুলো হয়ত বুঝতে পারেনা আফগানরা অত্যন্ত বন্ধু বৎসল মানুষ। একবার কাউকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিলে তার সাথে সহজে বেঈমানী করতে চায়না। তবে আফগান সমাজেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এসব পরিবর্তন আত্মঘাতী হানাহানি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধবাজ নেতা এবং এসব অর্থলোভী তাবেদারেদের জন্যে হয়েছে।

আফগানরা যুগে যুগে নিজেদের নিয়ে থাকতেই ভালবেসেছে। বহিঃবিশ্বের সাথে বিশেষ তেমন যোগাযোগের প্রয়োজনও মনে করে নি। আফগানরা একদিকে যেমন সহজসরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত তিমনি নিজেদের ইজ্জতবোধকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সামাজিকভাবে অনেক রীতিরেওয়াজ থাকলেও শতাব্দীর পুরাতন পশতুনওয়ালী নামে পরিচিত নীতির মধ্যই পরিচালিত হয় অধিকতর আফগানের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন। এ নীতির মধ্যে প্রধান দুটি উপাদান রয়েছে। এর একটি প্রতিশোধ (Vengence) অন্যটা আতিথিয়তা (Hospitality)। 'বদল' পশতু শব্দের মানে প্রতিশোধ। এটাই আফগানদের যুগেযুগে যোদ্ধা করে তোলে। অপমান বোধ আর অন্যায় আচরণ থেকে জন্ম নেয় আফগান প্রতিশোধের এবং প্রতিশোধ নেয়া আফগানদের জীবনের একটা অঙ্গ তা এ প্রতিশোধ নিতে যত সময়ই লাগুক। অনেক সময় বংশ পরম্পরায় অপেক্ষা করা হয় অপমান আর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার। আফগান কখনই তার প্রতি অন্যায় বা হত্যার বদলে অন্য গাল পেতে দেয়না বরং হত্যার বদলে হত্যা আর অপমানের বদলে অপমান এই নিয়মে চলে আসছে সমাজ। আরও একটি বিষয়ে আফগান পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত আপোষহীন তা হল নারীর সম্ভ্রম রক্ষায়। প্রতিটি আফগান পুরুষই মনে করে নারীর সম্ভ্রম না রাখতে পারা একজন পুরুষের পৌরুষত্বের অভাব।

আফগানদের প্রতিশোধ যেমন তীব্র অতিথিপরায়ণতা তেমনি সুখকর। একজন লোককে বিপদে আশ্রয় না দেয়ার কথা আফগান সমাজে অকল্পনীয়। শুধু তাই নয় আশ্রয়দানকারীর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয় তার আশ্রিতকে

www.nagorikpathagar.org

সকল প্রকার বিপদ থেকে মুক্ত রাখা। প্রয়োজনে আফগানরা অতিথির জন্যে জীবন দিতেও কার্পণ্য করেনা। কখনই আশ্রিতের সাথে বেঈমানী করেনা। এই হল একজন সাধারণ আফগানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সে যে গোত্রেরই হোক না কেন। বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক সভ্যতার আলোকে হয়ত এসব বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগীয় হতে পারে কিন্তু আজও আফগানরা ধরে রেখেছে তাদের স্বকীয় সত্ত্বা।

বিদেশ মন্ত্রী কিছুতেই বুঝতে পারেনা যে, মহিলাদের পর্দা আর ঘরের বাইরে শিক্ষা থেকে বিরত রাখাকে এত বড় ইস্যু করবার কি কারণ থাকতে পারে। আফগানিস্তানে শুধুমাত্র বড় শহরগুলো ছাড়া, যুগে যুগে এ ব্যবস্থাই চলে আসছে, এতে নতুনত্বের কিছু নেই। তা ছাড়া আফগানরা বহির্মুখী নয় কাজেই সমস্যাটা কোথায়? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাতো সৌদী আরব আর ইরানেও রয়েছে, কাজেই শুধু তাদের বেলাতে কেন এত সমালোচনা? আজ পর্যন্ত আফগানরা কোন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে জড়ায় নি; বরং যুগে যুগে বহিঃশক্তিই আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্ররোচিত করেছে আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হতে। বহিঃশক্তির স্বার্থেই যুদ্ধবাজ নেতাদের শক্তিশালী করা হতো এবং আজও হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের আমেরিকার ঘটনায় নিন্দাবাদ জানাবার জন্যে কাবুল রেডিও আর তিনটি দেশে তার রাষ্ট্রদূতদের এবং এখানে কাবুলে কনসোলেটগুলোকে জানাবার জন্যে মন্ত্রী বক্তব্যে দস্তখত করে পররাষ্ট্র সচিবের হাতে দিল। সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হল 'আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এ সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করে এবং নিরীহ জনসাধারণের হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ঘৃণা করে। আফগানিস্তান কখনই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে নি।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভাল করেই জানে যে, এবারও ঐ এক ইস্যু হবে, ওসামা, যাকে মুখ্য সন্ত্রাসী বলে পশ্চিমা দেশ দাবী করছে, তাকে হস্তান্তর করতে অসম্মতির কারণে জাতিসংঘ তাদের উপরে কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। তাতেও তালেবানদের কোন অভিযোগ ছিলনা। বেশকিছু দূরে বেশকিছু আর্টিলারি গানের ফায়ারের শব্দ শোনা গেল। মন্ত্রী বুঝতে পারে আজ এবং এর পর থেকে তাদের বিরোধী তাজিক আর উজবেকদের সমন্বয়ে নর্দান এলায়েন্স

www.nagorikpathagar.org

বলে পরিচিত দেশদ্রোহীর দল যারা গত পাঁচ বছর কাবুল দখলের পাঁয়তারা করছে তাদের তৎপরতা বহুগুণে বেড়ে যাবে। এ ঘটনার পর তারা অতি উৎসাহিত হবে। এসব যুদ্ধবাজ নেতা এক সময় যারা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এখন তাদেরই ছত্রছায়ায় রয়েছে। মাত্র গত পরশুই বোরহানউদ্দীন রাব্বানীর সমর নায়ক 'পাঞ্জশীর এর সিংহ' নামে পরিচিত জেনারেল আহ্মেদ শাহ্ মাসুদকে কে বা কারা হত্যা করেছে। মাসুদকে তালেবানদের অনেকেই শ্রদ্ধা করত কিন্তু সে একজন তাজিক হয়ে পশতুনদের শ্রদ্ধা রাখতে পারে নি। ১৯৯২ সনের পর থেকে মাসুদ আর নজিবুল্লাহ্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উজবেক জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুর রশিদ দোস্তাম মিলে হিকমতইয়ারের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে সমগ্র দেশকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। এ গৃহযুদ্ধ সমগ্র আফগানিস্তানকে কবরস্থান বানিয়ে দিয়েছে। আজ সেই সোভিয়েতদের খয়ের খা আব্দুর রশিদ দোস্তাম কাবুল দখলের প্রচেষ্টায় রয়েছে। 'কাফের', মোতাওয়াক্কিলের মুখে অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো।

আহ্মেদ শাহ্ মাসুদের হত্যার কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন শুনেছিল বিন্দুমাত্র দুঃখ পায় নি। এর কারণ মোতাওয়াক্কিল ভালভাবেই জানে এবং যখন ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ওয়াশিংটনে করা হয় এবং তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে এক বৈঠক করা হয়, তখনই যে কয়েকজন তালেবান নেতা এ খবর জানতে পারে মোতাওয়াক্কিল তাদের একজন। শুধু তাই নয়, গত মে ২০০১ সনে মাসুদ দিল্লী সফরকালে ভারতের ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগ করে তাও তাদের গোচরে রয়েছে।

আহ্মেদ শাহ্ মাসুদ ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত ধরবার জন্য আমেরিকার এক প্ল্যান মোতাবেক কাজ করতে রাজী ছিল এমন কথা তালেবান নেতৃবৃন্দ এমনকি ওসামা বিন লাদেন নিজেও জানতে পারে। এ প্ল্যান করা হয় ১৯৯৮ সনের শেষের দিকে। এতে আহ্মেদ শাহ্ মাসুদকে সি আই এ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। জানা যায় প্রচুর অর্থ আর অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পর মাসুদ রাজী হয়েছিল। কিন্তু এ প্ল্যান মাসুদ আদৌ কার্যকর করতে পারত কিনা সে ব্যাপারে সি আই এ এর কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয়না। ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে হলে মাসুদকে কান্দাহার পর্যন্ত দখল করতে হতো আর না হয় অন্ততঃ তারই দলের মধ্য

www.nagorikpathagar.org

থেকে গুপ্তঘাতকের ব্যবস্থা করতে হতো। এ কথা মাসুদ ভাল করেই জানত যে সেটা হবার নয়। সত্য কথা বলতে কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে নর্দার্ন এলায়েন্সকে দিয়ে কাবুল দখলের অনেক গোপন প্রচেষ্টা আমেরিকা বা পশ্চিমা দেশ করেছে। আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়দার সদর দপ্তর। এতে বোঝা গিয়েছিল যে, বিগত ১০ বছরে সি আই এ আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কোন খবরই রাখতে পারে নি। আর সে কারণেই ১৯৯৭ সনের পর থেকে সি আই এ প্রাক্তন পশতুন মুজাহিদ কমাণ্ডারদের সহায়তায় দক্ষিণ আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী অভ্যুত্থানের পাঁয়তারা করছিল। এসব কারণেই সি আই এ নতুন করে আফগান বিষয়ে উৎসুক হয়ে পড়ে। ২০০১ সনে তালেবানদের বিরোধিতায় আমেরিকা আরও তৎপর হয়ে উঠে, কারণ ট্রান্স-আফগান পাইপ লাইন (এ বিষয়ে পরে আলোচনা থাকবে)। ঐ সময়ে সি আই এ প্রাক্তন মুজাহিদ কমাণ্ডার এবং মৌলভী ইউনুস খালিসের সহযোগী আব্দুল হকের সাথে যোগাযোগ করে পশতুন গোষ্ঠীর মধ্যে তালেবান বিরোধীদের একত্র করে তাকে সময় মত অভ্যুত্থানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ। এসব তালেবান বিরোধীরা কোন ক্ষমতা দখলের জন্যে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সি আই এ পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের সমর্থনে উত্তর থেকে উত্তর জোট সরাসরি হামলার জন্যে রাশিয়া, ভারত, ইরান আর সে সাথে যুক্তরাষ্ট্রও সহায়তা দিতে প্রস্তুত হয়েছিল এবং বিগত মধ্য জুলাইতে এ প্ল্যান কার্যকর করবার কথা চলছিল আর সে কারণেই আহমেদ শাহ্ মাসুদের দিল্লী সফর। একথা ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব নিয়াজ নায়েক জানায়। ঐ সাক্ষাৎকারে নিয়াজ নায়েক আরও জানায় যে, ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর না করলে সামরিক অভিযান চালিয়ে ওসামা এবং মোল্লা ওমরকে গ্রেফতার অথবা হত্যা করবার এক ব্যাপক পরিকল্পনাও করা হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ২২, ২০০১ গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক প্রবন্ধে উপরে উল্লেখিত বিষয়টি পরিষ্কার করে এবং এ পরিকল্পনাকে সমর্থন করে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকা মতে ২০০১ সনের মাঝামাঝি জার্মানির বন শহরে চারদিনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিং এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল আমেরিকান, রাশিয়ান, ইরান এবং পাকিস্তানের কর্মকর্তাগণ। এতে যোগ দেয় তিন জন পাকিস্তানী জেনারেল সহ সাবেক পররাষ্ট্র সচিব নিয়াজ

www.nagorikpathagar.org

নায়েক, জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত সাইদ রাজাই খোরাসানি, নর্দান এলায়েন্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ, রাশিয়ার প্রাক্তন আফগান দূত নিকোলাই কোজিরেভ ও কয়েকজন রাশিয়ান কর্মকর্তা। এ বৈঠকে আরও যোগ দেয় তিন জন আমেরিকান কর্মকর্তা। এদের মধ্যে ছিল পাকিস্তানে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত টম সাইমনস, ক্লিনটনের সময়ের দক্ষিণ এশীয় বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি কার্ল ইন্দারফাদ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টে ১৯৯৭ পর্যন্ত নিয়োজিত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান আর বাংলাদেশ অফিসের কর্মকর্তা লি কোলডারেন। এ বৈঠক ডেকেছিল জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক ডেপুটি চীফ ফ্রানসেস ভেনড্রেল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আফগান সংকটের সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়াদি কিন্তু কাবুলে তালেবান সরকারের সদস্য এ বৈঠকে যোগদান করতে অপারগ বলে জানায়। আমেরিকান প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের উপরেও তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কথা জানিয়ে সামরিক অভিযানের জোড়ালো সুপারিশ রাখে। যদিও এ রিপোর্টের পরে আমেরিকার তিনজন কর্মকর্তা সামরিক অভিযানের সুপারিশের কথা অস্বীকার করে তবে কোলডারেন 'গার্ডিয়ান' কে জানায় ' ঐ বৈঠকে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে, তালেবানদের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকা এতই বীতশ্রদ্ধ যে, সামরিক অভিযানের বিষয়টি একমাত্র বিকল্প পন্থা বলে বিবেচ্য হতে পারে।'

নিয়াজ নায়েক একজন আমেরিকান কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, 'এবার লাদেনের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে আমেরিকা বদ্ধপরিকর এবং এ অভিযানের জন্যে সকল প্রকার তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে প্রকাশ্যে বিমান হামলা, হেলিকপ্টার গানশিপের ব্যবহার করতে হলে তাও করবে।' কিন্ত এসবের কিছুই করতে হয় নি। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের সন্ত্রাসী হামলা সে সুযোগ এনে দিয়েছে।[১০] এসব খবর পূর্বেই তালেবান সরকার জানতে পেরেছে। স্বভাবতঃই তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও জানবার কথা।

মোতাওয়াক্কিল অফিস ছেড়ে অদূরেই তার বাসস্থানে হেঁটে যেতে যেতে ধ্বংসপ্রাপ্ত একদার এ ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক কাবুল শহরের টিমটিমানো

১০। দি গার্ডিয়ান ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০০১ এর উদ্ধৃতি দিয়েছে মিঃ প্যাটরিক মার্টিন ঃ নভেম্বর ২০, ২০০১ ঃ ওয়ার্ল্ড সোসালিস্ট ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে।

www.nagorikpathagar.org

বাতিগুলোর দিকে তাকাতেই তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। সে নিজেও এক মুজাহিদ কিন্তু কাবুল পর্যন্ত তার তখন আসা হয় নি। আফগানিস্তানের শহরগুলো সোভিয়েতদের পশ্চাদাপসারণ পর্যন্ত ভালই ছিল কিন্তু তিন বছরের গৃহযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কাবুল মধ্য আর দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগকারী ভৌগলিক ও সামরিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ আফগানিস্তানের রাজধানী। এ শহরের ইতিকথা ইতিহাসের পরতে পরতে লেখা বিশেষ করে এতদঅঞ্চলের বড় বড় সামরিক অভিযান আর দক্ষিণে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে অতীতে তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্য আর মাত্র একদশক আগে দুটি পরাশক্তির মধ্যে শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল আর ভবিষ্যতেও হবে। কাবুলের রাস্তা ধরেই এগিয়ে গিয়েছিল দারাইয়ুস-১; আলেকজান্ডার, সেলুকাস, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ্গ আর নাদের শাহ্। এ শহর আর রাস্তা ধরেই বাবরে লস্কর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করে আর এখানেই বাবর চিরনিদ্রায় শায়িত। তার পূর্বে গজনী, মামলুক, তুগলক সকলকেই কাবুলের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

আফগানিস্তান তার ভৌগলিক অবস্থানের জন্যেই বিশ্বের ইতিহাসে আর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী আলোচিত একথা মোতাওয়াক্কিলের মত মানুষ ছাড়াও এ অঞ্চলের কমবেশী সামান্য শিক্ষিত লোকও জানে। আফগানদের বীরগাঁথা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত।

দক্ষিণ-মধ্যএশিয়ার দেশ আফগানিস্তান স্থলবেষ্টিত যার আয়তন ২৫১,৮২৫ বর্গমাইল (৬৫২,২২৫ বর্গ কিলোমিটার)। সবচেয়ে নিকটের সমুদ্র কিনারা ৩০০ মাইল দূরে আরব সাগর। হিন্দুকুশ আর পামির পাহাড়রাজির মধ্যে এ দেশের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫১০ মাইল অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে ইরানের সাথে। আর উত্তরে প্রাক্তন সোভিয়েত এবং বর্তমানে একপ্রকার স্বাধীন মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তান মিলিয়ে রয়েছে ১,০৫০ মাইল সীমান্ত। সবচেয়ে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে চীনের সিনকিয়াং প্রদেশের মুসলিম অধ্যুষিত উইগুড় স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল। এ বর্ডারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণও বটে। আর সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্ব দিক জুড়ে পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ-উত্তর সীমান্ত প্রদেশ আর দক্ষিণ-পূর্বে বেলুচিস্তানের সাথে প্রায় ১,১২৫ মাইল। কাবুল দেশের বৃহত্তম শহর

www.nagorikpathagar.org

এবং রাজধানী যার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৫,৯০০ ফুট। এ শহরটি আফগানিস্তানের প্রতিটি বড় শহর দক্ষিণের কান্দাহার, উত্তরে জালালাবাদ, মাজার-ই-শরিফ এবং পূর্বে হেরাতের সাথে সড়ক ও বিমান পথে সংযুক্ত। আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের যোগাযোগ সবচেয়ে উত্তম এবং কাবুলের সাথে সীমান্ত প্রদেশের শহর পেশোওয়ারের সাথে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক খাইবার গিরিপথ[৩] দ্বারা সংযুক্ত। দক্ষিণ পশ্চিমে কান্দাহর থেকে বেলুচিস্তানের চমন হয়ে কোয়েটার সাথে অত্যন্ত ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। আফগানিস্তানের বিখ্যাত নাব্য নদীগুলোর মধ্য কাবুল আর আমুদরিয়া নদী (অকসাস) বিখ্যাত। আবহাওয়া গ্রীষ্মে শুষ্ক আর শীতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোতাওয়াক্কিল তার অত্যন্ত সাধাসিধে ধরনের বাসাটিতে এসে সামনে রক্ষিত আফগানিস্তানের মানচিত্রের দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে ভাবতে থাকল ভৌগলিক অবস্থানের কারণে যুগে যুগে আফগানিস্তান নিয়ে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বড় বড় শক্তিগুলোর মধ্যে দাবাখেলা চলেছে এবং চলবে। আর এর ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার হবে আফগান জনগণ। আর তাই বোধ হয় যুদ্ধই আফগানদের একমাত্র সখে পরিণত হয়েছে।

আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা বুঝতে হলে একটু পেছনে তাকাতেই হবে। আফগানিস্তানের বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ২৫ মিলিয়ন তবে এ জনসংখ্যা বিভিন্ন উপজাতীদের নিয়ে গঠিত। এর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পশতুন। যদিও পশতুনদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী রয়েছে তবে এদের মধ্য দুররানী পশতুনরা শাসক শ্রেণীর বলে ইতিহাসে পরিচিত। শতকরা ১৫ ভাগ তাজিক যাদের বাস উত্তরের দিকে সালাং গিরিপথ এবং পাঞ্জশীর উপত্যকায়। শতকরা ১০ ভাগ উজবেক, এদের বেশীরভাগ উত্তর পশ্চিমে উজবেকিস্তানের সন্নিকটে বাস। প্রায় শতকরা ৭ ভাগ তুর্কমান এবং বাকীরা হাজারা, নুরীস্থানী ও অন্যান্য। হিন্দুকুশ পাহাড় উত্তর এবং দক্ষিণকে পৃথক করেছে। উত্তরে এক পাশে রয়েছে পামিরের উচ্চভূমি। উত্তরে কাবুল এবং এর আশেপাশে পশতুন দুররানীদের

৩। পাকিস্তানের পেশাওয়ারের জমরোদ নামক জায়গা হতে আফগানিস্তানের প্রাচীন দুর্গ-হাফট চাহ সংযোগকারী ৫৩ কিঃ মিঃ লম্বা এ গিরিপথ যার গড় উচ্চতা ৬০০-১০০০ ফুট। এ পথ খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত বছর থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথিবী বিখ্যাত এ গিরি পথে ১৯২৫ সনে বৃটিশ সরকার তৎকালীন লান্ডি কোটাল পর্যন্ত মিটারগেজ রেল লাইন স্থাপনা করে যা আজও বহাল রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যা যেমন বেশী তেমনি কান্দাহারের দিকে অন্যান্য পশতুন আর বেলুচীদের বাস। লক্ষ্য রাখার বিষয় যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পশতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদেরকেই কাবুলে শাসন করতে দেখা যায়। তালেবানদের প্রায় ৯৫% পশতুন।

ধর্মের দিক থেকে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ওয়াহাবী মুসলমান আর প্রায় ৯ ভাগ শিয়া মুসলমান যাদের বাস ইরানের সন্নিকটে আর বাকী কিছু হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায় রয়েছে। পাকিস্তান আফগান সীমান্ত দ্বিতীয় বৃটিশ-আফগান যুদ্ধের পর (১৮৭৮-৮০) ক্ষমতাশীন আমানউল্লাহ্‌র সাথে এ চুক্তির ফলে 'ডুরান্ড লাইনের' মাধ্যমে তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত টানা হয়। পরে ভারত বিভক্ত হলে পাকিস্তান আফগানিস্তানের এ সীমান্ত পূর্বের অবস্থাতেই থাকে। 'ডুরান্ড লাইন' প্রতিস্থাপনের ফলে একই ধর্মাবলম্বী এবং পশতুন ভাষাভাষী জনগণ দুদেশে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ বিষয়টি অতীতে এবং বর্তমানেও পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের চাবিকাঠিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আব্দুল গফফার খান পাকিস্তানের জন্মলগ্নের পর থেকেই পশতুন এলাকা নিয়ে স্বাধীন পখতুনিস্তানের আজীবন দাবী করে আসছিল এবং এ ব্যাপারে ১৯৭৯ সন পর্যন্ত কাবুলের সরকার যেমন সমর্থন করে আসছিল তেমনি অন্যদিকে পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন বলে পরিচিত প্রতিবেশী ভারত এ দাবীকে সর্বতোভাবে দেশ বিভাগের পর থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে আফগানিস্তানের বিষয়ে এ একটি জায়গাতেই বিরোধ পুনঃজাগরিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেদিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত তিন হাজার পাঁচশত বছরের ইতিহাস নিয়ে কাবুলের মধ্যরাতে তালেবান মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দারুল আমানের সন্নিকটে তার বাসভবনের বৈঠকখানায় বসে ভাবছিল। ভাবছিল কাবুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। হঠাৎ কর্কশ স্বরে পাশে রাখা ফোনটি বেজে উঠলে মন্ত্রী সম্বিত ফিরে পেয়ে রিসিভার কানের কাছে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে ইসলামাবাদে আফগান রাষ্ট্রদূত সালাম জাইফ তার মন্ত্রীকে জানালো আমেরিকা আভাসে ইঙ্গিতে ওসামা বিন লাদেন আর আল-কায়দাকে দায়ী করছে। প্রকৃত অবস্থা সরকারীভাবে স্থানীয় সময় আগামী কাল সেপ্টেম্বর ১২, ২০০১ মধ্যরাতে হয়তবা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে বলে রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীকে জানালো। সাথে আফগানিস্তানের বক্তব্য এক প্রেস

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে বলে জ্ঞাত করলো। রাত দুপুর গড়িয়ে তবুও ঘুম নেই চোখে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভাবতে বসল যে, তার নিরলস প্রচেষ্টার পরেও পৃথিবীর দেশগুলোকে আফগানিস্তানের প্রকৃত অবস্থা বোঝানো গেলনা। বিশেষ করে আমেরিকার সাথে মোল্লা ওমরের ট্রান্স আফগান পাই পলাইন বিবাদের পর থেকে। জাতিসংঘ দেশটিকে একঘরে করে কতখানি পেছনে ফেলেছে। আজকে এ পরিস্থিতির জন্যে পশ্চিমা বিশ্বই দায়ী। পশ্চিমা বিশ্বের দেশ বিশেষ করে আমেরিকা সোভিয়েতদের আফগানিস্তান ছাড়ার পরপরই এ অঞ্চলে তাদের আগ্রহ্ হারিয়ে আফগান জনগণকে প্রতিবেশী দেশগুলোর উপরেই ছেড়ে যায়। আফগানরা বৃহত্তর একতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। বিভিন্ন গোত্রের একতা রাখতে পরবর্তীতে কেউই সাহায্য করে নি-পাকিস্তান তো নয়ই। তালেবানরা বুঝতে পারেনা বিশ্ব যেখানে সৌদী আরবের মত গোঁড়া ইসলামপন্থী সরকার এবং দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে সেখানে তালেবানদের স্বীকার করতে তাদের বাধা কেন? প্রায় ছয় বছরের উপরে তারা দেশ শাসন করছে তবুও বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পায় নি। তালেবানদের একঘরে করার ফলেই তাদের সাহায্যদাতা হিসেবে আরব ধনকুবেরদের সাহায্যে চলছে এ গরীব দেশ। বেড়েছে মাদকদ্রব্যের চাষ আর বিশ্বব্যাপী মাদকের ব্যাপক চোরাচালনী। এ অবস্থার জন্যে সাধারণ আফগান এমনকি বর্তমান তালেবান নেতৃত্বও দায়ী নয়।

আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিগত ২৭ বছরে হানাহানি তালেবানদের উত্থান আর আল-কায়দার আফগানিস্তানে ঘাঁটি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হলে আমাদের গত শতাব্দীর (১৯০০) দিকে ফিরে যেতে হবে।

আফগানিস্তানের শেষ সম্রাট মোহাম্মদ জহির শাহ (বর্তমানে ৮৩ বছরের প্রাক্তন বাদশাহ ১৯৭৩ সন থেকে ইতালীতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছে।) তার বাবা নভেম্বর ৮, ১৯৩৩ সনে আঁততায়ীর হাতে নিহত হলে ঊনিশ বছর বয়সে আফগানিস্তানের সিংহাসনে আসীন হলেও ১৯৫৩ সনের আগে অপরিণত বয়সের কারণে শাসনভার গ্রহণ করে নি। বিগত এই বিশ বছর তার হয়ে তার চাচারা রাজত্বের দেখাশোনা করে। এর মধ্যেই ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হলেও ডুরান্ড লাইন অপরিবর্তিত থাকে যা আফগানিস্তানের তৎকালীন শাসকগণ সময়ে সময়ে মানতে অস্বীকার করে।[৫] এরই মধ্যে কাবুলের সরকার

[৫] ডুরান্ড লাইনঃ ১৮৯৩ সনে বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশকে চিহ্নিত করবার জন্য স্যার মরাটমার ডুরান্ড এ নতুন সীমান্ত নির্ধারণ করে আর তার নামেই এর নামকরণ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

খান আব্দুল গাফফার খানের 'রেডসার্ট' মুভমেন্টের পখতুনিস্থান দাবীকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছিল। খান আব্দুল গাফফার খান দেশ বিভক্তির পূর্ব থেকেই বেলুচিস্তান আর সীমান্তের পশতুন এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী করে আসছিল। এ দাবী একদিকে কাবুল অন্যদিকে দিল্লী সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল নিজস্ব স্বার্থের কারণেই।

জহির শাহের চাচাদের তদারকে প্রথম বিশবছর অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপের কারণে কাবুল কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ে নি। এ দু'দশকে আফগানিস্তানের আর্থিক এবং অবকাঠামোগত উন্নতি বহিঃবিশ্বের সাহায্য ছাড়াই আভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহারেই হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং গোটা বিশ্ব দু'মেরুতে বিভাজিত হলেও আফগানিস্তান মোটামুটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। উল্লেখযোগ্য 'পশতুন' বা পখতুনিস্থান সমস্যা ১৯৪৭ সনের পরেই শুরু হয়।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ মোহাম্মদের রাজনৈতিক উদারতার আওতায় মোটামুটি নিরপেক্ষ নির্বাচন ও ফ্রি প্রেস এর প্রচলন হয়। এর মধ্য ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আফগানিস্তানে তথাকথিত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ উদারতার কারণ ছিল বিভিন্ন গোত্রকে এক সাথে করা এবং তাদেরকে কাবুলে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া যদিও এর দ্বারা সমস্ত যুদ্ধবাজ নেতাদের একত্র করা যায় নি এবং তা অতীতেও আফগানিস্তানে সম্ভব হয় নি। এতসব রাজনৈতিক সংস্কারের পরেও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত যুদ্ধবাজ নেতাদের তাদের নিজস্ব মুক্ত চিন্তাধারায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় রত ছিল অনবরত। ১৯৫৩ সনে তৎকালীন সরকারের রক্ষণশীল অংশ এবং ধর্মীয় নেতাদের মদদপুষ্ট হয়ে বাদশাহ জহির শাহ এর চাচাতো ভাই তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ লেফটেনেন্ট জেনারেল দাউদ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হলে ক্রমেই বাদশাহকে নামেমাত্র শাসকে পরিণত করে দেশ পরিচালনার অর্ধেক ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

প্রধানমন্ত্রী দাউদ (১৯৫৩-৬০) প্রথমবারের মত গাফফার খানের স্বাধীন পখতুনিস্তান দাবীর সমর্থন করলে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ঐদিকে পাকিস্তান ক্রমেই পশ্চিমা ঘেঁষা হয়ে উঠলে প্রধানমন্ত্রী দাউদ আফগানিস্তানের তথাকথিত নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বাদ দিয়ে উত্তরে

www.nagorikpathagar.org

সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদিও আফগানিস্তান শীতল যুদ্ধে কোন বিশেষ দিকের সমর্থন না করলেও সোভিয়েতরাই আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে শুরু করে সামরিক সাহায্যও দিতে এগিয়ে আসে। এ সময় থেকে আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা রাশিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে যেতে শুরু করে। দাউদের সময় আফগানিস্তানে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার হতে থাকে এবং সরকারীভাবে মহিলাদের বাধ্যতামূলক পর্দাপ্রথা বাতিল করা হয়। এত কিছুর পরেও দাউদ রাজনৈতিক বিরোধকে সহ্য করে নি বরং সরকার বিরোধীদের তথাকথিত বিচারে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক পখতুনিস্তান নিয়ে চরম অবনতির পথে গেলে ১৯৬১ সনে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সাথে সমগ্র সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। সে সাথে বন্ধ করে দেয় সমস্ত বৈধ ব্যবসার পথ। এ অবস্থায় প্রায় দু বছর সীমান্ত বন্ধ থাকলে আফগানিস্তান দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে। এ দিকে ১৯৬২ সনে পাকিস্তানস্থিত আমেরিকান চালকবিহীন ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েতরা গুলী করে ভূপাতিত করবার পর সোভিয়েতরা পাক-আফগান সংকটকে কাজে লাগাবার অভিপ্রায়ে আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়েই সালাং গিরিপথ হয়ে উত্তরের সাথে কাবুলের যোগাযোগ বাড়াবার জন্যে প্রধান সড়কের উপরে আমুদরিয়ার উপরে সালাং সুরঙ্গ এবং বেশ কয়েকটি পুল তৈরী করে। এসব উন্নতির ফলেই সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্য এশিয়া অঞ্চলগুলোর সাথে আফগানিস্তানের নৈকট্য বাড়তে থাকে। একদিকে অর্থনৈতিক চাপ অন্যদিকে বাদশাহের অসন্তুষ্টি সব মিলিয়ে বাদশাহ জহির শাহ প্রধানমন্ত্রী দাউদকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। অনেকে অবশ্য মনে করে দাউদ তার আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে জহির শাহের ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টায় রত ছিল বলেই জহির শাহ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করায়।

দাউদের অভিজ্ঞতার আলোকে জহির শাহ আফগানিস্তানের শাসনতন্ত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনে। প্রথমতঃ ২১৬ সিটের জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচন এবং আফগানিস্তানের প্রধান উপজাতীয় সদস্যদের জন্যে ৮৪ সদস্য বিশিষ্ট আপার হাউজ গঠন করে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করে। আপার হাউস অথবা হাউস অব এলডারস্ এ ৮৪টি সদস্য পদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ

www.nagorikpathagar.org

সরাসরি নির্বাচনে আর একতৃতীয়াংশে বাদশাহ দ্বারা মনোনয়ন এবং বাকী এক তৃতীয়াংশে প্রাদেশিক সংসদ সদস্যের মাধ্যমে নির্বাচিত করার প্রবিধান রাখা হয়। এরই সাথে রাজকীয় পরিবারের যে কোন সদস্যকে সরাসরি সরকারের কোন রাজনৈতিক পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে। ১৯৬৪ সনে জাতীয় সংসদ এ শাসনতন্ত্রকে পাশ করলে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ সনে দু'দুবার নির্বাচন হয় কিন্তু এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র থেকে শুরু করে একদিকে সোভিয়েত ঘেঁষা রাজনৈতিক দল আর অন্যদিকে ইসলামী পার্টি এবং কট্টরপন্থীদের অভ্যুদয়ের এবং কেন্দলের কারণে কোন দলই স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে সক্ষম হয় নি; বরং আফগানিস্তানে সনাতনপন্থী যুদ্ধবাজ নেতাদের দাপট ক্রমেই বেড়ে চলে। সমগ্র আফগানিস্তান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যায়। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ হতে ডিসেম্বর ১৯৭২ সন পর্যন্ত পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী কাবুলে আসীন হয়েছিল। অন্যদিকে আফগান সেনাবাহিনীতে মস্কো ফেরত জুনিয়র অফিসারগণ সরাসরি এ রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে পড়তে থাকে। সে সাথে যোগ দেয় মস্কোপন্থী কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো। অন্যদিকে মস্কোপন্থীদের প্রতিহত করতে সংঘবদ্ধ হয় ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রসংগঠনগুলো।

এসব রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ক্রমেই আফগানিস্তানের দুটি মস্কোপন্থী সোসালিস্ট পার্টি; 'পরচম' আর 'খালক' নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্যে পি ডি পি এ (PDPA : পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি ফর আফগানিস্তান) নামে জোট গঠন করে। 'খালক' পার্টিতে নূর মোহাম্মদ তারাকি আর পরচমে বারবাক কারমাল নিজেদের অবস্থান সুসংগঠিত করে উত্তরোত্তর আফগান সেনাবাহিনীতে সমমনা অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বারবাক কারমালের পরচমের প্রথম এজেন্ডা ছিল আফগানিস্তান থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ অন্যদিকে নূর মোহাম্মদ তারাকির লক্ষ্য ছিল সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সংসদের বাইরে থেকে ক্ষমতা দখল। শুরু হয় কাবুলের রাস্তার্য় ছাত্রদের আন্দোলন। এসব ছাত্র আন্দোলনের পুরোধায় ছিল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো।

কাবুলের রাস্তায় ছাত্র আন্দোলন শুধু মস্কোপন্থীদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। মস্কোপন্থীদের বিরুদ্ধাচারণে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলোও একাধারে সোসালিস্ট এবং রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নামে।

www.nagorikpathagar.org

এসব ইসলামপন্থীদের আন্দোলন কাবুলের বাইরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ধারায় পরিচালিত মাদ্রাসার ছাত্ররাও যোগ দেয়। প্রায় সমগ্র ইসলামিক ছাত্র আন্দোলনের পুরোধায় ছিল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন ফ্যাকালটির ডীন প্রফেসর বোরহান উদ্দিন রাব্বানী, যার নাম বহু বছর পর্যন্ত চর্চিত হবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। সে সময় যে সমস্ত ইসলামপন্থী ছাত্রনেতারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা আগামী দিনগুলোতে আফগানিস্তানের বিভিন্ন পরিস্থিতির সংগ্রামের সাথে জড়িত হয়ে থাকবে। এদের মধ্যে ছিল গুলবদিন হিকমতইয়ার, দীন মোহাম্মদ, আহমেদ শাহ মাসুদ, কাজী আমীন এবং আরও অনেকে।[১১]

এদিকে যখন পরচম নেতা বারবাক কারমাল একদিকে ইসলামী ছাত্র সংঘগুলোকে উপেক্ষা করে রাজপথে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তখনই অন্যদিকে 'খালক' নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকি সেনাবাহিনীতে সোভিয়েত কেজবি (KGB) দ্বারা চিহ্নিত সোভিয়েতপন্থী অফিসারদের রাজতন্ত্র উৎখাতের ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করছিল।

কাবুলের এহেন পরিস্থিতি আর অশান্ত পরিবেশ আফগানিস্তানের অন্যান্য শহরগুলোকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করছিল। সমগ্র দেশ জুড়ে মস্কোপন্থী আর ইসলামপন্থীদের মধ্য সংঘাত ক্রমেই রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে একসময়ের বরখাস্তকৃত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ দাউদ ১৯৭৩ সনে বাদশাহ জহির শাহের অবর্তমানে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে জহির শাহকে উৎখাত করে। দাউদ আফগানিস্তানে রাষ্ট্রপতি ধাচের ব্যবস্থা চালু করে নিজে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে। অশান্ত আফগানিস্তানে দাউদ নিজের পক্ষে মাওপন্থী বাম দল 'শোলা-ই-জায়িদ' নামক কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন জোটায়।[১২]

যখন প্রাক্তন জেনারেল, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং জহির শাহের নিকটতম আত্নীয় দাউদ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে সে সময়ে জহির শাহ কয়েক হাজার মাইল পশ্চিমে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে রানীমাতার সাথে রাতের খাবারে যোগ দিচ্ছিল। । দিনটি ছিল জুলাই ১৭, ১৯৭৩ সন। তারপর থেকে প্রায় ২৮ বছর হতে চলেছে জহির শাহ নির্বাসনে কাটাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে ভাবে তার মৃত্যুর আগে তার প্রিয় বাসভূমি আফগানিস্তানে আর তার পূর্বপুরুষদের শহর

১১। 'হোলী ওয়ার আনহোলী ভিক্টরী' : কার্ট লোহবেক পৃ :২৮।
১২। এ পার্টি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আতেলদের মধ্যই সীমাবদ্ধ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

কাবুল দেখতে পারবে কিনা। আজ প্রায় ৮৫ বছর বয়সে জহির শাহ্ তার ধ্বংস প্রায় দেশ আর কাবুলকে নতুন জীবনদানের চেষ্টায় রত রয়েছে। ভবিষ্যৎ তার জন্যে কি নির্ধারণ করে রেখেছে তা অনুমান করাও দুরুহ ব্যাপার।

দাউদের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আফগানিস্তানে তিনটি ভিন্ন বলয়ের জন্ম হয়। এগুলো হলো দাউদ সমর্থিত মাওপন্থী বাম দল 'শোলো-ই-জায়িদ,' ইসলাম পন্থী দলগুলো আর পিডিপিএ। যদিও দাউদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষিতে এ দলগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের অবসান তবুও এদের মধ্যেও ক্ষমতার লড়াইয়ের শেষ হয় নি। আফগানিস্তানের মস্কোপন্থীরা দাউদের ক্ষমতা দখলে অতি উৎসাহিত হয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অন্যদিকে ইসলামপন্থী দলগুলো ক্রমেই মারমুখী হয়ে গ্রামেগঞ্জে সোসালিস্ট কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইসলামপন্থীদের সাথে ক্রমেই আফগানিস্তানের অতিপরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদরাও যোগ দিতে থাকে। এদের মধ্যে আব্দুল রসুল সাইয়াফ, শিবগাতউল্লাহ মুজাদ্দেদী, মৌলভী ইউনুস খালিস প্রমুখের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

সবচেয়ে মারমুখী ইসলামি সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল হিকমতইয়ার। ঐ বছরের শেষের দিকেই শোলা-ই-জায়িদের সাথে হিকমতইয়ারেব সশস্ত্র হামলায় একজন নেতৃস্থানীয় মাওপন্থী মারা গেলে হত্যার অপরাধে হিকমতইয়ারকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করলে বেশ কিছু সময়ের জন্যে কাবুলে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের কাজ ঝিমিয়ে পড়ে। তবুও নেতৃত্বহীনতার মধ্য দিয়েও কাবুলের বাইরের শহরগুলোতে ক্রমেই ধর্মীয় সংগঠনগুলো সরাসরি দাউদের বিরুদ্ধে চলে যায়। এর কয়েক মাস পর হিকমতইয়ারকে জেল থেকে মুক্ত করলে ইসলামী আন্দোলন আবার গতি পেতে শুরু করে। এবার আফগান সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা হলে রাশিয়ার কেজিবি (KGB) এ ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়। এ বিফল অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের দায়ে দাউদ সমস্ত কাবুল এবং আশেপাশের ইসলাম পন্থীদের গ্রেফতার করার ঘোষণা দিলে বেশীর ভাগ সদস্যই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মগোপন করে এবং অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণ করে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদের মধ্যে পাকিস্তানে প্রথম পৌঁছে গুলবদিন হিকমতইয়ার এবং পরে আহমেদ শাহ মাসুদ। পাকিস্তানে তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় এবং পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.org

তখনও ১৯৭১ সনের যুদ্ধের বিধ্বস্ত অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করছিল। আর ভুট্টোর প্রয়োজন ছিল এমন একটি সমস্যা যা পাকিস্তানীদের সেদিকে আকৃষ্ট করবে। আফগানিস্তান সে সুযোগ এনে দেয়।

এদিকে দাউদ ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের সাথে তার পুরানো তিক্ততা বাড়াতে থাকে। গাফফার খান ও তদীয় পুত্র ওয়ালী খান পুরাতন 'রেডসার্ট' আন্দোলনকে সমর্থন দিতে থাকলে জুলফিকার আলী ভুট্টো আফগানিস্তানের মুসলিম সংগঠনগুলোকে হিকমতইয়ারের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে থাকে। ইসলামিক ইনসারজেন্সি শুরু হয় পাকতিয়া আর নানগাহার প্রদেশে তৎপরতার মধ্য দিয়ে।

১৯৭৪ সনে সারা বছর ধরেই একদিকে যেমন ইসলামিক প্রতিরোধ গড়ে উঠে অন্যদিকে মস্কোপন্থীরা ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যায়। মস্কোপন্থী পিডিপিএ ক্রমেই উত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকা মাজার-ই-শরীফ শহরে এবং তার উত্তরে পাঞ্জশীর উপত্যকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। ক্রমেই কাবুলসহ উত্তরে সোভিয়েতদের প্রভাব বাড়তে থাকে অন্যদিকে ইসলামী ইনসারজেন্সিকে সীমিত ভাবে পাকিস্তান ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের সৌদী আরবসহ কিছু দেশ সীমিত আকারের সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করে।

এহেন পরিস্থিতিতে সমগ্র আফগানিস্তান অশান্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৭-৭৮ এ সোভিয়েতদের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতায় কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় পিডিপিএ প্রকাশ্যে দাউদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে উস্কে দিতে থাকলে এপ্রিল ১৭, ১৯৭৮ সনে পরচম পন্থী এক সুপ্রসিদ্ধ মজদুর নেতা মার আকবর খাইবার এর রহস্যজনক হত্যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র শহরে আইন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে দাউদ সেনাবাহিনী দ্বারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলে রক্তপাতের সূত্রপাত হয়। পিডিপিএ এর নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার হুকুম দিলে হাফিজউল্লাহ আমিন আর নূর মোহাম্মদ তারাকিকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে নূর মোহাম্মদ তারাকিকে চোখ বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্যে কাবুলের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে এ আচরণের প্রতিবাদে শহরে আবার দাঙ্গা বাধে।

এর দশদিনের মাথায় দাউদ এবং তার সম্পূর্ণ পরিবার পিডিপিএ এর

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্বে অভ্যুত্থানে নৃসংশভাবে নিহত হয়। এ অভুত্থানের মুখ্য নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকি একাধারে রাষ্ট্রপতি আর খালকপন্থী নেতা প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হয়, আর বারবাক কারমাল প্রথম ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং হাফিজুল্লাহ আমিন দ্বিতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃতের মধ্য দিয়ে 'গ্রেট সত্তর রেভ্যুলিউশন' এর সত্রপাত হয়। এ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।[১৩]

এর পরপরেই পিডিপিএ এর বিতর্কিত ভূমি সংস্কার শুরু হলে এর অত্যাচারে হাজার হাজার আফগান নিধন হতে থাকে এবং প্রতিবাদী ইসলামী তৎপরতা বৃদ্ধি হতে থাকলে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয়। ভূমি সংস্কারের এবং রাষ্ট্র কর্তৃক জমি বাজেয়াপ্ত করণকে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা আখ্যায়িত করা হয়। হাজার হাজার গ্রামবাসী পিডিপিএ'র অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পার্শবর্তী পাকিস্তান আর ইরানে আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসে। এহেন পরিস্থিতিতেও আফগানিস্তান নামক রাষ্ট্রের অরাজকতা আর সোভিয়েত রাশিয়ার পরোক্ষ আক্রমণ বিশ্বের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রিয় দেশগুলোকে নাড়া দিতে পারে নি। আমেরিকায় তখন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসন আর রাশিয়ায় জাদরেল নেতা ব্রেজনেভ এর রাজত্ব। এই দুই পরাশক্তি তখন শীতল যুদ্ধের চরমে। একে অপরের আক্রমণের সম্ভাবনাকে প্রশমিত করার জন্য সল্ট-২ চুক্তি নিয়ে ভাবের আদান প্রদান চলছে। আর ইরানে আমেরিকার ঘনিষ্ট মিত্র শাহের বিরুদ্ধে ইসলামী অভ্যুত্থানের বীজ বপন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এপ্রিল ২৭, ১৯৭৮ সনে দাউদের উৎখাতের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তানের জন্ম হয় হয়তবা আরও ১৩ বছর বিরতিহীন রক্তপাত দেখার জন্যে। এদিকে দাউদের উৎখাতের প্রায় ১ বছর পূর্বেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উৎখাত করে ইসলামী কট্টরপন্থী বলে পরিচিত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করে।

জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলকে পশ্চিমা বিশ্ব সে সময়ে খুব ভালভাবে দেখে নি। বিশেষ করে আমেরিকা। আমেরিকায় তখন মানবাধিকার চ্যাম্পিয়ন

১৩। রেভ্যুলিউশন এন্ড রেবেলিয়নস ইন আফগানিস্তান ঃ এম নাজিফ শেহরানী এন্ড রবার্ট এল কেনফিডেল (১৯৮৪)।

www.nagorikpathagar.org

বলে খ্যাত জিমি কার্টার রাষ্ট্রপতি। কাজেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের সামরিক এবং আর্থিক সাহায্য বাতিল করা হয়। (পাঠকগণ নিশ্চয়ই ১৯৭৭ এর সাথে ২০০১ সনের সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন) এমন অবস্থায় জিয়াউল হক পাকিস্তানের পরীক্ষিত বন্ধু চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত আর ইরানের সাথে সুসম্পর্কের কারণে ঐ সব দেশ থেকে সাহায্য সহোযোগিতা পেতে থাকে। জিয়াউল হকের জন্যে আফগানিস্তানে উদ্ভূত পরিস্থিতি তার দেশের অভ্যন্তরে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহযোগী বলে এর সুযোগ গ্রহণে ব্রতী হয়। ততদিনে আফগান শরণার্থী পাকিস্তানে ভিড় জমাতে থাকে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শরণার্থী শিবির খুলে পশ্চিমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও তেমন একটা সুবিধে করতে পারে নি। অন্যদিকে আফগান ইসলামিক ইনসারজেন্ট নেতাদের অনেকেই পেশাওয়ার এবং বেলুচিস্তানে শরণার্থীদের মধ্য থেকেই ধর্মীয় যোদ্ধা তৈরী করতে ব্রতী হয়। এ সময় থেকেই জিয়াউল হক আর তৎকালীন আই এস আই প্রধান আরেক ইসলামপন্থী জেনারেল আখতার আব্দুর রাহমান খান আফগানিস্তানে সোসালিস্টদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে আফগানিস্তানে ক্রমেই সোভিয়েত পন্থীদের দাপট বাড়তে থাকলে চীনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বিশেষ করে চীনের সাথে আফগান বর্ডার সিনজিয়াং এর উইগুড় সীমান্ত বরাবর আফগান সেনাদের আগমনকে প্রতিহত করার চেষ্টার কারণে চীন বহু আগে থেকেই এই এলাকাতে সোভিয়েত রাশিয়ার গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য গোপন সেটলাইট স্টেশনও স্থাপন করেছিল।

১৯৭৮ সনে নূর মোহাম্মদ তারাকির ক্ষমতা গ্রহণ আর ১৯৭৯ সনের শেষের দিকে সোভিয়েত বাহিনীর আগমনের মধ্যকার সময়ে সমগ্র আফগানিস্তানে সোভিয়েত পরিদর্শক আর উপদেষ্টাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় কে জি বি এর সদস্যদের ভিড় করতে দেখা যায়। এ এক বছরের মধ্যে কাবুলের অবস্থা একটি অস্থির শহরে পরিণত হয়। চলতে থাকে পিডিপিএ এর দুই শরিকদল 'খালক' আর 'পরচম' এর মধ্যে ক্ষমতার রশি টানাটানি। এরই মধ্যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমেরিকার তৎকালীন নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মি. এডলফ ডাবস্ কে অপহরণ করে কাবুল শহরের এক হোটেলে বন্দী করা হয়। এ নিয়ে পিডিপিএ শরিক দল একে অপরকে দোষারোপ করে অন্যদিকে ইসলামিক

www.nagorikpathagar.org

দলগুলোকেও এর মধ্যে টানা হয়। এহেন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বেশ কয়েকদিন চলার পর রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধারের নামে হত্যা করা হয়। এ হত্যার জন্য আফগান সরকারকে দায়ী করা হলেও আমেরিকা এর কোন শক্ত প্রতিবাদও করে নি। শুধুমাত্র চলমান যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। অবশ্য অনেকেই এ ঘটনার সাথে সরাসরি কে জি বি সংযুক্ত ছিল বলে মনে করে।

ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে মস্কোপন্থীদের ক্ষমতা দখলের পর আমেরিকার তরফ থেকে কোন শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি; বরং যেদিন 'সত্তর অভ্যুত্থান' ঘটে সেদিন আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইরাস ভান্স মস্কোতে তার প্রতিপক্ষের সাথে মিটিংয়ে সল্ট-২ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য ব্রেজনেভের ভূয়শী প্রশংসায় মশগুল ছিল।[১৪] সাইরাস ভান্স সেদিন মস্কোতে আমেরিকান দূতাবাস প্রদত্ত আফগান সংকটের নোটিসটি পড়েও দেখে নি।

১৯৭৮ সনের মাঝামাঝি সময়ের কিছু ঘটনা আফগানিস্তানের বিগত বিশবছরের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এ দু'একটি ঘটনার খেসারত আফগানদের আজও দিতে হচ্ছে। ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে তারাকি সরকারের দুই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর একজন পরচম নেতা হাফিজউল্লাহ আমীনের আইন ব্যবস্থা সংরক্ষণের পদক্ষেপ হিসেবে সমগ্রদেশে এক ত্রাসের সঞ্চার করে যার প্রেক্ষিতে প্রচুর উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে আর দলে দলে আফগান ইসলামপন্থী দলগুলোতে যোগ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে এবং দেশকে সোসালিস্টমুক্ত করার যুদ্ধে যোগ দেয়। এ সময়ে কাবুলের এবং অন্যান্য শহরে সোভিয়েত সেনা সদস্যদের প্রকাশ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে পরোক্ষভাবে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হলে ইসলামী সংস্থাগুলো সরাসরি 'জেহাদ' ঘোষণা করে যুদ্ধে লিপ্ত সদস্যদের মুজাহিদ বলে আখ্যায়িত করে।

এ সময়ের মধ্যেই 'খালক' নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকি এবং অন্যদের সাথে সোভিয়েত রাশিয়া কতগুলো চুক্তি স্বাক্ষর করে যার মধ্যে বিখ্যাত 'মৈত্রী চুক্তি' ও অন্তর্ভুক্ত। এরই মধ্যে বারবাক কারমালকে সোভিয়েত রাশিয়াতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠালে মার্চ ২৮, ১৯৭৮ সনে পি ডি পি এ নূরমোহাম্মদ তারাকির অধীনে হাফিজউল্লাহ আমানকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি দেয়।

১৪। হোলী ওয়ার আনহোলী ভিক্টোরি : পৃ : ৩৭।

www.nagorikpathagar.org

প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তির পর থেকে 'খালক' আর 'পরচমদের' মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। তারাকি হাভানা সফর শেষ করে দেশে ফেরার পথে মস্কো গেলে যেখানে হাফিজউল্লাহ আমীনকে সরাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মস্কোর সম্মতি নিয়ে যখন দেশে ফেরে তখন হাফিজউল্লাহ আমীনের নিকট এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭৯ সনে হাফিজউল্লাহ আমীন তারাকির প্রাসাদ আক্রমণ করে তারাকিকে হত্যা করে একাধারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতঃ সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। আমীন ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়ার উপর নির্ভরতা কমাবার চেষ্টায় রত থাকলে অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৯ সনে সোভিয়েত বাহিনী উত্তরে তাদেরই নির্মিত আমুদরিয়ার উপরের 'বন্ধুত্ব পুল' (FREINDSHIP BRIDGE) পার হয়ে সরাসরি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। শুরু হয় সোভিয়েত কর্তৃক আফগানিস্তান দখল। সেই রাতেই প্রায় তিন ফুট বরফ ভেঙ্গে সোভিয়েত বাহিনী কাবুলে পৌঁছে। রাতটি ছিল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'ক্রিসমাস' এর রাত্রি আর ছুটির মৌসুম। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন ছুটির আমেজে। ঐ দিনটিতে চলছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নার জন্ম দিনের ছুটির প্রস্তুতি আর ইরানে আয়াতুল্লাহ্ রোহুল্লা খোমিনীর হাতে আটক আমেরিকান দূতাবাসের জিম্মিদের 'ক্রিসমাস' যাপন। এর তিনদিন পর ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭৯ সনে হাফিজউল্লাহ্ আমীনের মৃতদেহ তার বাসভনে পাওয়া যায়। সোভিয়েত বাহিনী কাবুলে পৌঁছার পরপরেই বারবাক কারমালকে মস্কো থেকে এনে দেশের প্রধানমন্ত্রী, রেভ্যুলিউশনারি কাউন্সিলের রাষ্ট্রপতি এবং পিডিপিএ এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

সে দিন আর তারপর থেকে এতদঅঞ্চলে এবং আরও পরে বিশ্বে এ ঘটনার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে যাতে, বিশেষতঃ মুসলিম আর সাধারণত উন্নতদেশগুলোও প্রভাবিত হবে। জন্ম দেবে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের মত ঘটনা।

১৯৭৯ সন বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্ম দেয় যা মধ্য এশীয় অঞ্চল তথা মুসলিম দেশগুলোকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যে আফগাস্তিান ছাড়াও যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল তা হল ইতিহাসে নজিরবিহীন

www.nagorikpathagar.org

ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানে পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে আমেরিকার শক্তঘাঁটি এবং সবচেয়ে বন্ধুভাবাপন্ন একটি উদারপন্থী শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইরানের শাসক রেজাশাহ পেহলভীর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ ইসলামী বিদ্রোহে পরিণত হয়। এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় সেদেশের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রোহুল্লা খোমেনী। এ অভ্যুত্থান ঘটে রেজাশাহ পেইলভীর দেশ থেকে পলায়নের পর জানুয়ারী ১৬, ১৯৭৯ সনে। ইরানের ইসলামী গণঅভ্যুত্থান এতদঅঞ্চলের, বিশেষ করে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোর সনাতনী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন একদিকে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয় তেমনি অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদ বা উগ্রবাদকে উৎসাহিত করে। সমগ্র আশির দশকে ইরানের মত ইসলামী অভ্যুত্থান অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হবার আশঙ্কায় থাকে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ। এর মধ্য বেশী আতঙ্কিত হয় সোভিয়েত রাশিয়া, ইরান সংলগ্ন মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে (বর্তমানে প্রজাতন্ত্র , তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান প্রভৃতি)।

অন্যদিকে আমেরিকা এ অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশী। এ কৌশলগত ভূখন্ড, আমেরিকাপন্থী শাসক এবং ইরানের মত বন্ধুভাবাপন্ন দেশকে হারানো আমেরিকার বিশ্ব কূটনীতিতে দারুণ আঘাত হানে। আমেরিকার এ পরাজয়ে উৎসাহিত হয় ধর্মীয় অনুভূতির উত্থান। আমেরিকা ইরান থেকে বিতাড়িত হয়। উৎখাত হয় আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-এর এতদঅঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। তদুপরি নভেম্বর ৪, ১৯৭৯ সনে ইরানে আমেরিকার জন্যে আরও বিপর্যয় ঘটে। ঐ দিনে ইরানের ইসলামী অভ্যুত্থানকারীরা তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসের সমস্ত কর্মচারীদের জিম্মি করে ফেলে। এ অবস্থা চলে পনের মাস। এ জিম্মিদের ছাড়াতে ইরানের অভ্যন্তরে আমেরিকার এক গোপন সামরিক অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারকে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় পড়তে হয়। তার পরের বছরেই ছিল আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সবকিছু মিলিয়ে আমেরিকার জন্যে বছরটি সুখকর ছিলনা।

আমেরিকার প্রয়োজন ছিল প্রথমতঃ এতদঅঞ্চলে ইরানের বিকল্প দেশকে প্রস্তুত করা আর ইরানের ইসলামী অভ্যুত্থানকে অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হতে বাধা দেয়া।

ঠিক ঐ একই সময়ে রাশিয়ার সাথে সল্ট-২ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হতে

www.nagorikpathagar.org

চলেছিল। আমেরিকা ক্রমেই ইরানের বিকল্প হিসেবে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে আর আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখল আমেরিকার এতদঅঞ্চলে সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতার জন্যে এক বিরাট সুযোগ এনে দেয়। এদিকে আফগানিস্তানে চলছিল সোভিয়েত বিরোধী সুন্নী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইনসারজেন্সি যা পরবর্তীতে ইরান বিরোধী হয়ে উঠবে। আর অন্যদিকে ইরাক দ্বারা ইরানকে আক্রমণ করতঃ আপাততঃ ইরানের ইসলামী অভ্যুত্থানকে একরকম অঙ্কুরেই নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ ১৯৮০ থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত চলে। মজার ব্যাপার হল, এ যুদ্ধে আমেরিকা আর রাশিয়া উভয়েই ইরাকের পক্ষে থাকলেও গোপনে আমেরিকার সরকারের কিছু অংশ ইরানেও অস্ত্রের ব্যবসা করে। উদাহরণস্বরূপ ইরান-কন্ট্রা[৫] কেলেঙ্কারী। সংক্ষেপে এ ছিল তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তির অবস্থা, বিশেষ করে মধ্য এবং মধ্যপূর্ব এশিয়ায়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক তখন প্রায় একঘরে হয়ে রয়েছিল। মোঃ জিয়াউল হক জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সমস্ত পশ্চিমা দেশের অনুরোধ উপেক্ষা করে মার্চ ১৮, ১৯৭৮ সনে ফাঁসীতে ঝুলালে অর্থনৈতিক অবরোধ আরও চরমে উঠে। সে সাথে আমেরিকা পাকিস্তানকে তার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সমস্ত সামরিক সাহায্য এবং অস্ত্র রপ্তানীর উপরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এসবই জিয়াউল হক উপেক্ষা করে চালিয়ে যায় সামরিক আইনের স্টিম রোলার। আফগানিস্তানে সোভিয়েত অভিযান এবং দখল করণ জিয়াউল হকের জন্যে শাপেবর হয়ে আসে। রাতারাতি জিয়াউল হক হয়ে উঠে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, আফগান মুজাহিদদের নিকট 'মরদে মোমিন,' আর পাকিস্তানের ইসলামপন্থীদের নিকট ইসলামের খেদমতগার। আমেরিকা তথা সোভিয়েত বিরোধী সমস্ত দেশের কাছে পাকিস্তান পরিণত হয় 'ফ্রন্টলাইন স্টেট'।

৫। ইরান কন্ট্রা কেলেংকারী ঃ এ কেলেংকারীতে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সরাসরি এক গোপন রহস্য জনক ব্যবসায় লিপ্ত হয়। এতে একদিকে ইরান অন্য দিকে সি আই এ সমর্থিত নিকারাগুয়ায় তৎকালীন সান্দানিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিদ্রোহীরা জড়িত ছিল। ১৯৮৫ সনে আমেরিকান কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরানের নিকট উড়োজাহাজ এবং ট্যাংক বিধ্বংসী আমেরিকায় প্রস্তুত মিসাইল লেবাননে হামাস (HAMAS) কর্তৃক আটককৃত জিম্মী মুক্তির মধ্যস্থতার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। এ বিক্রয়লব্ধ অর্থ তৎকালীন কর্মকর্তা কর্ণেল ওলিভার নর্থ এর মাধ্যমে নিকারগুয়ায় আমরিকান সমর্থিত সান্দানিস্তাবিরোধী গেরিলাদের অস্ত্রের যোগান দিতে দেয়া হয়। আমেরিকায় তখন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান। এনিয়ে আমেরিকার কংগ্রেস ও সিনেটে প্রচুর তোলপাড় হয়।

www.nagorikpathagar.org

সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানের ইতিহাস জানা সত্ত্বেও কেন সরাসরি আক্রমণ করে দখল করবার প্রচেষ্টা করেছিল এ নিয়ে মোটামুটি একটি পশ্চিমা ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু এ ব্যাখ্যায় সোভিয়েত কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের যে কারণ বলা হয়েছে তার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যারা ইতিহাসের ছাত্র বা বিশ্বের ভূ-কৌশলবিদ তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, রাশিয়ার 'জার' (ZAR) সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে ১৯১৯ সনের ভলসেভিক রেভ্যুলিশনের পরে ভারতের বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমণ এবং দক্ষিণাভিমুখি অগ্রসরের একটা বড় ধরনের আশংকা করেছিল। এ আশংকা আরও সুদৃঢ় হয় বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শীতল যুদ্ধের শুরু থেকে। পশ্চিমা বিশ্বের একটি ধারণা জন্মে যে, সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণে 'গরমপানির বন্দর' (Warm Water Port) দখল বা তৈরী করবার জন্যে তার আধিপত্য বিস্তারে এতদঅঞ্চলে প্রচন্ডভাবে আগ্রহী। তাই আফগানিস্তানের উত্তর দক্ষিণ যোগাযোগে ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় এবং রাশিয়ার এ ধরনের যে কোন পরিকল্পনাকে বাধা দেয়ার জন্যে আমেরিকা একদিকে পাকিস্তানকে এবং অন্যদিকে ইরানকে পাশে রেখে এতদঅঞ্চলের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছিল। অনেক পাঠকেরই হয়ত মনে থাকবে যে, সে সময় পাকিস্তান এবং ইরানের বেলুচিস্তান প্রদেশ নিয়ে রাশিয়া সমর্থিত বৃহত্তর বেলুচিস্তান গঠনের কথা প্রায়ই শোনা যেত এবং সেই সাথে রাশিয়া এবং ভারত সমর্থিত 'রেডসার্ট' মুভমেন্টও চলমান ছিল। এসব কারণেই, বিশেষ করে রাশিয়া এবং ভারতের কথিত আগ্রাসন ঠেকাতে তৎকালীন পাকিস্তান জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বাদ দিয়ে আমেরিকা সমর্থিত সামরিক জোট 'সেন্টো'[@] এবং সিয়েটো'তে (CENTO and SEATO) যোগ দিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় আলোচনার বাইরে হবে না যে, পাকিস্তান ১৯৭১ সনের পরাজয়ের পর এ দুই সংস্থা থেকেই বের হয়ে ১৯৭৯ সনে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হয়। পশ্চিমাদেশের এ তত্ত্ব হয়ত বা অমূলক ছিলনা তবে আফগানিস্তানে প্রবেশের পর সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হবার সুযোগ পায় নি।

@। সেন্টো : ১৯৫৫ পর্যন্ত বাগদাদ প্যাক্টনামে পরিচিত। পরে ১৯৫৫-৭৯ পর্যন্ত (CENTO) নামে পরিচিত এ প্যাক্টে আমেরিকা ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান এবং বৃটেন এর সদস্য ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত বিরোধী সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা। SEATO ও ছিল অনুরূপ সামরিক জোট। এতে সদস্য ছিল আমেরিকা, বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং ফ্রান্স। ১৯৫৪-৭৭ পর্যন্ত এ জোট কার্যকর ছিল।

www.nagorikpathagar.org

যারা উপমহাদেশের পরিস্থিতির বিষয়ে উৎসাহী তারা হয়ত এর মধ্য ভারত -পাকিস্তানের রেশারেশির আভাসও পাবেন। ভারত সরকার কখনই আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলের নিন্দা সুস্পষ্টভাবে জানায় নি; বরং প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহিত করেছে। ভারতের অনেক বিশেষজ্ঞদের মতামতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত অভিযানের মস্কোর ব্যাখ্যারই সমর্থন পাওয়া যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার আফগান অভিযানের ব্যাখ্যা বরং অত্যন্ত আত্মরক্ষামূলক। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাষ্যমতে ইরানের ঘটনাবলি তাদের দক্ষিণের মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যগুলোকে প্রভাবিত করছিল। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার মতে দক্ষিণে বিশেষ করে ইসলামিক ক্রিসেন্ট, আমেরিকা, চীন এবং জাপান সম্মিলিতভাবে রাশিয়াকে দক্ষিণ থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল। এরই মধ্যে তাদের ভাষ্যমতে, আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ স্বকীয় অভ্যুত্থানের বিপরীতে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিগুলো তৎপর হয়ে পড়াতে ও হাফিজউল্লাহ্ আমীনের মস্কো বিরোধী তৎপরতার কারণে এবং আফগান সরকারের আমন্ত্রণে মস্কো আফগানিস্তানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মস্কোর এ পদক্ষেপ তাদের মতে, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৯ সনের রুশ আফগান বন্ধুত্ব চুক্তির (Frindship Treaty) স্তবক ৪ এবং ৮ এর প্রেক্ষিতে নেয়া হয়েছে বলে মস্কো অভিযানকে বৈধতা দিতে চাইলে আমেরিকা এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নাই।[১৫]

সোভিয়েত ইউনিয়নের এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে মস্কোতে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং পরে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল। এক রচনায় আই কে গুজরাল বলে যে, রাশিয়া সে সময় তার (রাশিয়ার) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভৌগলিক সীমা রক্ষা করবার জন্যেই এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল।[১৬] একই প্রসংগে ভারতের বিখ্যাত ভূ-কৌশলবীদ কে সুরামনিয়ামের মতে, আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য, জাপান আর চীনের ক্রমবর্ধমান ভূ-কৌশলগত সমঝোতার মাধ্যমে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টা থেকে 'রাশিয়া এ বেষ্টনীর দুর্বল অংশ ছিন্ন করে রেব হবার প্রচেষ্টা করেছে মাত্র।'[১৭]

১৫। প্রাভধা ঃ মার্চ ১৯,২১; ১৯৭৯ সন প্রাভধা ঃ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৯।

১৬। গুজরাল আই কেঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন সিকিউরিং দা ফ্ল্যাঙ্ক 'ওয়ার্ল্ড ফোকাস' নং ৫২ পৃ: পৃ; এপ্রিল ১৭, ১৯৮৪।

১৭। সুব্রামানিয়ান কে ঃ স্ট্রেটেজিক ডোমিনিয়ন ঃ কোল্ডওয়ার মেনুভারস্ ওয়ার্ল্ড ফোকাস, নং ৫২ পৃ ৮ এপ্রিল ১৯৮৪।

www.nagorikpathagar.org

পূর্বের এবং পশ্চিমের মতভেদ যতই থাকুক না কেন ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৯ সনের পর থেকে আফগানিস্তানের চলমান গৃহযুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ বা ইসলামী 'জেহাদ' এ পরিণত হয়। আর এ 'জেহাদে' অংশগ্রহণকারী আফগান এবং তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারীদের বিশ্ব মুজাহিদীন বা মুজাহিদ বলে জানবে। আজও তালেবান বিরোধীদের পশ্চিমা সাংবাদিকরা মুজাহিদীন বলে সম্বোধন করে।

ইসলামাদ, পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০১ সন। পাকিস্তানের সবচেয়ে আধুনিক এবং সুবিস্তৃত রাজধানী ইসলামাবাদ সেদিনও যথারীতি ব্যস্ত। ইতিপূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আমেরিকার প্রতি তার এবং তার দেশের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিজ্ঞা করে। মোশারফের ৩৭ বছরের সামরিক বাহিনীর চাকুরীর অভিজ্ঞতায় এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি যেখানে তাকে শুধু সামরিক দিক থেকেই নয়; বরং রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিবেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে অত্যন্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোকাবেলা করতে হবে। তার মতে এরকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ইতিহাসে আর কোন রাষ্ট্রপতি পড়েছে বলে মনে হয়না। অপরদিকে বিগত বিশ বছরে আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তান ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে যদিও বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পর্কে কিছুটা ফাঁটল ধরেছে তবে কোনভাবেই তা বৈরিতার কাছাকাছি পৌঁছে নি। সামনে অভাবনীয় সমস্যা। সমগ্র দেশকে তার সিদ্ধান্ত কিভাবে নাড়া দেবে মোশারফ এখনও বুঝে উঠতে পারছেনা তবে আফগানিস্তানে যে কোন ধরনের বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধাচারণ অন্ততঃ ধর্মীও রাজনৈতিক পার্টিগুলো করবে তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে জে ইউ আই (JUI: জামাতই উলেমায়ে ইমলাম) এর তরফ থেকে এর বিরোধিতা হবেই। কারণ জে ইউ আই এর সাথে তালেবানদের সম্পর্ক আফগানিস্তানে তালেবানদের অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই। মোশারফ অবশ্য ভালভাবেই জানে যে, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী আর জনগণের বৃহদাংশ তার সাথে থাকলে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট মোশারফ আসল সংকট আঁচ করতে পেরেছে কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায়। এরই মধ্য প্রতিটি কোর কমান্ডার, উচ্চপদস্থ সামরিক

www.nagorikpathagar.org

কর্মকর্তাদের এ ঘটনার উপর তাদের মতামত টেলিফোনেই নিয়ে নিয়েছে তবে আগামীকাল বৈঠকে বসবে বলে এ বিষয়ে বিশেষ বিস্তারিত আলাপ করে নি। তবে কোর কমাণ্ডারগণ এ মুহূর্তে আমেরিকার বিরুদ্ধাচারণ পাকিস্তানের জন্যে কতখানি ক্ষতিকর হবে তা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে।

এদিকে বিগত দুই দশক ধরেই ভারত আফগানিস্তান নিয়ে পাকিস্তানের বিরোধীর ভূমিকায় রয়েছে। ভারত চাইছে আফগানিস্তান সরকার পাকিস্তানের প্রতি বেশী ঝুঁকে না পড়ে, তার উপরেও পখতুনিস্তান সমস্যা এখন জীয়ায়ে রয়েছে। ভারত, সোভিয়েতদের আফগানিস্তান আক্রমণের যেমন নিন্দা করে নি তেমনি প্রায় সম্পূর্ণ সময়টিতে রাশিয়ার এবং রাশিয়াপন্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। শুধু তাই নয়, ১৯৯১-৯৪ পর্যন্ত মুজাহিদ দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধে দোস্তাম-মাসুদ-রাব্বানী গ্রুপকে সমর্থন জুগিয়েছে এবং আজও নর্দান এলায়েন্স বলে তালেবান বিরোধীদের সক্রিয় সহযোগিতা করে যাচ্ছে। যদিও রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এখন আর আফগানিস্তানকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করতে আগ্রহী নয়। এর কারণ এ বিভাজনে ভূ-কৌশলগত ফায়দা কোন দলেরই হবে না; বরং এতে আরও জটিলতা বাড়বে বলে ইদানীং প্রতীয়মান হয়েছে। তাই ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা এবং ইরানের সাথে তালেবানদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই সাহায্য করে আসছে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ভারত, মাসুদ এবং অন্যদের সাথে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে বৈঠকও করে। বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্যও মোশারফের অজানা ছিল না।

অন্যদিকে ভারত মনে করে পাকিস্তান এবং তালেবান সমর্থিত ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের দিয়ে কাশ্মীরে স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে জেহাদী তৎপরতা ছড়াচ্ছে। আর এসব বৈরী আচরণের কারণেই সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিগত দু'দশকে দু'দেশের কোন সরকারই কাশ্মীর সমস্যার কোন অগ্রগতি করতে পারে নি। বর্তমান অবস্থায় কাশ্মীরের অভ্যন্তরের হানাহানিকে পাকিস্তান সমর্থিত উগ্রবাদীদের তৎপরতা বলে ভারত দাবী করলেও পাকিস্তান মনে করে এ কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এতে পাকিস্তান নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মাত্র। এই বিভেদের কারণেই এ বছরের এপ্রিলের আগ্রা শিখর সম্মেলনটিও অসমাপ্ত থাকে।

এ পর্যন্ত আই এস আই ডাইরেক্টর জেনারেল, লে. জেনারেল মাহমুদ এর

www.nagorikpathagar.org

কাছ থেকে এবং পরে আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কলিন পাওয়াল থেকে যা জানা গেছে তাতে মোশারফের কোন সন্দেহ থাকে না যে, আমেরিকা ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর ঘটনার জন্যে আফগানিস্তানে বসবাসরত ওসামা বিন লাদেন এবং তাকে শরণ প্রদানকারী মোল্লা ওমরকে দায়ী করেছে এবং এ অবস্থা থেকে আমেরিকা সরে দাঁড়াবে না। আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাব পোষণ করেছে এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযান নেয়া থেকে পিছ পা হবে না। এ কথা পাকিস্তান সরকার ভালভাবে জানে কারণ ইতিপূর্বেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ অভিযানের জন্যে পাকিস্তানের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে সর্বাগ্রে এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তানকেই নির্ণয় করতে হবে। অন্যথায় পাকিস্তানকেও সন্ত্রাসের সাহায্যকারী দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। মোশারফের জন্যে আরও একটু বেকায়দার ব্যাপার হল আমেরিকা না চাইতেই ভারত সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্য দিতেও রাজী হয়ে গেছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি গতকাল (১২-৯-২০০১) এবং আজ সারাদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করতে থাকে। সকল সামরিক কোর কমাণ্ডার এবং প্রদেশগুলোর গভর্ণরদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া থেকে শুরু করে পূর্বের এবং পশ্চিমের সমস্ত বর্ডারকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ৮ টার দিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রথম বারের মত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশরে টেলিফোন পায়। উভয়ে কুশল কামনার পর জর্জ বুশ প্রথমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে সমবেদনা জানাবার এবং নিঃশর্ত সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেবার জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানায় । তবে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি আফগানিস্তান এবং ওসামা বিন লাদেনের ব্যাপারটা খোলাসা করে। ওসামার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে তালেবান সরকার কর্তৃক ওসামাকে হস্তান্তর না করার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সামরিক ব্যবস্থার কথা বলে। বুশ আরও জানায় যে, পাকিস্তানের সামনে দুটি পথই খোলা রয়েছে হয় বিশ্বে সন্ত্রাসী দমন অভিযানে শরীক হওয়া অথবা অন্যপথে যাওয়া। বুশের কথার সার সংক্ষেপ অবশ্য আমেরিকার ভাষায় বলতে হলে বলতে হবে, 'পাকিস্তানের কাছে দুটি

www.nagorikpathagar.org

পথই খোলা রয়েছে হয় একুশ শতকে বসবাস করা অথবা প্রস্তর যুগে ফিরে যাওয়া।'[১৮]

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলবার পর মোশারফ একটি ব্যাপারে নিশ্চিত যে, পাকিস্তানের পক্ষে আর কোন অজুহাতেই তালেবান সরকারকে সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবেনা। একথা সত্য যে, আফগানিস্তানে তালেবান সরকার আগাগোড়া পাকিস্তানী সহয়তা পেলেও দেশের স্বার্থে আঘাত পড়লে সে সহায়তা করা কোনভাবেই বা যে কোন কারণেই সম্ভব নয়। এছাড়া মোশারফের নিকট আমেরিকার সাথে সহযোগিতা অর্থনৈতিক কূটনৈতিক এবং এতদঅঞ্চলে ভারতের প্রতি আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব হ্রাসের সহায়ক হবে বলে মনে হয়েছে। তা ছাড়া তার পূর্বসূরী সামরিক শাসক জিয়াউল হকের মতই দেশে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর এ সুযোগ গ্রহণ করতে তার বেশী সময় লাগে নি তবে পরবর্তীতে তার অবস্থান কোথায় হবে সেটা বিবেচনায় হয়ত আসে নি।

এরই মধ্যে মোশাারফ কোর কমান্ডারদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে আমেরিকার সামরিক অভিযানে শুধু লজিস্টিক আর গোপন তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমেই সহায়তা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এছাড়াও মোশারফ সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজের মন স্থির করে ফেলেছিল।

ওয়াশিংটন এরই মধ্য তালেবানদের আগের দাবী, যাতে বলা হয়েছিল তারা ওসামাকে তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছাড়া হস্তান্তরের কথা বিবেচনা করবে না বলে প্রদেয় বক্তব্যকে নাকচ করে দেয়। এর বিপরীতে তিন দিনের মধ্যে ওসামাকে হস্তান্তর না করলে আফগানিস্তানকে শত্রু ভাবা হবে বলে জানানো হয়।

সমস্যা আরও ঘণীভূত হয়। পাকিস্তানের জনগণের এক ক্ষুদ্রাংশ হলেও অনেক ধর্মীয় সংগঠন সরকার এবং মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ বের করতে থাকে। এসবের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন থেকে ফেরত আসা আই এস আই প্রধানকে নেতা করে একটি দল শেষবারের মত চেষ্টা করবার জন্যে কান্দাহারে মোল্লা ওমরের কাছে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের

১৮। ডন ঃ সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০১।

www.nagorikpathagar.org

এই শেষ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবার জন্যে এবং কান্দাহারে পাকিস্তানের পশতুন উপজাতীয় কনস্যুল জেনারেল ওমর খান আলী সেরজাইকে এ বৈঠকের আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

সোমবার সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০১ সনে জেনারেল মাহমুদ বিশেষ বিমানে কান্দাহার পৌঁছলে সেদিন মোল্লা ওমর এ দলের সাথে দেখা করতে রাজী হয় নি। পরের দিন মাহমুদ পাক-রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে তালেবানদের জানায় ওসামাকে হস্তান্তর করার বিপরীতে তাদের আর কোন প্রস্তাব নেই। হয় তাকে হস্তান্তর অন্যথায় আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের সামরিক তৎপরতায় তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনাকে গ্রহণ করণ এ দুটোর মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। সব শুনে মোল্লা ওমর জানালো যে, কাবুলে ইসলামী ইমামদের ডাকা হয়েছে এবং ওসামা বিন লাদেনের হস্তান্তরের বিষয়টিতে তাদের মতামতই চূড়ান্ত হবে। কাজেই জেনারেল মাহমুদ কাবুলেই পাকিস্তানের এ প্রস্তাবের জবাব পাবে।

কান্দাহারে মোল্লা ওমরের সাথে কথা শেষ করে সমস্যার কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান হবার পথ তৈরী হতে দেখা গেলনা। কাবুলে পরের দু'দিন চলল ধর্মীয় ইমামদের সভা। সে সভায় সাব্যস্ত হল যে, কাবুলের এবং তালেবানদের মেহমান ওসামা বিন লাদেনকে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছাড়তে বলা হবে। আফগানিস্তান ছাড়াটা হবে ওসামার নিজের ইচ্ছায়। এর জবাবে মোল্লার কথায় যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে তালেবানরা ওসামাকে আমেরিকার ইচ্ছানুযায়ী হস্তান্তর করবেনা। জেনারেল মাহমুদ কাবুল থেকেই সমস্ত বিষয়টি ইসলামাবাদে খোলাসা করে। কাবুল ত্যাগের পূর্বে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীদের আমেরিকার মনোভাব এবং পরবর্তী পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি এবং এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর ইসলামাদ ফিরে আসে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে অবশেষে জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে আমেরিকায় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এ হামলার পর থেকে বিশ্বের পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনানুযায়ী সেপ্টেম্বর ১৯, ২০০১ বুধবার, পাকিস্তানে ফৌজী রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশারফ দেশবাসীকে আমেরিকাকে সর্বোত সাহায্য প্রদান

www.nagorikpathagar.org

করবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। তার এ ভাষণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরাসরি বিদেশী চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়। এক পর্যায়ে মোশারফ দেশবাসীকে জানায় যে, এ সিদ্ধান্তের সাথে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'এ সংকট ১৯৭১ সনের পরে সবচেয়ে মারাত্মক সংকট'। আরও জানায় 'আমাদের সঠিক নির্ণয় এ দেশের জন্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। এসময় যে কোন ভুল বা আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্নত করতে পারে, সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে আমাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষগুলোর যার মধ্যে পারমাণবিক শক্তির আর কাশ্মীরের মত জাতীয় প্রশ্নগুলো রয়েছে।' তার ভাষণ শেষ করবার এক পর্যায় তালেবানদের উদ্দেশে মোশারফ বলে যে, পৃথিবীর প্রায় ২৫টি দেশের নেতৃবৃন্দ যাদের সাথেই তার সাক্ষাৎ হয়েছে তালেবানদের বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধের সমাপ্তির কথা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপস্থাপন করেছে। কাজেই তালেবানদের প্রতি পাকিস্তানের কতখানি সহমর্মিতা ছিল তা অনুমানেয় মাত্র।

মোশারফের জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ও নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সমস্ত বিষয়ের এক সম্ভাব্য জটিল পরিস্থিতির অভাস ছিল। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে মোশারফের একদিকে অসহায়ত্ব অন্যদিকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সুস্পষ্ট আভাস দু'ই প্রকাশিত হয়। তবে এর জন্যে ভবিষ্যতে কতখানি খেশারত দিতে হবে সে কথা কেউই বলতে পারেনা।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মোশারফ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আর তালেবানদের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল বেশ কিছুদিন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কাবুল থেকে রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য স্টাফ প্রত্যাহার করে নিলে যুদ্ধের সর্বপ্রস্তুতির সমাপ্তি হল।

অক্টোবর ৭, ২০০১। রাষ্ট্রপতি মোশারফ তার কয়েকজন ঘনিষ্ট সামরিক সহকারীদের অবসর প্রদান করে যার মধ্য আই এস আই প্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল মাহ্‌মুদ আহমেদও ছিল।

পাকিস্তানের চতুর্থ সামরিক শাসক অক্টোবর ৭, ২০০১ এর সন্ধ্যায় জানতে পারে আমেরিকা আজ সম্ভবত হামলা শুরু করতে পারে। পারভেজ মোশারফ ইসলামবাদের 'আওয়ানে সদর' বা রাষ্ট্রপতি ভবনের উত্তরের বারান্দায়

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে দূরে মারগালা হিলস্ এর দিকে তাকাতে তার মনে এক ধরনের প্রশান্তি এলো। দূরে পাহাড়ের পাদদেশের জ্বলন্ত বাতিগুলোকে হাজার হাজার তারার মত দেখা যাচ্ছিল। বাইরে অক্টোবরের শুরুতে বিকেলের আবহাওয়া বেশ সহনীয় আরামদায়ক। কিছুক্ষণ পরে অদূরে 'ফয়সল মসজিদ' থেকে মাগরেবের আজানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসল তার কানে। আগে তার কাছে এ মসজিদের আজান আজকের মত এত মধুর লাগে নি। আজানের উৎস এক গম্বুজের নীচে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মসজিদের সুউচ্চ চারটি মিনারে সবুজ বাতির ছটা পরিবেশকে স্বর্গীয় করে তুলছে। এ মসজিদ তৈরী হয় সৌদী অনুদানের বিনিময়ে তুরস্কের এক স্থপতির নক্সার আদলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হকের সময়।

মোশারফ ফয়সাল মসজিদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আজ থেকে ১৩ বছর পূর্বে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের শেষ বিপর্যয়ের এক বছর পূর্বে এক রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় জিয়ার মৃত্যু হয় । সেদিন জিয়ার সাথে মৃত্যু হয় আরও এমন কয়েকজনের যারা সে সময়ের আফগান যুদ্ধের আর মুজাহিদদের জন্মলগ্ন থেকে এর সাথে জড়িত ছিল। যুদ্ধ চলার সময়ে ক্রমেই জিয়াউল হক আফগান মুজাহিদ এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ঘরে ঘরে এক কিংবদন্তীর নামে পরিণত হয়। ১৯৮০ সনের দিকে মুজাহিদদের পুনর্গঠন হয় আর সে সময় থেকে জিয়াউল হক হয়ে উঠে পশ্চিমা বিশ্বের একনম্বর মিত্র। সে সময় সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের পক্ষে ছিল আজকের বিশ্বের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধের সংগ্রামের জোট। তখন পাকিস্তানের উপরে ভর করেই সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে ইসলামী 'জেহাদে' লিপ্ত ছিল সমগ্র পশ্চিমা জোট। সমগ্র বিশ্ব তখন আফগানিস্তানের এবং এর যোদ্ধাদের জন্যে নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠেছিল। আর আজ একুশ বছর পরে ঐ একই মিত্র দেশ এবং এদের সাথে রয়েছে এককালের শত্রু রাশিয়া কিন্তু এবার আফগানদের (তালেবানদের) বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে পাকিস্তানকে।

জিয়াউল হক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হয়ত কোনদিন কল্পনাও করে নি যে একদিন তার দেশকেই আফগানিস্তানের তথাকথিত ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আজও আফগান শরণার্থী অথবা প্রাক্তন 'মুজাহিদ' সদস্য বা নেতৃবৃন্দ যারাই ইসলামাবাদে আসে, ফয়সল মসজিদের সন্নিকটে জিয়ার কবরে ফাতেহা পাঠ করা তাদের অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মোশারফ আজানের পরেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরেই সামরিক সহকারী এসে রাষ্ট্রপতিকে জানালো কাবুল আর কান্দাহারে পঞ্চাশটি ক্রুজ মিসাইল হানার মধ্য দিয়ে আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে এ শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধ আর একুশ বছরের মাথায় দ্বিতীয় বার বহিঃবিশ্ব থেকে আফগানিস্তানে আক্রমণ তবে এবার পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামের নামে 'জেহাদে' সাহায্য করতে নয়; বরং 'তথা কথিত ইসলামী জিহাদীদের' সৃষ্ট 'সন্ত্রাস' নির্মূল করতে। এ যুদ্ধে কোন 'মুজাহিদ' নেই- রয়েছে 'সন্ত্রাসী'। আর এ যুদ্ধকে আমরা পর্যায়ক্রমে 'এনডিউরিং ফ্রিডম' 'ওয়ার এগেইনস্ট টেরর' এবং 'সুইফট ভিক্টরি' ইত্যাদি নামে জানবো।

www.nagorikpathagar.org

সোভিয়েত আগ্রাসন ও জেহাদের উপাখ্যান

'আফগানিস্তানে ভল্লুকের ফাঁদে পা দিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া।'

ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৯, ওয়াশিংটন ডিসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উৎসব বলে পরিচিত 'ক্রিসমাস' আর নববর্ষের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন প্রায় ফাঁকা, তার উপরে কনকনে শীত আর হালকা বরফের কারণে সমগ্র শহরকে ঘুমন্ত মনে হচ্ছিল। অদূরে হোয়াইট হাউসে কর্মচঞ্চল চীফ অব স্টাফ। রাষ্ট্রপতি আর কিছুক্ষণ পরে সি আই এ (CIA) সদরে যাবে।

সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটা। সি আই এ (CIA) সদর ল্যাংলেতে প্রচুর ব্যস্ততা। বিশ্বে কম্পন জাগানো এ গোয়েন্দা সংস্থার সদর আজ কর্মচঞ্চল। প্রচণ্ড নিরাপত্তার করণে কেবল মাত্র বিশেষ ছাড়পত্র ছাড়া সাধারণ কর্মকর্তাদেরও প্রবেশ নিষেধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় তলার রুম নং ১ বি ৮৯০ তে। এ কামরাটি ১৫ (পনের) মিলিয়ন ডলার খরচ করে ১৯৭৭ সনে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। এগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে পৃথিবীতে ঐ মুহূর্তে ঘটে যাওয়া যে কোন উদ্ভূত পরিস্থির তাৎক্ষণিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেয়া। এখানে প্রতি মিনিটে মনিটরিং এর বন্দোবস্ত রয়েছে। সি আই এ (CIA) সদরে এ রুমের বিশেষ নাম দেয়া হয়েছিল 'আলিবাবা কেভ' বা 'আলিবাবার গুহা'। এ বিশেষ রুমের প্রবেশ মুখেই রয়েছে ক্লোজসার্কিট টেলিভিশন যা রেকর্ড করে প্রতিটি আগন্তুক এবং তার অবস্থানের পূর্ণ সময়ের গতিবিধি। পরে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয় ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত। এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিকেও ছাড় দেয় না। অনুরূপ আরও একটি কেন্দ্র রয়েছে ফ্লোরিডায়।

ঐ দিন সে রুমে কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হল আমেরিকার ৩৯তম

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপতি জেমস্ আর্ল কার্টার (জুনিয়র), নিরাপত্তা উপদেষ্টা, পোল্যান্ডের একসময়কার উদ্বাস্তু হয়ে আমেরিকা আসা নাগরিকের পুত্র মিঃ জিবিস্ক্যু ব্রেজেনস্কি, সি আই এ (CIA) প্রধান এডমিরাল টার্নস্ফিল্ড টার্নার। ঊর্ধ্বতন পরামর্শদাতাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির এ রুমে সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তানে অভিযানের সঠিক পরিস্থিতি জানাবার জন্যেই আগমন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথে যোগ দিল ডিফেন্স সেক্রেটারি হ্যারল্ড ব্রাউন। পররাষ্ট্র সেক্রেটারি সাইরাস রবার্টস্ ভান্স যিনি পেশায় একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ, ঐ দিন মস্কো থেকে ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু সময়মত পারে নি।

রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসল। এমনিতেই তার চেহারায় হাসি কম তার উপর সেদিন সকালে বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থার কারণে চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল। একপাশে উপবিষ্ট ব্রেজেনস্কির ঠোঁটের কোণায় একচিলতে প্রশান্তির হাসি। সামনে দাঁড়ানো এডমিরাল টার্নারের সাথে দ্রুত হাসি বিনিময়ের পর যথারীতি পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু হয়। রুমের চারদিকে সিনেমাস্কোপ পর্দার মত ছয়টি ঘূর্ণায়মান পর্দা রয়েছে কক্ষপথ থেকে কে এইচ-১১ (KH-11) উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরচিত্র পরিবেশনের জন্য। এ উপগ্রহের চিত্র এতই পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম যে, মস্কোর ক্রেমলিন থেকে একটি গাড়ী বের হলেও তার চিত্র পরিবেশন করা যায়। এসবের প্রতিটি উপগ্রহ দ্বারা বিশ্বের যে কোন প্রান্তের ছবি প্রয়োজনবোধে পাওয়া যায় এবং সরাসরি এ পর্দাগুলোতে প্রতিফলিত হয়। এসব ছবিতে যে কোন জীবন্ত প্রাণীর অবয়ব সঠিক ভাবে বুঝা যায়।

সেদিন প্রেসিডেন্টকে জানানো হল রাশিয়ার অগ্রগামী আর্মার্ড ডিভিশনের সৈন্যবাহী আর্মার্ড পারসন্যাল ক্যারিয়ারগুলো বিনা বাধায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবুলে ঢুকে পড়বে। সাথে চলমান ইসলামী মুজাহিদদের প্রতিরোধের কথা বলা হলেও তাদের বিশেষ কোন কার্যকলাপ কাবুলের উত্তরে নেই বলেই জানানো হল। যদিও ব্রেজেনস্কি ভালভাবেই জানে যে, মুজাহিদদের মাত্র কয়েকমাস আগে ৩০৩ রাইফেলের একটি বিরাট চালান পাঠানো হয়েছিল এবং পাকিস্তানের আই এস আই (ISI) এর কয়েকজন সদস্য ইতিপূর্বে আফগান তাজিক সীমান্তে গ্যাস পাইপ লাইন ধ্বংস করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়। ব্রেজেনস্কি আর টার্নার সোভিয়েতদের আফগানিস্তানে

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশ নিয়ে বেশ উৎফুল্ল। কারণ এ দুজনের মত কঠোর সোভিয়েত বিরোধীদের মতে 'রাশিয়ান ভল্লুক ফাঁদে পা দিয়েছে মাত্র, এখন ফাঁদে বন্দী করা বাকী।'

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে সেদিন বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ব্রেজেন্স্কি বলল 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, রাশিয়া ঐ কাজটিই করেছে ঠিক আমরা যেভাবে চেয়েছি। রাশান ভল্লুক এখন ফাঁদে পড়েছে। আফগানিস্তানই হবে রাশিয়ার ভিয়েতনাম।' সাথে সায় দিল এডমিরাল টর্নার। সেদিন সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে কার্টার যেমন ছিল শান্তি প্রিয় মানুষ তার নিরাপত্তা উপদেষ্টারা ছিল তেমনি যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদ। ব্রেজেন্স্কি এমন একজন মানুষ যে সোভিয়েত রাশিয়ার নামে একফোঁটা ঘাম ফেলতেও রাজী ছিল না। তার মতে, রাশিয়ার হাতে তার পূর্বের মাতৃভূমি পোল্যান্ড ধর্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর দখলেও পোলান্ডের যে ক্ষতি হয় নি তা তিরিশ বছরের অধিক সময়ে রাশিয়ার দখলে হয়েছে। ব্রেজেন্স্কি ১৯৫৬ সনে রাশিয়ার সমর্থনে মজুরদের উপরে পোল্যান্ড সরকারের অমানবিক অত্যাচার এবং ১৯৮০ সনেই রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে জেনারেল ইয়ারু জালেস্কির একনায়কত্ব এবং অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো, কোনটার জন্যেই রাশিয়াকে ক্ষমা করতে পারে নি।

অন্যদিকে সি আই এ (CIA) এর প্রধান এডমিরাল টার্নার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অগ্রগামী সৈনিক বলে পরিচিত এবং মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করতে সক্ষম হলেও এখনও রাশিয়ার সামরিক শক্তিকে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করাতে না পারাটা তার নিজের অক্ষমতা বলেই মনে করছিল। টার্নার ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড রাশিয়া বিরোধী। তার উপরে রয়েছে অতি সাম্প্রতিক ইরানে ঘটে যাওয়া আমেরিকার প্রচণ্ড বিপর্যয়। যদিও এ বিপর্যয়ের পেছনে রাশিয়ার হাত নেই তবুও এ জন্য রাশিয়ার যতটুকু লাভ হয়েছে, সে ছাড়টুকুও দিতে রাজী নয় এডমিরাল টার্নার। টার্নার আর ব্রেজেন্স্কি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল প্রতিশোধের।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কার্টারের জন্যে সময়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ আগামী নির্বাচনে তাকে রোনাল্ড রিগানের মোকাবেলা করতে হবে। তার বৈদেশিক কূটনীতিই ছিল বিপক্ষের প্রধান হাতিয়ার। দেশের অভ্যন্তরে কার্টারকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কম, প্রধান ধর্ম যাজক বেশী বলে জনগণ সম্বোধন করত।

www.nagorikpathagar.org

তার নরম স্বভাব এবং শান্তির মোহ, রাষ্ট্রপতির এ ভাবমূর্তির সাথে রাশিয়া বিরোধী টার্নার আর ব্রজেন্স্কি ভালভাবেই পরিচিত ছিল।

যেমনটা আমরা জানলাম সি আই এ (CIA) আর নিরাপত্তা উপদেষ্টা সবাই রাষ্ট্রপতির অনেকটা অজান্তেই আফগানিস্তানে সোসালিস্ট সরকার বিরোধী তৎপরতায় পরোক্ষভাবে যৎসামান্য হলেও বেশ আগের থেকেই সাহায্য দিয়ে আসছিল। এ সব সাহায্যও অতি সন্তর্পণে এবং গোপনে দেয়া হলেও প্রতিপক্ষ কে জি বি (KGB)'র অগোচরে ছিলনা। সি আই এ (CIA) পাকিস্তানের আই এস আই (ISI) এর সহযোগিতায় এসব ছোটখাট সাহায্য করা শুরু করেছিল। তবে সোভিয়েতদের সরাসারি আক্রমণের পর পরিস্থিতি আর গোপন অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা আর সে কথা রাষ্ট্রপতিকে এ পরিস্থিতিতে বুঝাতে এসব রাশিয়া বিরোধীদের আর বেশী সময় যে লাগবেনা তাতে এরা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। ব্রেজেন্স্কি, টার্নার আর ভান্সরা ভাল করেই জেনেছে যে, কার্টারের ইমেজকে ইলেকশনের আগে টেনে তুলতে হলে রাশিয়া বিরোধী তৎপরতাই তাকে সাহায্য করতে পারবে। এখন যা প্রয়োজন তা হল যুদ্ধের ধরন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এর সমর্থন। আরও প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে 'বিধর্মী' রাশিয়া কর্তৃক একটি মুসলমান দেশকে দখলে রাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে রাজী করানো। আর তা হবে এ যুদ্ধকে ধর্মীয় যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে 'জেহাদের' শ্লোগানের মাধ্যমে।

ঐদিন ল্যাংলেতেই সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে কোন পশ্চিমা দেশ তথা আমেরিকা কোন ভাবেই সরাসরি জড়িত হবেনা এমনকি কোন গোপন অভিযানেও সৈন্য পাঠাবে না। অন্ততঃ ভিয়েতনামের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবার কোন প্রয়োজন নেই। এ সব রাশিয়া বিরোধীরা এমনিতেও আফগানিস্তানের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল। তারা জানত যে, এ দেশকে দখল করে রাখার নজির নেই। আর তাই রাশিয়াকে সহজে ছাড় দেয়া যাবেনা। রাশিয়াকে আফগানদের দিয়েই আস্তে আস্তে দুর্বল করে এ সাম্রাজ্যকে দ্রুত ভাঙ্গনের মুখে ঠেলে দিতে হবে। ততদিনে আমেরিকান সরকারের রুশ সাম্রাজ্যের পতনের সম্ভাব্যতা নিয়ে মোটেই সন্দিহান ছিলনা। এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি কার্টারের যোদ্ধার দল রাশিয়াকে রক্তক্ষরণের মধ্যমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার সর্বপ্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলমান মিত্র দেশগুলোর

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে প্রধান তিনটিকে বেছে নেয়া হয়েছিল যারা এ জেহাদে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেবে। অন্যদিকে কম্যুনিস্ট গণচীন যে নিজ স্বার্থে আফগানিস্তানে রুশ সমর্থিত সরকারের গোড়াপত্তনের পর থেকেই ইসলামিক সংগঠনগুলোকে, সিনজিয়াং এর উইগুড় মুসলমানদের মাধ্যমে সাহায্য শুরু করেছিল। চীনকেও জেহাদে সামিল করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। এ পর্যন্ত সরাসরি এবং পাকিস্তানের মাধ্যমে চীন প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ আফগান মুজাহিদের সরবরাহ করে আসছিল।

কার্টারের রুশ বিরোধী দল পাকিস্তান, মিশর আর সৌদী আরবের সাহায্য সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিতই ছিল। এ উপদেষ্টাদের এখন প্রয়োজন, এ যুদ্ধে তিনটি উপকরণের, অর্থ, জনবল আর অস্ত্রের নিশ্চয়তা। এগুলোর সমন্বয়েই এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে। প্রাথমিকভাবে সি আই এ (CIA) এবং পরে ধনী মুসলিম দেশগুলোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এরপরে রয়েছে জনবল। বেশীরভাগ যোদ্ধা আফগান আর পাকিস্তানের সীমান্ত থেকেই আসবে সে সাথে অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং বিভিন্ন স্থানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহ করে এ যুদ্ধের জনবল যোগাড় হবে। এযুদ্ধের জন্যে রাশিয়ার তৈরী অস্ত্র যোগাড় করে পরে এ ধরনের অস্ত্র তৈরী করবার উপযুক্ত দেশ খুঁজতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানের আফগানিস্তান সংলগ্ন স্থানগুলো উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছিল তাই সাব্যস্ত হল এর দায়িত্ব সি আই এ (CIA)'র তত্ত্বাবধানে আই এস আই (ISI) এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে। মোটামুটি এই ছিল সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের পরিকল্পনার মোটা দাগগুলো।

পরিকল্পনা মতই কার্টারের দলটি কাজে নেমে পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাদের মনে তখনও শঙ্কা রয়ে যায় যে, এ মধ্যযুগীয় দেশের সামান্য জনসংখ্যা পৃথিবীর বৃহত্তম সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা করে পরাজিত করতে পারবে কিনা। তবে এটা নিশ্চিত যে, পরাজিত না করতে পারলেও এদের (রাশিয়ার) অতিষ্ঠ করতে হয়ত পারবে। পারবে আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত থাকার বিপুল ব্যয়ভার বৃদ্ধি করতে। আর এটুকু উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারলেই রুশবাহিনীকে ঘায়েল করা যাবে।

পরিকল্পনা মোতাবেক ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৯ সনে কার্টার তার স্বভাবের পরিপন্থী কাজ করে বসল। আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ক্রেমলিনের নেতা লিওনার্ড ব্রেজনেভকে পত্র পাঠানো

www.nagorikpathagar.org

হল। এ পত্রে আফগানিস্তান থেকে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে সকল শরণার্থী দেশে ফেরৎ আনার মত পরিবেশ তৈরীর কথা জোর দিয়ে বলা হল।[১]

এ পত্র পাঠানোর কয়েকদিনের মধ্যেই মস্কো থেকে ব্রেজনেভের যে জবাব এল তাতে বলা হল, 'রুশ-আফগান একটি বিশেষ চুক্তির আওতায় রুশ সৈন্যদের সে দেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা আর সম্ভাব্য বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই রুশবাহিনী আফগানিস্তানে মোতায়েন করা হয়েছে। কাজেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চুক্তির অধীনে নেয়া দ্বি-পাক্ষিক কোন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তৃতীয় দেশের উদ্বেগের কোন প্রয়োজন আছে বলে মস্কো মনে করে না।' এ ছিল কড়া প্রতিবাদের কড়া উত্তর। এ উত্তর কার্টারকে প্রচণ্ডভাবে অপমানিত করে। ব্রেজনেভকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে বলে, 'সোভিয়েতদের এ ধরনের আচরণ আমার চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। আমার দায়িত্বকালে সোভিয়েতদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি এতটা ওয়াকেবহাল ছিলাম না যতটা এখন হয়েছি এবং আমার দায়িত্বকালীন সময়ে সোভিয়েত উদ্দেশ্য এত প্রকটভাবে উদ্ভাসিতও হয়নি।'[২]

এ উক্তির মধ্যদিয়েই সূত্রপাত হয়েছিল দশবছর ব্যাপী সোভিয়েত বিরোধী ছায়াযুদ্ধ। কার্টারের সম্মতি পেয়েই উৎসাহিত হয়ে ময়দানে নেমে পড়ে কার্টারের সোভিয়েত বিরোধী দল এদের নাম দেয়া হয় 'দি এটিম'। এ ছায়া যুদ্ধ যা পরে 'জেহাদে' পর্যবসিত হয়েছিল, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আরও পরে এসব 'জেহাদী' প্রথমে তাদের স্বীয় দেশে, পরে আমেরিকার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ 'জেহাদে' নেমে পড়েছিল যার জের এখনও চলছে। এ দশ বছরের (১৯৭৯-৮৯) সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের প্রতিটি পাতায় লেখা হয়ে থাকবে একদা 'জেহাদী' বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী বলে কথিতদের নাটকীয় উত্থান আর আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থানজনিত সংকট। আফগানিস্তানের বর্তমান সংকটের বীজও রোপিত হয়েছিল সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের মধ্য দিয়েই।

প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকানদের আশ্বস্ত করবার জন্যে কার্টার রাশিয়ার বিরুদ্ধে বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল অবাধ বাণিজ্যের উপর

১। Holy War Unholy Victory : P-43

২। ABC TV : Address to the nation by the President of USA, December, 29. 1979.

www.nagorikpathagar.org

নিষেধাজ্ঞা জারিকরণ, সাংস্কৃতিক বিনিময় স্থগিতকরণ, প্রস্তাবিত নতুন কনস্যুলেট স্থাপন স্থগিতকরণ আরও ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক দ্বি-পাক্ষিক কর্মকাণ্ড বাতিলকরণ ইত্যাদি। তদুপরি আমেরিকা শো অব ফোর্স হিসাবে 'রেপিড ডেভলপমেন্ট ফোর্স' পারশ্য উপসাগরে প্রেরণ করে, যদিও এ ফোর্স কখনই ব্যবহৃত হয় নি। আমেরিকা ঐ বছরেই মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক খেলাও বর্জন করে। অন্যদিকে এস এ এল টি-২ (SALT-2 : Strategic Arms Limitation Talks) চুক্তি আমেরিকান সিনেট কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় এটাকেও চূড়ান্ত পর্যায় স্থগিত করা হয়।

আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপগুলো মোটামুটিভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে যথেষ্ট বেকায়দায় ফেললেও তাতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত নীতির কোন তারতম্য হতে দেখা যায় নি। কার্টারের ব্যক্তিগত ইমেজ এবং হারানো জনসমর্থন কিয়দাংশে উদ্ধারের জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক অবরোধ যথেষ্ট ছিলনা। তাই ঐ একই সাথে ছায়াযুদ্ধের (Shadow War/Proxy War) প্রস্তুতিও চলতে থাকে।

ছায়াযুদ্ধের প্রস্তুতির প্রথম পর্বেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অগ্রগামী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনীয় আয়োজনের সমন্বয় করণ। এ সব উদ্দেশ্যেই কার্টার প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন দেশে সফর শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি হ্যারল্ড ব্রাউন চীন সফর করে। তার সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চীনের সমর্থন যোগানো। চীন এ যুদ্ধে আমেরিকার সাথে যোগ দেবার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত ছিল। শুধু তাই নয় চীনের নেতা দেংশিয়াও পিং মস্কোকে একটি উচিত শিক্ষা দেবার এ ধরনের একটি সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় নি। আর এ কারণেই এ যুদ্ধে আমেরিকা অবতীর্ণ হবার বহুপূর্বেই চীন পাকিস্তানের মাধ্যমে এককভাবে কাবুলের সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামিক মুজাহিদদের জেহাদে অস্ত্র যোগান দিয়ে আসছিল। চীন শুধু অস্ত্রই যোগান দিয়ে ক্ষান্ত হয় নি বরং সিনজিয়াং অঞ্চলে চীনেরই স্থাপিত ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সীমাপারে সোভিয়েতদের আনাগোনা এবং কর্মকাণ্ডের উপরে বহুদিন থেকেই নজর রেখে আসছিল। এসব খবর পরে সি আই এ (CIA) কে দেয়া হয়।

অস্ত্র ছাড়াও চীন আমেরিকার সাথে সুর মিলিয়ে রাশিয়াকে আফগানিস্তান

www.nagorikpathagar.org

পেশাওয়ার সেভেন বলে খ্যাত সাত আফগান মজাহিদ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ইসলামাবাদ চুক্তিতে স্বাক্ষররত।
পেছনে দণ্ডায়মান (বাঁ দিক থেকে ৮ নং) নওয়াজ শরিফ এবং সৌদী আরবের প্রিন্স তুর্কি (নওয়াজ শরিফের বাঁয়ে)
- মার্চ ৭, ১৯৯৩ - ইসলামাবাদ।

www.nagorikpathagar.org

উত্তরজোট এবং প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রব্বানীর সমর্থক আফগান ইতিহাসের প্রখ্যাত কমাণ্ডার প্রয়াত আহমেদ শাহ মাসুদ।

হেরাত অঞ্চলের প্রখ্যাত মুজাহিদ এবং প্রাক্তন গভর্ণর ইসমাইল খান।

আফগান শরণার্থী - ১৯৮২।

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক আফগান যোদ্ধা।

জনৈক তালেবান যোদ্ধা।

স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত
জনৈক আফগান মুজাহিদ।

সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে
টহলরত মুজাহিদ (১৯৭৯-৮৯)।

www.nagorikpathagar.org

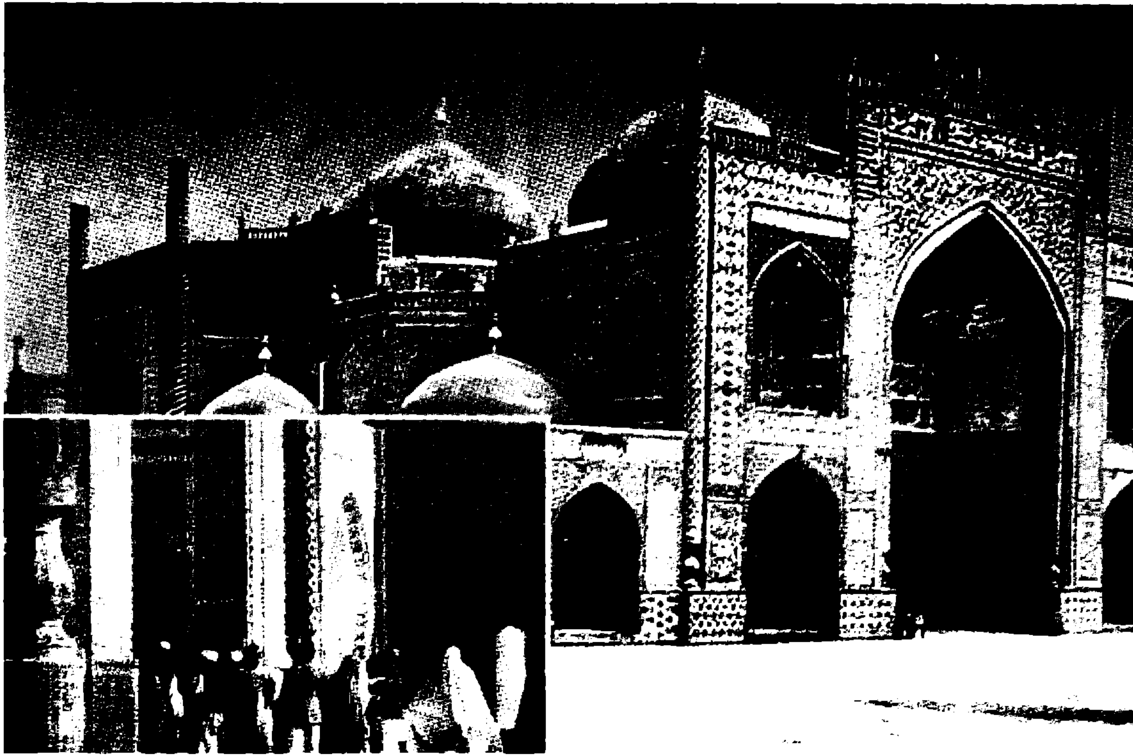

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর কথিত রওজা মোবারক।

www.nagorikpathagar.org

ছাড়াবার জন্য এক বক্তব্য জারী করে। স্মরণ করা যেতে পারে, চীনের সাথে আফগানিস্তানের সংযোগ মাত্র বিখ্যাত ওয়াখান কড়িডোরের মাধ্যমে রয়েছে। চীনের সাথে আফগানিস্তানের মাত্র পঞ্চাশ মাইল সীমান্ত রয়েছে। এ কড়িডোর বা সরু ভূখন্ডটির উত্তরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া আর দক্ষিণে পাকিস্তানের অবস্থান। এ ভূখন্ডটিই পরবর্তীতে চীনের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের এবং আরও পরে উইগুড় মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, চীনের এ প্রান্তের প্রদেশ সিনজিয়াং দিয়ে এবং পাকিস্তানের সিল্ক রুটের মধ্য দিয়ে এ দু'দেশের মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত স্থলপথ রয়েছে। আর এ স্থলপথ দিয়েই পাকিস্তানের পেশাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা অতি সহজ। চীন ইতিপূর্বে পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্যে অস্ত্রের সাহায্য শুরু করেছিল তা শুধু অব্যাহতই থাকে নি; বরং পরে এ সাহায্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অন্যদিকে চীনের সাথে সি আই এর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারেও আমেরিকার একরকম অলিখিত চুক্তি চূড়ান্ত হয়। এ সমঝোতার মাধ্যমে চীন সিনজিয়াং অঞ্চলেই সি আই এ-কে প্রয়োজনবোধে একের অধিক ভূ-উপগ্রহ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদান করে।

অপরদিকে আমেরিকার সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে একমাত্র প্রধান দেশ পাকিস্তানের সাথে সরকারী পর্যায়ে সহযোগিতার দ্বার উন্মোচনের জন্যে আমেরিকার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজেন্‌স্কি পাকিস্তানে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানের ফৌজি রাষ্ট্রপতি তখন তার সরকারের বৈধতার খোঁজে রত। এরই মধ্যে চীনের সাথে মিলে কাবুলে সোসালিস্ট সরকারের গোড়াপত্তন থেকেই মুজাহিদদের সাহায্য করে আসছিল। কাজেই জিয়াকে আমেরিকার স্বপক্ষে আনতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। তবুও জিয়া অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে আমেরিকার সাহায্য সহযোগিতার পরিধি নির্ণয় করে সাব্যস্ত করল যে, প্রথমতঃ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। এর সঙ্গতঃ কারণ হিসাবে যুক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রাশিয়া বিরোধী তৎপরতায় পাকিস্তানের সাথে রাশিয়ার সরাসরি যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনভাবেই খাট করে দেখা যাবেনা। আরও একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ কারণ হল, সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণাভিমুখি অগ্রযাত্রাকে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানকেই ঠেকাতে হবে। অপরদিকে ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরিতা তো রয়েছেই।

www.nagorikpathagar.org

সব মিলিয়ে সর্বপ্রথমে পাকিস্তানের নিজস্ব প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাটিই জিয়া গুরুত্ব দিয়ে আমেরিকার সামরিক সাহায্যের অঙ্গীকার আদায় করে। সে সাথেই পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কার্টারের গোপন সম্মতিও আদায় করার সম্ভাবনা। কাজেই সোভিয়েত বিরোধী ছায়াযুদ্ধে আমেরিকার পাকিস্তানকে যতখানি প্রয়োজন ছিল ততধিক ছিল জিয়ার প্রয়োজন। জিয়া চাচ্ছিল এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা আদায় করা।

এসব চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতেই প্রাথমিকভাবে আমেরিকা পাকিস্তানকে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। জিয়াউল হক পাকা খেলোয়াড়ের মত এ অর্থ পর্যাপ্ত নয় বলে প্রত্যাখান করে এ সাহায্যকে 'পিনাট' বা চীনাবাদামের সাথে তুলনা করে। এতে কার্টার মনক্ষুন্ন হলেও পরে এ সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়। জেহাদের মোট দশ বছর পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য অব্যাহত থাকে আর পাকিস্তান আফগান যুদ্ধে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা রয়ে যায়।

এযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আরও নির্ণয় হয় যে, আমেরিকা তথা সি আই এ (CIA) মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে অস্ত্র প্রদানের নির্ণয় ইত্যাদি আই এস আই (ISI) এর মাধ্যমে করবে। এ ব্যাপারে সি আই এ (CIA) সরাসরি কিছুই করবেনা। শুধু এখানেই শেষ নয়, জিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় যে, শুধু যুদ্ধ পরিচালনাই নয় বরং পরবর্তীতে কাবুলে সরকার গঠন পর্যন্ত পাকিস্তানের মতামতই হবে চূড়ান্ত। ঐ সময়ে আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে রাশিয়ার কবর রচনা করা-কাবুলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নয়। কাজেই জেনারেল জিয়াউল হকের কাবুল প্রীতির পরিপন্থী হতে আমেরিকার কোন আগ্রহই ছিলনা। আমেরিকা সেদিন সুবোধ বালকের মত হেডমাস্টার জিয়ার সামনে নত হয়ে দাঁড়ালো। আমেরিকার ঘাড়ে সওয়ার হয়েই জিয়া তার মৃত্যু পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে একটানা এগার বছর সামরিক শাসন চালিয়ে আফগান মুজাহিদদের নিকট মরণোত্তর 'মরদে মোমিন বলে' পরিচিত হয়ে রইল।

১৭ আগস্ট, ১৯৮৮ সনে জিয়া এবং আখতার আব্দুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যু এবং বিমান দুর্ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলনা। এ বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে পাকিস্তানে এবং আফগান মুজাহিদদের মধ্যেও প্রচণ্ড সন্দেহ প্রকাশ করা

www.nagorikpathagar.org

হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দুর্ঘটনায় কাকতালীয় ঘটনায় আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত রাফায়েল এবং সামরিক এটাচে কর্নেল ওসামও ছিল। এ দুর্ঘটনা ঘটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানজুয়ার বিতর্কিত জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষর এবং পরে জিয়া কর্তৃক জানজুয়াকে অপসারণের কয়েক মাস পরে।

জিয়ার বিমান, পাক-১ এর দুর্ঘটনার তদন্তের পূর্ণ বিবরণ বের না হওয়ায় জনমনে প্রচুর সন্দেহ জাগতে থাকে কারণ এর পূর্বেও জিয়ার উপরে পাঁচবার হামলা হয়েছিল এমনকি একবার তার পরিবহন সি-১৩০; পাক-১ এর উপরে মিসাইল হামলাও হয়েছিল। প্রথম সন্দেহ করা হয় ভারতীয় RAW (RAW : Research & Analysis Wing) এবং আফগান KHAD নামক গুপ্তচর সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসকে। একাধারে রাশিয়ান KGB কেও সন্দেহ করা হয়। সর্বশেষ CIA ও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যায় নি। এর প্রধান কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় বিমান উড্ডয়নের সাথে সাথে চারজন বৈমানিক ও নেভিগেটর নার্ভ গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। আর সেটাই যদি সত্য হয় তবে এধরনের গ্যাস পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে পৌঁছানো থেকে শুরু করে প্রয়োগ পর্যন্ত সমস্ত গোপন তৎপরতা পরিচালনা একমাত্র CIA অথবা KGB দ্বারাই সম্ভব। আর CIA যদি হয় তবে তাতেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারের হাত থাকতে হতো। এ সূত্র ধরেই জিয়ার মৃত্যুর পূর্বের কিছু ঘটনার উল্লেখ অনেক ভাষ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকার তৈরী যে Tank এর মহড়া দেখতে জিয়া ভাওয়ালপুরে গিয়েছিল সেটা ছিল তার জন্যে অত্যন্ত কম তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। ঐ মহড়ার জন্যে প্রায় সপ্তাহখানেক আগে থেকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাসের সামরিক এটাচে পরে মেজর জেনারেল মোহাম্মদ দুররানী বারংবার জিয়াকে মুলতানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করায় অবশেষে আগস্ট ১৪, ১৯৮৮ সনে জিয়া সম্মতি দেয়। দুররানী আমেরিকার তৈরী এম-১ ট্যাংক খরিদ করবার ব্যাপারটি নিয়ে পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এ Tank পাক সেনাবাহিনীর জন্যে কার্যকর নয় বলে প্রত্যাখান করা হয়েছিল।[৩]

আমেরিকার আরনল্ড রাফায়েল পাক রাষ্ট্রপতির অনুরোধেই তার নিজের

৩। Brigadier Mohammad Yousuf & Major Mark Adkin ;
'The Bear Trap Afganistan's Untold Story' : P- 11-12.

www.nagorikpathagar.org

বিমান ছেড়ে জিয়ার সফরসঙ্গী হয়। আর তা ছাড়া CIA এর কোন কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রদূতের জানবার কথা নয় এবং সচরাচর জানানোও হয় না।

যাই হোক হয়ত সবই কাকতালীয় ব্যাপার আর না হয় জিয়া আভ্যন্তরীণ অথবা আর্ন্তজাতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছিল। তবে জিয়ার মৃত্যুর পূর্বের এক বছর থেকেই আফগান সমস্যা নিয়ে জিয়ার সাথে আমেরিকার মতভেদ বেড়ে চলছিল। এক পর্যায় তা ঠাণ্ডা লড়াইতে পরিণত হয়েছিল বলে প্রকাশ। যদিও জিয়া আর আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন আফগান নীতি পরিবর্তিত হয় নি তবে আফগান মুজাহিদরা জিয়ার অনুপস্থিতি অনুভব করেছিল বহু বছর।

ব্রেজন্স্কি, জিয়ার মধ্যে একজন অত্যন্ত গোড়াপন্থী জেহাদী সমর নায়কের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে আশ্বস্ত হল যে, জিয়া রাশিয়ার এহেন কর্মকাণ্ডকে শুধু ঘৃণাই করে না; বরং প্রয়োজন হলে এ যুদ্ধ রাশিয়ার অভ্যন্তরে নিয়ে যেতেও সম্মত হবে। আর রাশিয়াকে নাস্তানাবুদ করতে হলে আফগানিস্তান থেকেই সূচনা করতে হবে। ব্রেজন্স্কির প্রথম সফর অতি নাটকীয়ভাবে শেষ হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে খাইবার গিরিপথ ধরে পাক-আফগান সীমান্তের তোরখাম নামক সীমান্ত চেকপোস্ট এ পৌঁছে ব্রেজন্স্কি সোভিয়েত বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

ব্রেজন্স্কি কয়েকজন বিখ্যাত খাইবার গার্ডের সদস্যদের সাথে হালকা কথোপকথনের ফাঁকে একজনের হাত থেকে একটি রাইফেল নিয়ে আফগান সীমান্তের দিকে তাক করে স্মিত হেসে সঙ্গের সাংবাদিকদের দিকে ইশারা করে। উপস্থিত সাংবাদিকদের সেদিন বুঝতে দেরী হয় নি যে, আমেরিকা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বৃহৎ, ব্যয় বহুল এবং সুদূরপ্রসারী ইসলামিক জেহাদের সূচনা করছে। আমেরিকার অনুসৃত এ জেহাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব যুদ্ধ শেষ হবার পর ভিন্নরূপ ধারণ করে খোদ আমেরিকাকেও দহন করবে এ কথা হয়ত সেদিন কারও মনে উঁকিও দেয় নি।

ছায়াযুদ্ধের এ প্রস্তুতিপর্বে আমেরিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিশ্বের অন্যতম ধনী মুসলিম দেশ তথা ইসলামের পবিত্র দুটি মসজিদের খেদমতগার বলে পরিচিত এবং ইসলামের জন্মস্থান, সৌদী আরবের সক্রিয় সহযোগিতার। সৌদী আরবের নৈতিক এবং আর্থিক সাহায্য ছাড়া এ লম্বা ছায়াযুদ্ধ পরিচালনা করা

www.nagorikpathagar.org

অত্যন্ত কঠিন হবে তাতে কোন সন্দেহ ছিলনা। সৌদী আরবের সাহায্য সহযোগিতা আমেরিকার নিকট অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঐ সময় সৌদী আরবের রাজকীয় সরকারে রাজবংশের অনেক রাজপুত্রদের মধ্যে মাত্র তিনজন দেশের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে পরিগণিত হতো। প্রয়াত বাদশাহ আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর থেকেই এ তিনজন সমষ্টিগতভাবে দেশ শাসন করে আসছিল। এরা ছিল, তৎকালীন হবু বাদশাহ একাধারে প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ; কমান্ডার ন্যাশনাল গার্ড এবং যুবরাজ (Crown Prince) সুলতান বিন আব্দুল আজিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খালেদ বিন আব্দুল আজিজ (১৯৮১ সনে খালেদ মারা গেলে ফাহাদ সৌদী আরবের বাদশাহ হয়)।

সে সময়ে যে কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয় অথবা যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় এদের মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। আফগানিস্তানে মস্কোপন্থীদের ক্ষমতা দখল এবং সোসালিজমকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় রত সোভিয়েত রাশিয়ার এতদঅঞ্চলে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সৌদী আরর সংকিত হয়ে পড়ে। সৌদী আরবের ধারণায় সোভিয়েত পন্থীদের সম্প্রসারণবাদের পরবর্তী ঠিকানা হবে ইরান। এমনটা হলে গোটা মধ্যেপ্রাচ্যে এক নিদারুণ সংকটের সৃষ্টি হবে বলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এর যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানের পি ডি পি এ (PDPA) সরকার কর্তৃক তেহরানে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত ডাঃ নজিবুল্লাহ্‌কে এবং রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কে জি বি'র (KGB) সদস্য বলে সনাক্ত করে এবং তার সাথে ইরানের নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট সংগঠন তুদেহপার্টির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও এক গোপনীয় রিপোর্ট দিয়েছিল। গোয়েন্দা রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, তুদেহপার্টির মাধ্যমে ইরানের অভ্যন্তরে গোলযোগ ছড়াবার জন্য রাশিয়া কর্তৃক ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নজিবুল্লাহ্‌কে দেয়াও হয়েছিল।[৪] সৌদী সরকার ভাল করেই অবগত ছিল যে, উপসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার সম্ভাব্য বন্দর স্থাপন করতে হলে অবশ্যই ইরানকে প্রয়োজন হবে। সৌদী সরকার আরও জ্ঞাত ছিল যে, রাশিয়া উজবেকিস্তানের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের মাজার -ই-শরিফ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইনের সংস্কারে হাত দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ রেল সংযোগ হেরাত হয়ে দক্ষিণে সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

৪। হোলী ওয়ার আনহোলী ভিক্টোরি : পৃ : ১৮।

www.nagorikpathagar.org

এসব কারণেই সৌদী সরকার ১৯৭৩ সনে আফগানিস্তানে দাউদ সরকারের গোড়াপত্তনের পর থেকেই মুজাহিদদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ইরান এবং পাকিস্তান উভয়কেই আর্থিক সাহায্য দেয়া শুরু করেছিল যা পরেও অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানে প্রথমে জুলিফাকার আলী ভুট্টো পরে জিয়াউল হকের আবেদনেই এ জেহাদে আমেরিকার অন্তর্ভুক্তির পূর্ব থেকেই সৌদী আরব সম্পৃক্ত ছিল। এ কারণেই আমেরিকার সৌদী সমর্থন আদায় করতে বেগ পেতে হয় নি; বরং আমেরিকার অনুরোধে প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে সৌদী আরব 'জেহাদের' ফাণ্ডে সি আই এ'র (CIA) ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ আর অস্ত্রায়নের জন্যে দান করে। আমরা আরও পরেও দেখব যে, পরবর্তী পর্যায়ে এসব অনুদান কিভাবে বেসরকারী পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওসামা বিন লাদেন এ জেহাদের মধ্য দিয়েই সমগ্র বিশ্বে বিশেষ কারণে পরিচিত হয়। আফগান জেহাদই ওসামার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়।

আমেরিকার তালিকায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশটি ছিল মিশর। মিশর যুগে যুগে শুধু আরববিশ্বেই নয় সমস্ত ইসলামিক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে সনাক্ত হয়ে আসছে। মিশরের ইসলামিক বিদ্যাপিঠ, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের জ্ঞান পীঠের মধ্য শ্রেষ্ঠ বলেই সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ প্রভাব রয়েছে ইসলামিক বিশ্বে। মিশর থেকেই মুসলিম ব্রাদারহুড (ইকওয়ান) মুভমেন্ট শুরু হয় যার প্রভাব গিয়ে ঠেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। এক কথায় মিশরের ইসলামিক মুভমেন্ট এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের আদলে গড়ে উঠে বহু গোপন সংগঠন। এসব সংগঠন প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্পে লালিত। এর প্রভাব একবিংশ শতাব্দীতেও শেষ হবে বলে মনে হয় না।

মিশরে তখন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার এল সাদাতের সরকার। সাদাত আমেরিকার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে পরিচিত। সাদাত তার পূর্বসূরী আরব বিশ্বের কিংবদন্তী নেতা গামাল আবদুল নাসেরের স্থলাভিষিক্ত হবার পর থেকেই নিজের একটি আলাদা ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার চেষ্টায় রত ছিল। তার তখন একমাত্র প্রয়াস ছিল নাসেরের প্রতিচ্ছবি ডিঙ্গিয়ে আরব বিশ্বে তার একটি স্বতন্ত্র স্বত্বা প্রতিষ্ঠা করা। আনোয়ার সাদাত ১৯৭৩ সনের যুদ্ধের সাফল্যের পর নিজের

www.nagorikpathagar.org

ইমেজ মিশরীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এ যুদ্ধে প্রথম বারের মত মিশরীয় বাহিনী ইসরায়েল কর্তৃক অধিকৃত ভূমির কিঞ্চিত উদ্ধারে সক্ষম হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯৭২ সনে মিশর থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সেনা বিশেষজ্ঞদের দেশ ছাড়া করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯৭৩ সনের যুদ্ধের পরপরই মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতায় সাদাত মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়। আনোয়ার সাদাত সমগ্র আরব বিশ্ব তথা বাকী বিশ্বকে ইসারায়েলে তার ঐতিহাসিক সফরের মধ্য দিয়ে চমকে দেয় (নভেম্বর ১৯-২০, ১৯৭০)। এর পরে পরেই ১৯৭৮ সনে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে আরব বিশ্বে কট্টরপন্থীদের কাছে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, ইসরায়েল সফর বিদেশে সমাদৃত হলেও মিশরের গোঁড়াপন্থী মুসলানদের খুব একটা খুশী করতে পারে নি। তবুও সাদাত তখন পর্যন্ত আটককৃত ইসলামপন্থীদের জেল থেকে বের করে এবং মুসলিম ব্রাদারহুড এর উপর থেকেও নিষোধাজ্ঞা তুলে নিয়ে নিজেকে এসব ইসলামপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে ওঠে। সাদাত আল আজহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম উগ্রবাদী বলে পরিচিত দলের সমর্থন জোটাতে বেশী ব্রতী হয়ে উঠে, বিশেষ করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের পর। কাজেই সঙ্গতঃ কারণেই এবং আমেরিকানদের সাথে নৈকট্যের জন্যেই সাদাত আফগান জেহাদে অত্যন্ত অগ্রহী হয়ে পড়ে। তারই উৎসাহে মিশরীয়রা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আফগান মুজাহিদদের পাশে দাঁড়িয়ে জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে সি আই এ (CIA) এবং আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে পাকিস্তানের পেশায়ারে জমায়েত হতে থাকে। এ প্রক্রিয়া সাদাতের উত্তরসূরী বর্তমান রাষ্ট্রপতি হুসনে মোবারক পর্যন্ত বহাল থাকে। সঙ্গত কারণেই এ জেহাদে মিশরে কট্টরবাদী ইসলামী সংগঠনগুলো রিক্রুট জোগাড় এবং তাদের জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর তাই আফগান জেহাদে আরব মুজাহিদদের মধ্যে মিশরীয়দের নেতৃত্বের সংখ্যাই ছিল বেশী।

আর একটি দিক থেকে মিশর এ জেহাদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হল রাশিয়ার অরিজিন (Origin) অস্ত্রের উৎপাদন এবং এগুলোকে পাকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। প্রথমে রাশিয়া প্রদত্ত পুরাতন অস্ত্র মিশর থেকে

www.nagorikpathagar.org

সরাসরি আমেরিকার সি-১৩০ বিমানযোগে পেশাওয়ার পাঠানোর মধ্য দিয়ে এবং পরে ষাটের দশকে রাশিয়া কর্তৃক স্থাপিত কায়রোর বাইরে পরিত্যক্ত কারখানাগুলোকে পুনরায় চালু করে বিপুল অস্ত্র উৎপাদন করে সমুদ্র পথে করাচীতে চালান দেয়। অবশ্য এ পর্যায়ে এসব অস্ত্র সি আই এর অর্থেই উৎপাদিত হচ্ছিল। মজার বিষয় হল প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরায়েলও মিশরের মাধ্যমে ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সনের আরব ইসরায়েল যুদ্ধে বাজেয়াপ্ত রুশ অস্ত্রগুলোও আফগান জেহাদে পাঠায়।

যে সব অস্ত্র মিশরে তৈরী হয়ে মুজাহিদদের হাতে পৌঁছে তার মধ্যে একে -৪৭, আর পি জি (RGP), এস এ-৭ (SA-7) এবং ১২২ মিঃ মিঃ কামানও ছিল। সে সাথে যোগান দেয়া হয়েছে কয়েক হাজার টন এম্যুনিশন এবং লক্ষ লক্ষ স্থল মাইন ও বারুদ (explosive)। আফগান যুদ্ধের সমগ্র সময় জুড়ে কত অস্ত্র উৎপাদন করা হয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুস্কর। তবে একটি পরিসংখ্যানের উদাহরণ দেয়া যায় আর তা হল প্রায় ছয় মিলিয়ন একে -৪৭ রাইফেল মিশরে তৈরী করা হয়েছিল আফগান জেহাদে যোগান দেবার জন্যে।

মিশরকে আমেরিকার সাথে যুক্ত করতে এবং জেহাদে অংশীদার করতে ব্রেজেন্স্কির কোন বেগই পেতে হয় নি। ব্রেজেনস্কি পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে কায়রোতে আনোয়ার সাদাতের সাথে সাক্ষাৎ করে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে সাহায্য চাইলে সাদাত বিনা শর্তে সম্মতি জানায়। ইসলামপন্থীদের তুষ্ট করবার এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাদাত কট্টরপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। ১৯৭৩ সনের আরব ইসরায়েল যুদ্ধের স্মরণে আয়োজিত কায়রোর সেন্ট্রাল প্যারেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজ চলার সময়ে, আক্টোবর ৬, ১৯৮১ সনে মিশরীয় সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য, লেফটেনেন্ট খালেদ ইস্তাম্বুলির ইশারায় আনোয়ার সাদাতকে ইয়াহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অপরাধে গুলী করে হত্যা করা হয়। সাদাতের হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মুসলিম ব্রাদারহুডের এবং এর অঙ্গ সংগঠন আল জিহাদকে সাদাতের উত্তরসূরী রাষ্ট্রপতি হুসনে মোবারক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রায় ৩০৩ সদস্যকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করে। এদের মধ্যে এ হত্যার নায়ক বলে কথিত খালেদ ইস্তাম্বুলি সহ অনেকজনকে ফাঁসী দেয়া হয়। অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ

www.nagorikpathagar.org

মামলায় প্রয়োজনী স্বাক্ষীর অভাবে অনেককে মুক্ত করলেও তাদের উপরে গোপন সংস্থার কঠোর নিরীক্ষণ অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায় এদের অনেকে সি আই এ (CIA) কর্তৃক পরিচালিত আফগান জেহাদে যোগদান করে এবং বর্তমানে আল-কায়দার সদস্য বলে পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে। ২০০১ সনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত সন্ত্রাসীদের তালিকায়ও এদের অনেকের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ডাঃ আই মেন আল জাওয়াহিরি, যার সাথে আমরা পরিচিত আর অন্যজন খালেদ ইস্তাম্বুলির ভাই ইবনে আল সাইখ আল লিবি।[৫] এ সময়ে এ দু'টি নাম পশ্চিমা বিশ্ব তথা আমেরিকার জন্যে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশগুলোও পরোক্ষ সহযোগিতা করে যার মধ্যে ব্রিটেনের নামও রয়েছে। আর পরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো থেকে স্বেচ্ছাসেবকের দল আফগানিস্তানের ইসলামী জেহাদে অংশগ্রহণ করে। আফগান জেহাদের প্রস্তুতি পর্বে প্রধান হোতা হিসেবে যে সমস্ত বিশ্ব নেতৃত্ব আর ব্যক্তিত্বের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে তারা হল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার, মিশরের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জেনারেল জিয়াউল হক এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী দেং শিওয়াওপিং।

আমেরিকা ও তার জেহাদী মিত্রদের প্রস্তুতি শেষে এখন প্রশিক্ষণ এবং রিক্রুটিং এর পালা। ১৯৭৯-৮৯ সন পর্যন্ত আফগান জেহাদের চালিকা শক্তি ছিল আমেরিকার সি আই এ (CIA)। সমর্থনে ছিল মিশর, সৌদী আরব আর চীন এবং মূল পরিচালনায় ছিল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন আই এস আই। এর পরে ১৯৮৯ সনে সোভিয়েত বাহিনীর অপসারণের পরপরই জেহাদের প্রথম পর্ব শেষ হয়। আমেরিকা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি পাকিস্তানের এবং মুজাহিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আফগানিস্তান নামক ভূখন্ডকে ভুলে যায়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৮৯-৯১ সনে চলে দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্ব চলে কাবুলে মস্কোপন্থী সরকারের পতন পর্যন্ত। এ সময়টিতে জেহাদ পরিচালিত হয় বেসরকারী অর্থায়নে এবং আই এস আই এর তত্ত্বাবধানে। তিন বছর, মানে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত মুজাহিদদের মধ্যই চলে ক্ষমতা দখলের লড়াই। এর পরের অধ্যায়ে তালেবানদের উত্থান।

---

[৫] ইাবনে সাইখ আল লিবি ডিসেম্বর ২০০১ এ পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়ে কিউবাতে আমেরিকার হাতে বন্দী রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার সি আই এ (CIA) দ্বারা পরিচালিত দশ বছরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী অ-আফগান জেহাদীদের পূর্ব কার্যকলাপ এবং পরিচিতির প্রেক্ষিতে জেহাদের সমাপ্তির পর এদের অনেকেই পূর্বসংঠনে অথবা নতুন জেহাদী সংগঠনগুলোত যোগ দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই নিজের দেশে ফিরে গিয়ে পুনরায় আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার চাপে পড়ে দেশত্যাগী হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলমান 'জেহাদে' অংশগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বসনিয়া, চেচনিয়া, মধ্যএশীয় অঞ্চল এবং কাশ্মীরে আফগান ফেরত জেহাদীদের অংশগ্রহণ। অনেকে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দায় থেকে যায়। এদের কার্যকলাপের কারণে বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় কট্টরবাদের দ্রুত উত্থান হতে থাকে। এরা সবাই আফগান জেহাদের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আজকের বিশ্বের অবস্থা অনুধাবন করতে হলে আফগানিস্তানে রুশ বিরোধী 'জেহাদের' অধ্যায় জানবার প্রয়াস নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ জেহাদ এবং জেহাদের পরবর্তীতে ইসলামিক বিশ্বের পরিবর্তিত আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত কার্যকলাপ আর সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর কথিত সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপট।

www.nagorikpathagar.org

দশ বছরের জেহাদের খতিয়ান

'জেহাদের ডাকে সাড়া দেয়া প্রতিটি মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য।'

কাবুল, অক্টোবর ৭, ২০০১ : সন্ধ্যা আটটা বেজে বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে গেছে। তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুতাওয়াক্কিলের বাসার সামনে প্রায় দেড়টন ওজনের দুটি টয়োটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। একটির পেছনে কিছু জিনিসপত্র ভর্তি আর সামনে কেবিনে বসা অন্য আরেক জন আফগান যার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মুতাওয়াক্কিলকে বের হতে দেখে গাড়ী থেকে নেমে কোলাকুলি করে তাকে পাশে বসিয়ে পেছনের গাড়ীতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে দ্রুত বাড়ীর সীমানা থেকে গাড়ী দুটো বেরিয়ে পড়ল। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হল মোল্লা আমীর খান মুতাওয়াক্কি-তালেবান সরকারের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। কিছুক্ষণ আগেই তার সাথে কথা হয়েছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। পুরো তালেবান মন্ত্রিসভা এবং সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান ছাড়তে অথবা সাবধান হতে বলা হয়েছে কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 'কাফের বুশ আর ব্লেয়ারের হামলা শুরু হবে কাবুল, কান্দাহার সহ জালালাবাদে।'

মুতাওয়াক্কিকে হাসি এবং দুঃখ দুটোই যেন একসাথে চেপে ধরে। তার জীবনের অর্ধেকটাই কাটিয়েছে যুদ্ধে আর হামলার মধ্য দিয়ে। তবে এবার হয়ত একটু অন্যরকম হবে। শত্রুর সহজে হয়ত দেখা পাবেনা। দুঃখ পায় শহরগুলো ধূলোয় মিশে যাবে বলে। দুঃখ পায় কাবুলের শত দরিদ্র লোকগুলোর জন্যে এদের জীবনে আর শান্তি হলনা। যুদ্ধের মধ্যেই এদের জন্ম হয়েছে যুদ্ধের মধ্যেই এরা মারা যাবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কিছুটা ভাবের আদান প্রদান করে মুতাওয়াক্কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কথা তুললে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংকেতে উপরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছে। বিধর্মীদের সাথে পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে হাত মিলিয়েছে। না মিলিয়েই বা তার উপায়

www.nagorikpathagar.org

কি। তার ফৌজত আমাদের হয়ে লড়তে পারবেনা। আর তা ছাড়া পাকিস্তানকে হারাতে হবে অনেক কিছু সে ভয়ত আমাদের নেই। আমাদের হারাবার কোন ভয় নেই তবে আল্লাহর কসম আমরা পিছপা হচ্ছিনা। অন্ততঃ যত দিন আমীরুল মোমেনীন ঠিক থাকে।' দুটো গাড়ীই কাবুল ছেড়ে কিছুটা পাহাড়ী পথ ধরে কান্দাহারের পথে রওনা হল। পেছনে কাবুলের বাতিগুলো টিম টিম করছে। দুটো গাড়ীই সামান্য পাকা রাস্তা দিয়ে চলে মাঠের মধ্যের ইট পাথরের রাস্তা দিয়ে একটি পাহাড়ের পাশে ছোট মাটির ঘরের সামনে যখন থামল তখন দুটো টমাহক মিসাইল কাবুলের শহর থেকে একটু উত্তরের মিলিটারি ব্যারাকের উপরে আঘাত হানলে প্রচণ্ড শব্দ করে আগুনের লেলিহান শিখা উপরের দিকে দাউ দাউ করে উঠলো। মোল্লা মুতাওয়াক্কি মুচকি হাসল। তার হাসির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যে জায়গাটিতে ঘটা করে এত দামী মিসাইল দুটো আঘাত হেনেছে সে ব্যারাকটি তৈরী করা হয়ছিল রাশিয়ার এয়ার এসল্ট ডিভিশন আর মোটর রাইফেল ডিভিশনের যোগাযোগ কেন্দ্র সহ দুটি সদর দপ্তর আর মোটর রাইফেল ডিভিশনের যোগাযোগ কেন্দ্র আর সৈনিকদের বাসস্থান। তালেবান সৈন্যরা বহু আগেই ঐ সব জায়গা খালী করে গেছে। ঐ দুই সদরের আশেপাশে এখনও প্রায় পঞ্চাশটি টি-৬৯ ট্যাংক অচল অবস্থায় দণ্ডায়মান। মুতাওয়াক্কি তাকিয়ে থাকতেই একই জায়গায় আরও চারটি মিসাইল এসে আঘাত হানে তার পরে পরেই আসে বি-১ আর বি-২ বোম্বার। তালেবান সৈন্যরা দূর পাহাড় থেকে বেশ কিছু বিমান বিধ্বংসী কামান ছুড়তে থাকে। মুতাওয়াক্কি আবার মুচকি হাসি দিয়ে বলল 'বেওকুফ'। দূরে তখন কোন গ্রাম থেকে এশার আযান ভেসে আসছিল।

মুতাওয়াক্কি তার মেহমানের সাথে নামাজ শেষে সামান্য আহার সেরে পাশাপাশি দুটো চারপাইতে শুয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ নিতে নিতেই শুনতে থাকে ঐ একই জায়গা এবং তার আশেপাশে ক্রমবর্ধমান বোমার আওয়াজ আর উল্লাসে ফেটে পড়া তালেবানদের উৎসব মুখর পরিবেশে বিমান বিধ্বংসী কামান দাগার শব্দ। মন্ত্রী মুতাওয়াক্কি ভেবে পুলকিত হয় যে, তার দেশের ইতিহাসের পাতা আবার সমৃদ্ধ হওয়া শুরু করেছে। মাত্র ১১ বছর আগেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে রাশিয়াকে প্রায় ত্রিশ হাজার মৃতদেহ ফেলে রেখে আফগানিস্তান ছাড়তে হয়েছিল আর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী আর ধনী দেশ, আফগানিস্তানের একালের বন্ধু, আমেরিকা

www.nagorikpathagar.org

এবার দিক পরিবর্তন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আফগান ইতিহাস সমৃদ্ধ হতে চলেছে পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন অধ্যায় সংযোজনের মধ্য দিয়ে।

আফগানিস্তান পৃথিবীর চোখে সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ হতে পারে তবে 'বুজদিলদের' দেশ নয় আর তাই মুতাওয়াক্কি গর্ববোধ করে। বিগত শতাব্দী অথবা আগামী শতাব্দীতেও হয়ত এমন কম দেশেই হবে যেটি মাত্র এগারো বছরের মাথায় দু' দু'বার দু'দুটি পরাশক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন আগেই কান্দাহারে 'আমীরুল মোমেনীন' বলেছিল 'আমৃত্যু যুদ্ধ করে যাব তবে ভীরুদের কথা শুনতে রাজী নই।' মুতাওয়াক্কি শুনেছে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ প্রায় সারাদিন তার রাজধানীর বাইরে ছিল। মুতাওয়াক্কির আজ অনেক কথাই মনে পড়ে আফগান ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতা থেকে। ১৯৮০ সনের মাঝামাঝি সে যখন মৌলভী ইউনুস খালিসের হিজব-ই- ইসলামী (খালিস) পার্টিতে মুজাহিদিন গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার তখন থেকেই একটি জিনিসে দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছে তা হল মৃত্যুর আগে মৃত্যু নেই। ঐ সময় সমগ্র আফগানিস্তানে রুশদের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ছাড়াও প্রায় ১,১০,০০০ সদস্যের বিশাল সৈন্য বাহিনী মোতায়েন ছিল। অনেকের কথা আজ তার মনে পড়ছে, মনে পড়ে কমান্ডার আব্দুল হক, জালালুদ্দিন হাক্কানী, আব্দুল কাদের ওয়ারদাক এবং মোল্লা মালাং এর মত জেহাদীদের। তবে দুঃখও পায় যে, এতো বড় বড় সব নাম, যাদের বীর গাঁথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে তারা দেশ শত্রু মুক্ত হবার পরপরেই ক্ষমতা আর অর্থের লোভে চরিত্রকে কুলসিত করতে কুন্ঠা বোধ করে নি। যে আদর্শ আর আত্মত্যাগ নিয়ে একদা হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল এসব নামকরা কমাণ্ডাররা সে আদর্শের বাস্তবায়ন তো করতে পারেই নি বরং দেশকে চরম বিশৃখলার মধ্যে ঠেলে দিয়ে এ জঘণ্য গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। এসব আদর্শচ্যুত কমাণ্ডার আর নেতাদের জন্যে আজ মুতাওয়াক্কি আর মুতাওয়াক্কিল বা মোল্লা ওমরের মত সাধারণ জেহাদীদের উত্থান। তালেবানরা অন্ততঃ দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাড়ি দেয় নি। তারা অল্প শিক্ষিত হতে পারে তবে দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ নয়।

মুতাওয়াক্কি মৌলভী ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামীর সামান্য তরুণ যোদ্ধা হিসেবে কমাণ্ডার আব্দুল হকের সাথে সুপরিচিত ছিল। আব্দুল হককে

www.nagorikpathagar.org

সে বেশ শ্রদ্ধাও করত। আজ সেই আব্দুল হক তালেবানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার হয়ে জহির শাহের পক্ষে কাজ করছে বলে শোনা যায়। অন্যদের মত মুতাওয়াক্কিও শুনেছিল সে আব্দুল হক গৃহযুদ্ধের সময় কাবুলের আইনের শাসন রক্ষার দায়িত্ব থাকার সময়েই দেশ ত্যাগ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যায় এবং আমেরিকার সি আই এ (CIA) এর সাথে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখে। পাকিস্তানের পেশাওয়ারে তার একটি বাড়ী রয়েছে এবং আরকেটি বাড়ী রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।

এই আব্দুল হক জন্মসূত্রে নানগাহার প্রদেশের একজন খ্যাতিমান মুজাহিদ এবং কাবুল এলাকায় তার সাহসিকতার জন্যে সাধারণ মুজাহিদরা তাকে সিংহের সাথে তুলনা করত। সে সব দিনগুলোর কথা আজ মনে পড়লে মন বিষন্ন হয়ে ওঠে। এসব নামকরা যোদ্ধারাই দেশকে এধরনের পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৮০-১৯৮২ সনের মধ্যে আফগানিস্তানে সোভিয়েত কমাণ্ডে সেনাবাহিনী ছাড়াও ২৮১ টি বিভিন্ন ফাইটার এয়ার ক্রাফট, ২৪ টি ইলিশিয়ান -২৮ বোম্বার, ২২০ টি হেলিকাপ্টার (৪৮ টি গানশিপ সহ) ৭৬ টি পরিবহন বিমান সহ বিরাট এক বিমান বাহিনীর বহর আফগানিস্তানে ছিল। আর এবস জঙ্গী বিমানগুলো প্রায়ই অদল বদল করা হতো তুর্কমেনিস্তানের বেসগুলো থেকে।[১] এখনও বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর বিমান বিকল হয়ে বিভিন্ন রানওয়েতে পড়ে রয়েছে। মুতাওয়াক্কি মনে করতে পারছেনা কবে তার হাতে ৩০৩ রাইফেলের পরিবর্তে ক্লাসনিকভ রাইফেল এসেছিল যার একটা আজও তার কাছে রয়েছে। একে -৪৭ ক্লাসনিকভ এবং আর পি জি-৭ দিয়ে রুশ স্পেশাল ফোর্স 'স্পেটজানস' এর বহু সদস্যকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে তার হিসেবে সে রাখে নি।

মুতাওয়াক্কির মনে আছে সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজেন্স্কি লান্ডিকোটাল অঞ্চলে ১৯৮০ সনের প্রথম দিকে এসেছিল তার পরে পরেই মুজাহিদদের হাতে প্রচুর অস্ত্র আসতে শুরু করল আর সে সাথে আফগান মুজাহিদদের সাতটি দলকে পুনঃগঠন করে তাদের অনেককে কান্দাহারের দিকে পাঠানো হয়েছিল। এ কান্দাহারের কাছেই এক সময় সেও মক্তব শেষ করে কলেজে পড়া শুরু করেছিল মাত্র।

যে কয়টি মুজাহিদ দলকে পুনঃগঠন করে 'জেহাদের' প্রধান সারিতে আনা

১। Afghanistan Wars 1839-1992 P. P. 121-123.

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল তাদের কে সংক্ষেপে 'পেশাওয়ার -সেভেন' বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারণ সমস্ত মুজাহিদদের পরিচিতি প্রধানত এ গ্রুপের মধ্যেই ছিল বেশী। এগুলো ছাড়াও ইরান সমর্থিত আরও বেশ কতগুলো ছোট ছোট দল আফগানিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত জারাঞ্জ, ফারাহ্ আর হেরাতের দিকেই সক্রিয় ছিল। এদের বেশীর ভাগই ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুজাহিদ। এ সাতটি আফগান মোজাহিদদের দল ছাড়াও আরব স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যদের নিয়ে জালালাবাদ আর কান্দাহার এলাকায় 'এরাব লিজন' (Arab Legion) অথবা '৫৫ ব্রিগেড' বলে অ-আফগান মুজাহিদদের একটি অত্যন্ত সংগঠিত দল জেহাদে লিপ্ত ছিল। এদের বেশীর ভাগই হাসপাতাল পরিচালনা থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজ এবং হাতিয়ার গোলাবারুদের হিসাব রাখা এবং পরে প্রশিক্ষণের কাজে নিবিড়ভাবে লিপ্ত ছিল। তবে সিংহভাগই বিভিন্ন মুজাহিদদের দলে যোগ দিয়ে সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিল।

পেশাওয়ার সেভেন গ্রুপের পূর্বে আলোচিত হিজব-ই-ইসলাম (খালিস) ছাড়াও আরও ছয়টি গ্রুপ ছিল। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

হিজব-ই-ইসলামী (হিকমতইয়ার)ঃ কট্টরবাদী এ দল যেটি ইসলামিক ব্রাদারহুড বা ইকওয়ানের আদর্শে লালিত ছিল। এদের নেতৃত্বে ছিল বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব গুলবদিন হিকমতইয়ার। হিকমতইয়ারকেই প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আর পাকিস্তান যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল যার বদৌলতে এ পার্টি অন্য সবার চেয়ে বেশী অর্থ আর অস্ত্র পেয়েছিল। পরে হিকমতইয়ার রাব্বানী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ না করে সরকার দখলের প্রচেষ্টায় গৃহযুদ্ধ বাধায়। হিকমতইয়ারের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধ চলাকলীন ইরানের নিকট ১৬ টি আমেরিকান স্টিংগার মিসাইল এক মিলিয়ন ডলারে বিক্রয়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। এ কথিত লেনদেন হয় ১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত চলমান ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়েই। এ ছাড়াও মাদক এবং আরও প্রচুর অস্ত্র চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকার গোপন সংবাদও সি আই এ'র নিকটে রয়েছে বলে তথ্যে প্রকাশ। জেহাদের শেষের দিকে এ বহুল আলোচিত মুজাহিদ নেতার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক অম্লমধুর এ পরিণত হয়। ১৯৮৪ সনে হেকমতইয়ার জাতিসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের হয়ে ভাষণ দেবার পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রিগানের সাথে করমর্দনও

www.nagorikpathagar.org

করে নি। এ কারণে রিগান প্রশাসনের ব্যক্তিরা সর্বসময়ই হেকমতইয়ারের ঔদ্ধ্যত্যের কারণে সহজ চোখে দেখে নি। হেকমতইয়ারের মত কট্টরপন্থী বলে খ্যাত মুজাহিদ নেতারা তাদের জেহাদের সাথে আমেরিকা যুক্ত রয়েছে এর প্রচার করতে চাইত না। এরপর থেকেই হেকমতইয়ার আর আমেরিকার সম্পর্ক আর ভাল যায় নি।

জামাত-ই-ইসলামী ঃ এর নেতৃত্বে ছিল তাজিক বংশদ্ভূত একসময়ের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক তত্ত্বের প্রফেসর বোরহান উদ্দিন রাব্বানী। স্মরণযোগ্য যে, এই প্রফেসর রোবহান উদ্দিন রাব্বানীই প্রথমদিকে ইসলামী বিদ্রোহীদের সংগঠিত করে। রাব্বানীর নেতৃত্বে সাধারণতঃ উত্তর আফগানিস্তানেই জেহাদ সংগঠিত হয়েছিল। এ দলের মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইকওয়ান পন্থীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। এ দলের দু'জন অত্যন্ত পরিচিত কমাণ্ডারের একজন আহমেদ শাহ্ মাসুদ এবং অন্যজন ইসমাইল খান। রাব্বানী পরে রাষ্ট্রপতি এবং মাসুদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োজিত হয়েছিল। এখন এদের প্রায় সবাই 'নর্দান এলায়েন্স' এ যুক্ত আর আহমেদ শাহ মাসুদ সেপ্টেম্বর ৯, ২০০১ এ আত্মঘাতী বোমা হামলায় মৃত্যুবরণ করে। রাব্বানীর বাহিনী ১৯৯১ সনের পর থেকে তালেবানদের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত কাবুলের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। রাব্বানী এবং মাসুদের সাথে পরে যোগ দিয়েছিল নজিবুল্লাহ্‌র প্রতিরক্ষামন্ত্রী আব্দুর রশিদ দোস্তাম। এ ত্রয়ী এবং হিকমতইয়ারের বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে কাবুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর নিধন হয় হাজার হাজার নিরীহ জনগণ। অভিযোগ ওঠে আহমেদ শাহ মাসুদ, রাব্বানীর তাজেক বাহিনী আর দোস্তামের উজবেক বাহিনী পশতুনদের উপর অমানবিক অত্যাচার আর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাবার।

ইত্তেহাদ-ই- ইসলাম ঃ এর নেতৃত্বে ছিল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষাবিদ প্রফেসর আব্দুল রসুল সাইয়াফ। জেহাদের শেষের বছরগুলোতে এ সংগঠন হিকমতইয়ারের সংগঠনের সাথে একত্রিভূত হয়ে পড়ে। সাইয়াফ তার সংগঠনের জন্যে সৌদী আরব, ইরাক এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর কট্টরপন্থীদের নিকট অধিক সমাদ্রিত ছিল।

মাহাজ-ই-মিল্লি-ই- ইসলামি ঃ পীর সৈয়দ আহমেদ গীলানীর নেতৃত্বে অত্যন্ত শক্তিশালী সুফি সম্প্রদায়ের সংগঠন। এর যুদ্ধক্ষেত্র কান্দাহার এলাকাতেই সীমিত থাকার ফলে এ সংগঠনের প্রভাব বাইরে খুব একটা ছিলনা। এ সংগঠন

www.nagorikpathagar.org

আফগান রাষ্ট্রপতি প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রাব্বানী এবং পাকিস্তানের
রাষ্ট্রপতি গোলাম ইসহাক খান - মার্চ ২, ১৯৯৩ - ইসলামাবাদ।

তৎকালীন আন্তর্বর্তীকালীন আফগান কাউন্সিলের প্রধান প্রফেসর সিবগাতউল্লাহ মোজাদ্দিদীর
সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ - এপ্রিল ৪, ১৯৯২ - কাবুল।

www.nagorikpathagar.org

আজও রাজতন্ত্রের সমর্থক। এর অন্য কমাণ্ডারগণ ছিল রহিম ওয়ারদাক, সাহরুখ গ্রান এবং প্রয়াত হাজী আব্দুল লতিফ।

জাবাহ-ই-নিজাত মিল্লি ঃ নেতৃত্বে ছিল কাবুলের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সিবগাতউল্লাহ মোজাদ্দিদী। এ সংগঠনও রাজতন্ত্রের সমর্থক। মোজাদ্দিদীর তেমন কোন বিখ্যাত কমাণ্ডার না থাকলেও তার জ্ঞান গরিমার জন্যে সে প্রায় সবারই শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। মস্কোপন্থীদের পতনের পর মোজাদ্দিদীই প্রথম অন্তরবর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হয়েছিল।

হারকাত-ই ইনকিলাব-ই-ইসলামী ঃ এর নেতৃত্বে ছিল মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ইসলামী বিন্তাবিদ মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদী। যদিও মধ্যপন্থী বলে পরিচিত তবে এ সংগঠনের সফলতা ছিল ঈর্ষণীয়। এদলটি ১৯৭৮ সনে কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের পূর্বেও রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে আফগানিস্তানে সফল হয়েছিল। একটি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে রাজনীতিতে থাকার কারণে এ দলে যোদ্ধার চেয়ে বোদ্ধাদের সমর্থন এবং অন্তর্ভুক্তি ছিল বেশী।

উপরের এসব সংগঠনের বাইরেও আরও ছোট খাট গ্রুপের অস্তিত্ব থাকলেও ক্রমেই এসব দলও বড় দলগুলোতে যোগদিতে বাধ্য হয়। জেহাদের ব্যাপ্তি এবং সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকলে প্রতি গ্রুপেই আফগানিস্তানের অভ্যন্তর থেকে নিত্যনতুন বহু মুজাহিদ যোগ দিতে থাকে। ক্রমে আফগান সেনাবাহিনীর সদস্যরাও দলত্যাগ করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে যোগ দিতে থাকে। এর মধ্যেও প্রচুর দলবদল ঘটে যখন বিভিন্ন স্থানের আলেম এবং মসজিদের ইমামগণ বিধর্মীদের পক্ষে যুদ্ধ করাকে হারাম ঘোষণা করে জেহাদে শরীক হতে ডাক দেয়। ধর্মীয় নেতাদের আহবানে দলত্যাগের ফলে আফগান সেনাবাহিনী অনেক স্থানে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ক্রমেই মুজাহিদদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

আফগান জেহাদে প্রধানতঃ পেশাওয়ার সেভেনই প্রাধান্য পায় এবং এদের সাথেই পাকিস্তানের আর আমেরিকার সখ্যতা ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্যদিকে ইরানের সমর্থিত মুজাহিদ গ্রুপকেও সাহায্য সহযোগিতার অনুরোধ করলেও ইরানের পরিস্থিতির এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব ইরান সমর্থিত মুজাহিদদের তেমন গুরুত্ব দেয় নি। পেশাওয়ার সেভেনের মধ্যেও গ্রুপগুলোর তাত্ত্বিক আর মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে দুটি প্রধান উপ-জোটে বিভক্ত করা হয়, এদের একটি আই ইউ এম (IUM : ইসলামিক ইউনিটি অব আফগান

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদীন) এ দলে ছিল হিজব-ই-ইসলাম (হেকমতইয়ার) জামায়াত-ই-ইসলাম (রাব্বানী); হিজব-ই- ইসলাম (প্রফেসর ইউনিস খালিস) ইত্তেহাদ-ই-ইসলাম। এ জোটটি মোটামোটি কট্টরবাদী বলে পরিচিত হলেও পাকিস্তানের নিকট একটু অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল।

অন্য উপজোট ছিল 'ইসলামিক এলায়েন্স' (Islamic Alleance) বলে পরিচিত। এর জোটভুক্ত ছিল, হরকাত-ই-ইনকেলাবি ইসলাম; মাহাজ-ই-মিল্লি; জাহাব-ই-নিমাত-ই-মিল্লি। এ উপজোটকে অনেকটা উদারপন্থী বলে মনে করা হলেও এদের প্রভাব সমগ্র জেহাদের উপরে আই ইউ এম এর চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম ছিল।

সবমিলিয়ে ১৯৮৫ সনে মাঝামাঝি আফগান মুজাহিদদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১,৪০,০০০ আর অ-আফগান মুজাহিদ বা 'আরব লিজিয়নের' সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) এ দাঁড়ায় বলে অনুমান করা হয়েছিল।

অক্টোবর ৭/৮, ২০০১ সময় প্রায় মধ্যরাত। কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাত শুনে মুতাওয়াক্কি দরজা খুলে দিলে একজন কর্মকর্তাগোছের কেউ এসে খবর দেয় যে, মোল্লা ওমরের বাড়ীতে বিমান হামলা হয়েছিল; কিন্তু ওমরের কোন ক্ষতি হয় নি, বাড়ীর ভেতরের দুই 'জেনানা' আর মাসুম দুটি বাচ্চা বোধ হয় মারা গেছে। কাবুলে তখনও বোমা হামলা অব্যাহত রয়েছে। মুতাওয়াক্কির পাশে এসে মুতাওয়াক্কিলও এসে বসে খবর শুনে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। লাদেনের উপর আমেরিকার গোস্বা এখন তালেবানদের উপরে বর্তিয়েছে সে কথা এ দুই মোল্লা মন্ত্রী বহু আগেই টের পেয়েছিল। যখন ওসামা বিন লাদেনকে উছিলা করে ১৯৯৮ সনে খোস্টে মিসাইল হামলা চালাবার পর এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তালেবান সরকারকে একঘরে করবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৯ সনে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারীর পরও আফগানিস্তান ভেঙ্গে পড়ে নি। তালেবান সরকার ওসামাকে হস্তান্তর করে নি। ওসামা, মোল্লা ওমরে হাতে নিজেকে সঁপে দেয়ার পর এটা প্রতিটি আফগানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাকে সর্বতভাবে রক্ষা করা একটি দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। একথা বিশ্বের আর কোন সভ্যতা না বুঝলে আফগানদের বিশেষ করে তালেবান সমর্থকদের তাতে কোন মাথা ব্যথা নেই।

তালেবানদের সাথে আমেরিকার হঠাৎ করেই যেন সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে ১৯৯৬ এর পর থেকে। যদিও তখনও তালেবান সরকারের

www.nagorikpathagar.org

কট্টরবাদের জন্যে মাঝে মধ্যে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো তবুও সরাসরি বৈরিতা এত প্রকট ছিলনা। ইদানীং আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্ব নর্দান এলায়েন্স নামক সংগঠনটিকে দিয়ে যার কর্তৃত্ব মাত্র ১০% আফগানিস্তানের উপর তালেবানদের পরাজিত করবার প্রচেষ্টাকে অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি আর আফগানিস্তানে ইসলামিক সরকারকে চাপের মুখে রেখে পর্যুদস্ত করবার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। এ এলায়েন্সের নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের কারণেই আজ আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান। এদের প্রত্যেকের হাতই আফগানদের রক্তে রঞ্জিত রয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধবাজ নেতার হাতে খুন হয়েছে কাবুল এবং অন্যান্য বড় শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তবে এ অপবাদ থেকে তালেবানরাও বাদ যায় নি।

নর্দান এলায়েন্সে রয়েছে তৎকালীন কম্যুনিস্ট এবং সোসালিস্ট পন্থীদের সদস্যরা। এতে রয়েছে ঐ সব উজবেক আর তাজিক সদস্যরা যারা এককালে 'জম্বিশ' বলে কথিত এক ঝটিকা বাহিনীর সদস্য ছিল। এটি ছিল পি ডি পি এ এর 'খালক' পন্থীদের ও রাশিয়ান কেজিবি'র স্থানীয় দালাল। আরও রয়েছে ইরান সমর্থিত হিজব-ই-ওয়াদাদ সদস্যরা যারা ১৯৯২ সনে কাবুলে লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞে সামিল ছিল। এরা শিয়া হাজারা গোত্রের সমর্থক। এসব মিলিয়েই এ এলায়েন্সের গোঁড়াপত্তন এবং ভিত্তি যদিও এদের ভেতরেই রয়েছে যথেষ্ট রেশারেশি।

সোভিয়েত রাশিয়া বিখণ্ডিত হবার পর থেকেই পশ্চিমা বিশ্বের চোখ মধ্যে এশিয়ার উপরে নিবদ্ধ হয়। পাকিস্তানের সামনেও উন্মুক্ত হয় এক নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিগন্ত। তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান আর তাজিকিস্তানের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ ছাড়াও প্রয়োজন ছিল কাবুলে একটি স্থিতিশীল এবং মোটামুটি পাকিস্তানপন্থী সরকারের। যেহেতু প্রায় সমস্ত প্রভাবশালী মুজাহিদ নেতাই আফগান জেহাদের সময় শুধু পাকিস্তানে থাকে নি অনেকেই পাকিস্তানে বসতবাড়ী ক্রয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলে। বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হকের সময় বহু মুজাহিদ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সীমান্ত এলাকায়, এমনকি আন্তপ্রদেশ পরিবহন ব্যবসায়েও নিয়োজিত করে, বিশেষ করে জেহাদ চলার সময়ে গোপনীয় মালামাল বহনে সাহায্য করবার জন্যে এসব মুজাহিদ নেতাদের ট্রাকবহরই ব্যবহার করা হতো। এ সমস্ত কারণেই মুজাহিদ সংগঠনগুলোর

www.nagorikpathagar.org

পেশাওয়ার সেভেন বলে খ্যাত সাত (৭) আফগান মুজাহিদ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ইসলামাবাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর রত। পেছনে দন্ডায়মান (বাঁ দিক থেকে ৮নং) নওয়াজ শরিফ এবং সৌদি আরবের প্রিন্স তুর্কি (নওয়াজ শরিফের বাঁয়ে) - মার্চ ৭, ১৯৯৩ - ইসলামাবাদ।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সাথে বাঁ দিক থেকে প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রাব্বানী ও আফগান নেতা গুলবদিন হিকমতইয়ার - মার্চ ৬, ১৯৯৩ - কাবুল।

তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রাব্বানী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি গোলাম ইসহাক খান - মার্চ ২, ১৯৯৩ - ইসলামাবাদ।

www.nagorikpathagar.org

উপর পাকিস্তানের প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও কার্যতঃ তা হয় নি; বরং ঘটনাটি ঘটে যায় সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

১৯৮৮ এর শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানের উপর ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। ততদিনে আফগান জেহাদীদের সাথে যুদ্ধে যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় বিশেষ করে রাশিয়ার সশস্ত্রবাহিনীতে, তা ক্রমেই মস্কোর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। খোদ মস্কোর উপরেই চাপ আসতে থাকে আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যে। সোভিয়েতদের তখন প্রয়োজন আফগানিস্তান থেকে পশ্চাদাপসরণ করার অজুহাত খুঁজে বের করা। অপরদিকে আমেরিকা ক্রমেই পাকিস্তানের জিয়াউল হকের সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে মস্কোপন্থীদের উৎখাতের পরে কাবুলে সরকার গঠন নিয়ে।

১৯৮৮ সনের মধ্যেই আমেরিকা পাকিস্তানকে ৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে আঙ্গীকার করলে পাকিস্তান তা যথেষ্ট নয় বলে ওয়াশিংটনে রিগান সরকারের সাথে একপ্রকার বিবাদ সৃষ্টি করে। জিয়া কাবুলে পরবর্তী সরকার প্রধান হিসেবে গুলবদিন হেকমত ইয়ারের মত কট্টরপন্থী পশতুনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সরকার গঠনের উদ্যোগে ব্রতী হয়। যদিও এ পর্যায়ে আমেরিকা অথবা সি আই এ (CIA) কোন ধারণাই করতে পারে নি যে, কাবুলে গুলবদিনের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে পরবর্তী ঘটনা কোনদিকে মোড় নিতে পারে। তখনকার প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছিল রুশ বাহিনী অপসারণের পর কাবুলের ব্যাপার নিয়ে CIA উদ্বিগ্ন ছিল।

ইতিপূর্বে জেনেভায় রাশিয়া আমেরিকা এবং পাকিস্তান সমেত আফগানিস্তানের জেহাদের সাথে যুক্ত অন্য দেশগুলো কয়েকদফা বৈঠকে বসে রাশিয়ার আফগানিস্তান ত্যাগ করবার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে ব্রতী হয়। কিন্তু প্রতিবারই কাবুলে পরবর্তী পরিবর্তিত সরকারে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণ নিয়ে মতভেদের কারণেই নিস্ফল বৈঠক অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রতিবারই জিয়াউল হকের ওজর আপত্তির কারণে রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধি হতে পারেনা এবং প্রতিবারই রাশিয়ার আফগানিস্তান ত্যাগের সময় সীমা অনির্ধারিত থেকে যায়।

আফগান সমস্যার সমাধানের জন্যে নভেম্বর ১৮, ১৯৮১ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল পেরেজ ডি কুইয়ারকে আফগান

www.nagorikpathagar.org

সংকট সমাধানের জন্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়ে ছিল। এ নিযুক্তির মধ্য দিয়েই জেনেভাতে কয়েক দফা আলোচনা চলতে থাকে। ডিসেম্বর ১৯৮৫ সনের দিকে জিয়ার উপর্যুপরি দাবীর মুখে পাকিস্তানকে ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে যে কোন ধরনের শান্তি চুক্তিতে জামিনদারের ভূমিকায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের আওতায় আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের সাথে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। যদিও জেনেভাতে ১৯৮১ সন হতে ১৯৮৮ পর্যন্ত প্রচুর বৈঠক হয় তথাপি সর্ব শেষ বৈঠকে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এপ্রিল ১৪, ১৯৮৮ সনে এবং এর আওতায় আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ শুরু হয়েছিল।

সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের ব্যাপারে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এ নিয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডতার জন্ম দেয়। বিশেষ করে আমেরিকার সিনেটে এবং কংগ্রেসে। অনেক কট্টরবাদী কংগ্রেস সদস্য আফগানিস্তানে রাশিয়ার স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারটি সমর্থন করায় রিগান এডমিনিট্রেশনের প্রচণ্ড সমালোচনা করে বিশেষ করে এ চুক্তির একটি বিশেষ শর্তের উপর। ঐ শর্তে বলা হয়েছিল 'আমেরিকা পরবর্তী আফগান সরকার এবং মুজাহিদদের তখনই সাহায্য বন্ধ করবে যদি ঐ একই সময় থেকে সোভিয়েত রাশিয়া কাবুলের বর্তমান (মস্কোপন্থী) সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে।'[২] এ বক্তব্যকেও পরবর্তীতে সিনেট প্রত্যাখ্যান করে এবং আমেরিকার তরফ থেকে কোনরূপ শর্তবিহীন চুক্তি স্বাক্ষর করার অনুমতি দেয়া হয়। সিনেট আরও জানায় আমেরিকা মুজাহিদদের সকল প্রকার সহযোগিতা ততক্ষণ পর্যন্ত দিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সোভিয়েত রাশিয়া কাবুলকে সাহায্য দিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদিকে পাকিস্তানও অনুরূপ মনবৃত্তি ব্যক্ত করলে জেনেভা চুক্তিতে আর কোন রদবদল হয় নি। কথিত আছে এ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে জিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুনেজো জিয়াউল হকের সাথে পরামর্শ না করায় চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই পাক-রাষ্ট্রপতি জুনেজো সরকার এবং সংসদ বাতিল করে। এসব কারণেই জেনেভা চুক্তির ব্যাপারে আমেরিকা কখনই উৎসাহ দেখায় নি।

যদিও চুক্তিতে আর কোন পরিবর্তন আনা হয় নি তবে চুক্তিটি বস্তুতঃপক্ষে

2. Afghanistan 'an Accord', Foreign Affairs 1998 P. 933.

www.nagorikpathagar.org

কোন পক্ষই আন্তরিকভাবে কার্যকরও করে নি। সোভিয়েত রাশিয়া নীতিগতভাবে আফগানিস্তান ত্যাগের প্রস্তুতি নিলেও কাবুল সরকারকে সমর্থন অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে আমেরিকাও অনুরূপভাবে মুজাহিদদের সাহায্য অব্যাহত রাখে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। এরই মধ্যে জুলাই ১২, ১৯৮৮ সনে সোভিয়েত ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার ওয়াই ভোরোনস্টভ, যাকে কাবুলে রাশিয়ার বিশেষ রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল, অত্যন্ত কড়া ভাষায় পেশাওয়ারে মুজাহিদদের দ্বারা প্রভিশনাল সরকার গঠনকে জেনেভা চুক্তির পরিপন্থী বলে বক্তব্য দিলেও কোন ফল হয় নি। চুক্তির মূল বক্তব্যই ছিল সোভিয়েত অপসারণের পর তৎকালীন কাবুল সরকার বহাল রাখার অঙ্গীকার এবং পরবর্তীতে 'লোয়া জিরগার' মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণ করার; কিন্তু কার্যতঃ হয়েছে এর বিপরীত। অনেকটা একই ধরনের বক্তব্য আমরা ২০০১ সনেও শুনতে পাই। এতসব বাদপ্রতিবাদের মধ্যেও আগস্ট ১৫, ১৯৮৮ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম পর্বের পশ্চাদাপসরণের কাজটি সমাপ্ত হয়। জেনেভা চুক্তি কাগজে কলমেই থেকে যায়। আমেরিকা এবং পাকিস্তান উভয়ে এ চুক্তি লঙ্ঘন করে কাবুলে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখে। সোভিয়ের রাশিয়ার প্রাথমিক পশ্চাদাপসরণের দ'ুদিন পরেই, আগস্ট ১৭, ১৯৮৮ সনে পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর নগরীর নিকট পাকিস্তান -১, আমেরিকার তৈরী সি - ১৩০ এর বিশেষ বিমানটি বিধ্বস্ত হলে আফগান জেহাদের দুই প্রবাদ পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এদের একজন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, 'মরদে মোমিন' বলে আফগানদের কাছে পরিচিত, জেনারেল জিয়াউল হক আর অন্যজন জেহাদের আরেক হোতা, প্রাক্তন আই এস আই এবং তৎকালীন জয়েন্ট চীফ প্রধান জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান খানের মৃত্যু হয়।

১৯৮৮ সনে জিয়ার মৃত্যুর পরে নির্বাচনের মাধ্যমে ডিসেম্বর ১২, ১৯৮৮ তে বেনজীর ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়। তার নিযুক্তির পর আমেরিকা এবং পশ্চিমের মিত্র দেশগুলো আফগান সমস্যার উপর তাদের নীতি অপরিবর্তিত রাখার আশ্বাস দেয়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আফগান জেহাদ বেসামরিক সরকারের তত্ত্বাবধানেও আই এস আই এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রভাব বলয়েই থেকে যায়। পাকিস্তানের আফগান নীতি সামরিক শাসক জিয়াউল হকের রূপরেখার আদলেই অপরিবর্তিত অবস্থায় অব্যাহত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে কাবুলে নবনিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চাদাপসরণের সমস্ত ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করে বিগত দশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত পাকিস্তানে অবস্থানরত মুজাহিদদের সাথে সরাসরি আলোচনার নিমিত্তে নভেম্বর ২৮, ১৯৮৮ তে ইসলামাবাদ সফর করে। রাষ্ট্রদূত তাদের আফগানিস্তান ত্যাগের এবং নব্যঅধিষ্ঠিত রুশ রাষ্ট্রপতি মিখায়েল গরভাচেভের নতুন নীতি (New Policy) এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করে। এ আলোচনার এক পর্যায়ে রুশ রাষ্টদূত তার দেশের ৩১১জন যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া (MIA) সৈনিকের হদিস চাইলে জবাবে মুজাহিদ জোট তাদের ৩০,০০০-৪০,০০০ হারিয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের প্রসঙ্গের অবতারণা করলে বৈঠক তিক্ত পরিবেশে অমীমাংসিত থেকে যায়। আরও পরে সৌদী সরকারের মধ্যস্থতায় রুশ দূত ভেরোনস্টভ এবং মুজাহিদদের জোট আই ইউ এম (IUM) নেতা প্রফেসর বোরহান উদ্দীন রাব্বানীর মধ্যে এক সমঝোতা হয়। ডিসেম্বর ৩-৪, ১৯৮৮ সনের তাইফের এ সমঝোতার মধ্য দিয়ে পশ্চাদপদগামী রুশ বাহিনীকে নিরাপদ পথ (Safe Passage) দিতে রাজী হয়। উল্লেখ্য, রাব্বানীর মুজাহিদগণ কমাণ্ডার আহ্মেদ শাহ্ মাসুদের নেতৃত্বে সালাং গিরিপথ ও পাঞ্জশীর উপত্যকায় যুদ্ধ করছিল এবং উত্তরের যোগাযোগকারী শহর মাজার-ই-শরিফের[৩] দখলেও ছিল। রুশ সৈনিকদের পশ্চাদাপসরণের জন্যে ঐ পথ ব্যবহার ছিল অপরিহার্য।

এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটতে থাকে এবং এর অনেক ঘটনার

মাজার-ই-শরিফ ঃ ২০০১ সনের সন্ত্রাস বিরোধী আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান অভিযানেও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এ শহরটি দখল করবার জন্যে নর্দান এলায়েন্সের সমর্থনে প্রায় এক মাস স্মরণকালের সবচেয়ে অধিক বোমা বর্ষণের পর নর্দান এলায়েন্সে উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা এককালের রাশিয়াপন্থী, নজিবুল্লাহর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আব্দুর রশিদ দোস্তাম দখল করে। ১৯৭৯ সনে এই একই শহর দখলের মধ্য দিয়ে রুশ সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। শীত মৌসমে বরফে সালাং গিরিপথ বন্ধ হয়ে গেলে কাবুলে এই একটি প্রবেশ পথ খোলা থাকে। যদিও অন্য আরেকটি পথে বামিয়ান হয়ে কাবুলে প্রবেশ করা যায় তবে এ পথেও শীত মৌসুমে বরফের কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর উজবেকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরত্বে ১,২৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। কথিত আছে যে এ শহরেই হযরত আলী (রাঃ) পবিত্র সমাধি রয়েছে যা ১২ শতকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এখানে মাজার-এর নিকট রয়েছে একটি সুরম্য নীল টাইলস্ এর মসজিদ। এ শহরটি মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। মাজার-ই-শরিফে হযরত আলীর (রাঃ) মাজার নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা রয়েছে কারণ শিয়াদের মতে হযরত আলী'র (রাঃ) মাজার ইরাকের নজফ শহরে হবার সম্ভাবনাই বেশী। এ শহর কুফা নগরী থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে।

www.nagorikpathagar.org

প্রায় পুনরাবৃত্তি দেখা যায় ২০০১ এ। কিন্তু 'রিভার্স ডাইরেকশনে' বা উল্টো দিক থেকে।

ডিসেম্বর ৭, ১৯৮৮ সনে গরভাচেভ সোভিয়েত পশ্চাদাপসরণের পর কাবুলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘকে দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানায়। আরও অনুরোধ জানায় যে, কাবুলে পরবর্তী সরকার গঠনের জন্যে মধ্যস্থতা করবার জন্যে জাতিসংঘ যেন আন্তরিক হয়। তার বক্তব্যে আরও অনুরোধ জানানো হয় যাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে একটি 'ডিমিলিটারাইজড' নিরেপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং কোন শক্তি বা দেশ ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে সামরিক সাহায্য যাতে না দেয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা। গরভাচেভ হয়ত ভুলে গিয়েছিল যে, শান্তি আর 'ডিমিলিটারাইজেসন' এর মত অত্যাধুনিক বুলি আফগানিস্তানের সমাজ এবং ইতিহাসে নেই। এ চেষ্টা অমূলক মাত্র। কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অতীতেও যেমন আফগানিস্তানে কাজ করে নি ভবিষ্যতেও কতখানি করবে তা ইতিহাসই বলতে পারবে।

অন্যদিকে কাবুলে রুশ রাষ্ট্রদূত ভোরোনস্টভ প্রাক্তন বাদশাহ জহির শাহের

হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে নামাজের সময় আব্দুর রহমান মুলদিম নামক জনৈক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে যখন মৃত্যুপথের যাত্রী তখন তিনি মৃত্যুর পর তাঁর কবরের ঠিকানা গোপন রাখতে অনুরোধ করেন। এর কারণ তিনি তার হত্যাকে কেন্দ্র করে আন্তগোত্রীয় কোন্দল যাতে না হয় সে জন্যে নসিহত করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর কফিন বহনকারী উটকে মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরের বিষয়গুলো রহস্যাবৃত থাকে।

শিয়া সম্প্রদায়ের ভাষ্যে হযরত আলীর (রাঃ) লাশ বহন করে নজফে এক পূর্ব খোদাইকৃত কবরের সামনে বসে পড়লে এখানেই তাকে সমাধিস্ত করা হয়।[৫] অনেক বইপত্রে অবশ্য মাজার-ই-শরিফের কথাও বলা হয়। এ শহরটি ১৮৫২ সনে উজবেকদের হাত হয়ে আফগানদের দখলে আসে।

১৯৮১ সনে রুশ সরকার আমুদরিয়া নদীর উপর দিয়ে মাজার-ই-শরিফের উত্তরে উজবেকিস্তান সীমান্ত শহর তিরমিজ পর্যন্ত নতুন সড়ক এবং রেল হেড স্থাপনা করে যোগাযোগ ও উজবেকিস্তান হতে সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করে। আমুদরিয়া নদীর উপরে স্থাপিত সেতুর নামই Friendship Bridge.

এশহরে মাজার ছাড়াও রয়েছে এতদঅঞ্চলের প্রখ্যাত ইসলামী তত্ত্বের পাদপীঠ-দেহ্দাদী। ১৯৮৮ আদমশুমারি মোতাবেক এ শহরের জনসংখ্যা ছিল ১,৩০,৬০০ যার মধ্যে প্রধানত রয়েছে উজবেক, তাজিক এবং তুর্কমেন তবে উজবেকরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এ শহর বহুবার হাত বদল হয়। অবশেষে তালেবানরা ১৯৯৭ সনে এ শহরটি দখল করে। প্রায় তিন বছর পর আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ যুদ্ধে নভেম্বর ৯, ২০০১ সনে পুনরায় নর্দান এলায়েন্স এ শহর দখল করলে রাশিয়ার অনুরূপ আমেরিকার স্পেশাল ফোর্স উজবেকিস্তানের মধ্য দিয়ে এ শহরে প্রবেশ করে।

[৫] সূত্র : জনাব ইউসুফ এন লালজি কর্তৃক সম্পাদিত আলী দি ম্যাগনিফিসেন্ট, বই থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ২৬১।

www.nagorikpathagar.org

সাথে দেখা করে তাকে কাবুলে ফিরে সরকার গঠন অথবা মধ্যস্থতার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানায়। ঐ সময়ে বাদশাহ্ জহির শাহ কাবুলে ফেরার প্রস্তাব গ্রহণে কোন আগ্রহই দেখায় নি। হতাশাগ্রস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ইরান সমর্থিত তেহরান এইট বলে পরিচিত আফগান শিয়া মুজাহিদদের নেতা মোহাম্মদ করিম খালিলীর সাথে এক বৈঠক করে; কিন্তু করিম খালিলী কাবুলে তার কি ধরনের প্রভাব থাকবে সে ব্যাপারে নিজেই সন্দিহান থাকায় সাহায্যের কোন অশ্বাসই দিতে পারে নি। স্মরণযোগ্য যে, ইরানে ৩০ থেকে ৪০ হাজার আফগান শরণার্থীর মধ্যে বেশীর ভাগই শিয়া সম্প্রদায়ের ছিল এবং যে কয়েকটি বড় মুজাহিদ দল ছিল তাদেরও তেমন কোন বড় ধরনের সংগঠন না থাকায় পরবর্তীতেও এদের কোন তৎপরতাই চোখে পড়ে নি। অন্যদিকে পাকিস্তানের মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লাখ আর শরণার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ লাখে।

হতাশ ভোরোনটস্‌ভ কাবুলে ফিরে মস্কোতে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়। ঐ সময় রাশিয়ায় গরভাচেভ সরকারের সামনে কোন বিকল্প পথ খোলা ছিলনা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আফগানদের নিয়ে পর্যুদস্ত রাশিয়া কোন তরফ থেকেই সহযোগিতার আশ্বাস পাচ্ছিলনা। অন্যদিকে রুশ বাহিনীর বিপর্যয়ে খোদ মস্কোতেই বিশাল বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। রুশ অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে পড়েছিল অথৈবচ। তদুপরি ছিল বিশাল সংখ্যক সৈনিক হতাহতের ক্ষতিয়ান। আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছিল তা হল রুশ বাহিনীর মাদকাশক্তি। সব মিলিয়ে 'প্রেসত্রইকা' আর 'গ্লাসনটস' এর প্রবক্তা গরভাচেভের নিকট একটি রাস্তাই খোলা ছিল তা হল একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা দিয়ে কাবুল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার আর কাবুল সরকারকে নিয়তির উপরে ছেড়ে দেয়া। সেদিন গরভাচেভ রুশ-আফগান সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে এবং হৃদয়াঙ্গম করতে শিখল মাত্র।

এহেন পরিস্থিতিতে রাশিয়া জানুয়ারী ১, ১৯৮৯ সনে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দিলে তা সাথে সাথে মুজাহিদ সংগঠনগুলো প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে পেশাওয়ারে মুজহিদ সংগঠনগুলো মজলিশে সুরার ডাক দেয়। সুরার ডাকের উদ্দেশ্য ছিল কাবুলে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত একটি তন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবার প্রক্রিয়া শুরু করা। ভোরোনটস্‌ভ তেহরানে করিম খালিলীর সাথে যোগাযোগ করে পেশাওয়ারে আসতে অনুরোধ করলেও খালিলী তা রক্ষা করে

www.nagorikpathagar.org

নি। এর কারণ ছিল আই ইউ এম তেহরান এইট কে ২৪০ সদস্যের সুরায় মাত্র ৬০ টি আসন দেয়াতে খালিলী সুরা বয়কট করে। তেহারান এইট এর দাবী ছিল ১০০ টি আসনের যা পেশাওয়ার সেভেন সরাসরি প্রত্যাখান করে তেহরান এইটকে পাশ কাটিয়ে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার জন্যে আফগান ভবিষ্যতের সাথে তাদের যুক্ত থাকার সকল দরজা আপাতত বন্ধ হওয়াতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিছিন্ন অবমাননাকর পরিস্থিতিতে, ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৮৯ সনে, নয় বছর ঊনিশ দিন পরে রুশ বাহিনীর শেষ সৈনিক জেনারেল বরিস গ্রোমোভ এর নেতৃত্বে মাজার-ই-শরিফের ক্যাম্পে এসে পৌঁছে।

ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৮৯ সকালে আন্তর্জাতিক প্রেস এবং টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে সোভিয়েত সৈন্যের শেষ দলটি আমুদরিয়া নদীর উপরের ফ্রেণ্ডশীপ ব্রিজ অতিক্রম করে আফগানিস্তান ত্যাগ করে।। জেনারেল বরিস গ্রোমোভ সর্বশেষে সেতুটি পার করলে সমাপ্ত হয় রাশিয়ার প্রায় দশ বছরের আফগানিস্তান দখল।

ঠিক ঐ সময়েই ওয়াশিংটন ল্যাংলেতে সি আই এ (CIA) সদর দপ্তরের রুম নং ২ বি ২৯০ এ বসে সোভিয়েত রাশিয়ার জেনারেল গ্রোমোভের আফগানিস্তান ত্যাগ করা প্রত্যক্ষরত ৪১ তম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াকার বুশ (সিনিয়র) এ উৎসবমুখর সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করবার জন্যে সশব্দে খোলে বিশাল সেম্পেইনের বোতলের মুখ। এ সময়ে উপস্থিত একজন মন্তব্য করে, 'আমরা ভিয়েতনামে আমাদের পরাজয়ের শোধ নিয়োছি।' অন্য আরেকজন বলে উঠে, 'আমরা রাশিয়াকে নিজেদের তৈরী জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বাধ্য করেছি।' সেদিন রাষ্ট্রপতি বুশ স্মিত হাস্যে কক্ষ ত্যাগ করে। সেদিন হয়ত মিঃ বুশ কল্পনাও করতে পারে নি যে, আরও একদশক পরে তারই পুত্র আমেরিকার ৪৩ তম রাষ্ট্রপতি আঁরেক জর্জ ডাব্লিউ বুশ (জুনিয়র) পরিবর্তিত বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় রণকৌশলের ফাঁদে পা দেবে, আর রাশিয়ার মদদে আমেরিকা আরেক আফগান অভিযানে জড়াবে তবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

দশ বছরের আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারী সূত্রে ১৩, ৩১০ জন সৈন্য মৃত্যু বরণ করে। ৫৩, ৪৭৮ জন সৈন্য গুরুতরভাবে আহত হয় যাদের মধ্যে বেশীরভাগই বিকলাঙ্গ এবং ৩১১ জন এখনও নিখোঁজ তালিকায়।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বেসরকারী সূত্র এবং পশ্চিমা দেশের তথ্যানুযায়ী আনুমানিক ২০,০০০ মৃত এবং ৫০,০০০ আহত বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ভিয়েতনামের সাথে তুলনায় রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতি কম বলে মনে হয়। ভিয়েতনামে ১৯৬২-৭৩ পর্যন্ত আমেরিকার ৫৮,১৩৫ জন সৈন্য মারা যায় ও ১,৫৩,৩০৩ সৈন্য গুরুতরভাবে আহত হয় এবং ২,৪১৪ জন এখনও ভিয়েতনামে নিখোঁজ রয়েছে বলে পেন্টাগনের হিসেবে রয়েছে।

আফগানিস্তানে দশ বছরের প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়। এ সংখ্যার মধ্যে সর্বস্তরের জনগণ অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আফগানিস্তানের কপালে শান্তি নামক বস্তুটি সহজে খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে উঠে। এরপরেও আফগানিস্তান আরও একদশকের উপরে রক্তক্ষরণ প্রত্যক্ষ করতে থাকবে।

সেদিন সেপ্টেম্বর ৮, ২০০১ সকালে ফজর নামাজ পর্যন্ত কাবুলে আমেরিকার বিমান আর মিসাইল হামলা অব্যাহত থাকে। ফজরের নামাজ শেষে তালেবান মন্ত্রিদ্বয় কাবুলে ফিরে আসার উদ্যোগ নিতে বের হয়ে কাবুলের দিক থেকে আকাশে ধোঁয়ার আভাস দেখতে পায়। তাদের কাছে এধরনের দৃশ্য আজ নতুন নয়। নতুন নয় কাবুল শহরের বাসিন্দাদের কাছেও।

কাবুল শহরে প্রবেশের মুখেই নাকে এল সেই অত্যন্ত পরিচিত বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া। সকাল তখন প্রায় সাতটা। শহরে আস্তে আস্তে লোকজন চলাচল বাড়ছে। বাড়ছে কাবুলের পথে চিরাচরিত যানবাহন যার মধ্যে রয়েছে খচ্চর চালিত মালটানার গাড়ীও। মোল্লা মুতাওয়াক্কি তার বাসভবনে নেমে ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে একবার সামনের পাহাড়ের গায়ের ব্যারাকগুলোর দিকে তাকালো, সেখানে বিমান হামলা হয়েছে বেশী। তার বেশ মনে আছে তালেবানরা কাবুল দখল করার পর থেকেই এসব জায়গা ব্যবহার করে চলছে।

তালেবানদের কাবুল দখলের পূর্ব পরিস্থিতির দিনগুলোর কথা মনেও করতে চায়না। মোতাওয়াক্কি ভাবছিল ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ যখন কাবুলকে গৃহযুদ্ধের বিবাদী গোষ্ঠীরাই ধ্বংস করেছে তখন বেচারা বুশের বিমান আর মিসাইল হামলার জন্যে আর কিইবা বাকী ছিল। তালেবান মন্ত্রী আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মন্ত্রণালয়ে যাবার জন্যে তৈরী হতে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল।

www.nagorikpathagar.org

আফগান গৃহযুদ্ধ ১৯৯২-১৯৯৪

'কাবুলের রক্তঝরা দিনগুলোর কথা।'

১৯৮৯ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার শেষ সৈনিকটি কাবুল ত্যাগের দু'বছরের মাথায় রাশিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরোতে পর্যবসিত হল। খোদ রাশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ভেতরেই শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কোথাও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আবার কোথাও গোত্রীয় যুদ্ধ। সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব তখন রাশিয়ার বিখণ্ডিত হওয়া নিয়ে ব্যস্ত। অপেক্ষা করছে পূর্ব ইউরোপে নতুন সমীকরণের। আমেরিকা তখন নতুন প্রণয়ে মগ্ন। এবারের প্রণয়নী পূর্ব ইউরোপ আর নতুন করে পাওয়া অসহায় রাশিয়া। আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্ব ঐ সময়ে মধ্যযুগীয় আফগানিস্তানকে পুরাতন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছে। আফগানিস্তান চলে আসে পাকিস্তানের প্রযত্নে। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যও ভুলে গেল একটি পশ্চাদপদ গরীব যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যযুগীয় আফগানিস্তানকে। আর আফগানরা তখন জেহাদে জয়ের নেশায় বিভোর, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন। এক কথায় অতি স্বল্প ব্যবধানে পশ্চিমা বিশ্ব ভুলে গেল যে, রাশিয়ার ভল্লুককে আফগানরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তক্ষরণ করাতে করাতে মেরেছে।

পশ্চিমে তখন আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর পরাজয়ের একদিকে যেমন দারুণ উত্তেজনা অন্যদিকে তেমন প্রচুর গবেষণা, কবে রাশিয়া ভেঙ্গে পড়বে। রাশিয়ার প্রগতিবাদী নেতা মিখায়েল গর্বাচেভকে নিয়ে তখন সমগ্র বিশ্বে টানাটানি। 'প্রেসত্রইকা' তখন পশ্চিমের বুলি আর 'গ্লাসনস্ত' মাত্র। এ সবের মাঝে বিশ্বই ভুলে গেল যে, সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে গেলেও সমগ্র আফগানিস্তানে মস্কোপন্থীদের হাতে রেখে গেল অগণিত SCUD মিসাইল, বোমারু থেকে ফাইটার এয়ারক্রাফ্‌ট, ভারী অস্ত্রশস্ত্র, হাজার হাজার টন গোলাবারুদ, শত শত (KGB)এজেন্ট এবং সমগ্র আফগানিস্তান জুড়ে লক্ষ লক্ষ ভূমি মাইন।

www.nagorikpathagar.org

অপর দিকে আমেরিকা সমর্থিত জেহাদীদের হাতে ছেড়ে গেল অগণিত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। আরও ছেড়ে গেল সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় লক্ষ লক্ষ টন গোলাবারুদের বিশাল মজুদ ভাণ্ডার। রেখে গেল প্রায় দু'হাজারের উপরে সুরক্ষা সুড়ঙ্গ পথ, ইরানের ইসলামী সরকারের গোয়েন্দা সদস্য, পাকিস্তানের তথাকথিত জেহাদী বিশেষজ্ঞ, সি আই এ (CIA) এজেন্ট, স্টিংগার মিসাইল আর সূচনা করে গেল ভাতৃঘাতী ক্ষমতার লড়াই। মুজাহিদ তথা আরব জেহাদীদের হাতে ছেড়ে গেল আরবী এবং ফারসীতে তর্জমা করা আমেরিকার স্পেশাল ফোর্সের আধুনিক গেরিলাযুদ্ধ এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের কারিগরী ম্যানুয়াল (Technical Manual)। এগুলো পরে সি আই এ (CIA) চড়াদামে কিনতে চাইলেও আর খুঁজে পায় নি। এসব ম্যানুয়াল তখন সন্ত্রাসীদের বাইবেলে পরিণত হয়েছে। এরই মধ্যে হাজার হাজার কপি ছাপা হয়ে গেছে। পাচার হয়ে গেছে বিশ্বের সমস্ত এলাকায়।

এসব পরিস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান ত্যাগের পরপরই আমেরিকা এবং পাকিস্তান উভয়েই মুজাহিদদের অস্ত্রের সহযোগিতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্থের অনুদানও বন্ধ করে দেয়। তবে গুলবদিন হেকমতইয়ারের হিজব-ই-ইসলামীর জন্যে ১৯৮৯ সনের শেষ পর্যন্ত এ সাহায্য অব্যাহত থাকে। এর ফলে একমাত্র 'হিজব' ছাড়া বাকী মুজাহিদ গ্রুপের অর্থের অভাবে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তৎপরতায় ভাটা পড়লে কাবুলে মস্কোপন্থী নজিবুল্লাহ সরকার এবং তার মিলিশিয়া বাহিনী উজেবক জেনারেল আব্দুল রশিদ দোস্তামের নেতৃত্বে কাবুল, জালালাবাদ আর মাজার-ই-শরীফ এলাকায় ক্ষমতার ভীত শক্ত করে তোলে। অন্যদিকে ধ্বংস প্রাপ্ত হেরাত শহরে স্থানীয় গোত্রীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে উঠে। কান্দাহারেও ঐ একই অবস্থা বলবত থাকায় জনগণ মুজাহিদদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে।

আফগান যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন দুটি পরিবর্তন হয়। একটি হয় সোভিয়েত রাশিয়াতে সেখানে ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় (KGB) এর প্রাক্তন বস মিখায়েল গর্ভাচেভ। আর আফগানিস্তানে বারবাক কারমালের জায়গায় পিডিপিএ (PDPA) এর 'পরচাম' নেতা ডাঃ মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ ক্ষমতা দখল।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৬ সনে গরভাচেভ মস্কোতে ক্ষমতায় আসার প্রায় কিছুদিনের মধ্যেই কাবুলে কারমালকে সরিয়ে আহমেদজাই পশ্তুন গোত্রের নজিবুল্লাহকে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয়। ইতিপূর্বে নজিবুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

ইরানে রাষ্ট্রদূত এবং পরে ১৯৮৫ পর্যন্ত KGB স্টাইলে গড়ে উঠা বারবাক কারমালের KHAD (KHAD:খোদমতে দৌলতিয়া) এর প্রধান ছিল। নজিবুল্লাহকে কাবুলে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করার পেছনে মস্কোর অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল, নজিবুল্লাহ পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ লাগোয়া পাখতিয়া প্রদেশের আহ্‌মেদজাই গোত্রের পশতুন আর আহমেদজাই অন্যতম বৃহত্তম পশতুন গোত্র যার সিংহভাগ রয়েছে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ে। কাজেই নজিবুল্লাহ্‌র পক্ষে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার সাথে প্রয়োজনে যোগাযোগের মাত্রা বাড়ানো সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই প্রধানত এ পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৯৮৯ সনের শেষের দিকে সোভিয়েতবিহীন আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই গৃহযুদ্ধের দিকে এগুতে থাকে। ক্রমশঃই কাবুলে নজিবুল্লাহ সরকারের অবস্থান নড়বড়ে হতে থাকে। একদিকে আফগান সেনাবাহিনী আর অন্যদিকে মিলিশিয়াদের মধ্যে দল পরিত্যাগ করে গোত্র ভিত্তিক মুজাহিদ গ্রুপে যোগ দেবার হিড়িক পড়ে যায়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ উত্তরে রাব্বানী গ্রুপের আহমেদ শাহ্ মাসুদের দলে এবং দক্ষিণে হেকমতইয়ারের সাথে যোগ দিতে থাকলে উভয় দলেরই শক্তি, জনবল এবং অস্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য গ্রুপের চেয়ে ঈর্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেলে বাদবাকী মুজাহিদ গ্রুপের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৮৯ সনের প্রথম দিকে আফগানিস্তানে প্রধানতঃ তিনটি শক্তির ক্রম বিকাশ হতে থাকলে এরা সংঘর্ষের মুখমুখি চলে আসে। এ তিনটি প্রধান শক্তির একদিকে ছিল উত্তরে বোরহানউদ্দিন রাব্বানী সমর্থিত মাসুদের নেতৃত্বে জামাত-ই-ইসলামী, কাবুলে নজিবুল্লাহ্‌র সরকার সমর্থিত উজবেক গোত্রের নেতা আব্দুল রশিদ দোস্তামের সরকারী বাহিনী এবং দক্ষিণে হেকমতইয়ারের হিজব-ই-ইসলাম। এ সময়েই উত্তর আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে হিকমতইয়ার আর আহমেদ শাহ্ মাসুদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। এরই সাথে শুরু হয় সোভিয়েত উত্তর আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ।

এদিকে পেশাওয়ারে ইতিপূর্বে গঠিত অন্তরবর্তীকালীন প্রবাসী আফগান সরকারের সাত পার্টির সদস্যদের মধ্যেও কাবুলে আধিপত্য নিয়ে মতভেদ তুঙ্গে উঠে। আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সিবগাতউল্লাহ্ মুজাদ্দিদীর ক্ষমতা সীমিত হতে থাকে। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকা বহুবার CIA এবং US-AID এর মাধ্যমে গোত্রীয় ভিত্তিক উন্নয়ন

www.nagorikpathagar.org

তহবিল বন্টন এবং ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের সকল গোত্রভিত্তিক সরকার গঠন ইত্যাদি চাপানোর চেষ্টা করলে এর ফলাফল বিপরীতমুখী হতে থাকে। অবস্থার অবনতি হয় তখন যখন আমেরিকার উপর্যুক্ত এ ফর্মুলার ভিত্তিতে ইরানে অবস্থানরত শিয়া সম্প্রদায়ের মুজাহিদ পার্টিগুলো সাহায্য সংস্থাপ্রদত্ত অর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির সমান ভাগ এবং প্রস্তাবিত 'লোয়া জিরগার' ২৪০ টি আসনের ১০০ টি দাবী করে। ইরান ভিত্তিক শিয়া মুজাহিদদের এসব দাবী পেশাওয়ার সেভেন সরাসরি প্রত্যাখান করে দিলে, পেশাওয়ার আর ইরান ভিত্তিক মুজাহিদদের মধ্যে বৈরিতার সূত্রপাত হয়।

১৯৯০ এর প্রথমভাগেই কাবুলের নজিবুল্লাহ সরকারের অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে অস্থিতিশীল হতে থাকলে মস্কোপন্থী কাবুল সরকারের তৎসময়কার প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহনেওয়াজ তানাই সদলবলে হিকমতইয়ারের বাহিনীতে যোগ দেয়। প্রতিনিয়ত হিকমতইয়ারের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে মুজাহিদ সরকারের জন্যে নিয়োজিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার থমসন সমস্ত গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেও অকৃতকার্য হয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মাসুদ আর হিকমতইয়ারের বাহিনী কাবুলের দোর প্রান্তে এসে পৌঁছলে দু'দলের মধ্যে কাবুল দখল নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের সূচনা হয়। এরই মধ্যে সরকারের সমর্থনে থাকা আব্দুর রশিদ দোস্তাম নজিবুল্লাহর সমর্থন ত্যাগ করে মাসুদের সাথে যোগ দিলে মাসুদের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। দোস্তামের বাহিনী ঐ সময়ে সরকারের সমর্থনে কাবুলের বাইরের প্রতিরক্ষায় থাকায় তার দল পরিবর্তনের ফলে মাসুদের সামরিক অবস্থান হেকমতইয়ারের তুলনায় উন্নত হয়। মাসুদ তখন কাবুল দখলের পরিকল্পনায় অগ্রগামী।

কাবুলের অবস্থা যখন বিস্ফোরণের মুখে ঐ সময়েই যুদ্ধে সমন্বয় সাধনের জন্যে গঠিত ১০ সদস্যের মুজাহিদ কমান্ড কাউন্সিল বিভিন্ন দলের ৩০০ কমাণ্ডারের[@] পাকিস্তানের চিত্রালে এ কাউন্সিলে যোগ দিয়ে কাবুলের এবং পরবর্তী সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায়

[@]দ্রষ্টব্য ঃ এখানে বলে রাখা প্রয়োজনীয় যে, প্রতিটি আফগান মুজাহিদ পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে মাঠ পর্যায়ের যুদ্ধে নিজ নিজ এলাকা একাধিক কমাণ্ডে ভাগ করা হয়। আর এসব কমাণ্ডের নেতৃত্ব থাকে গোত্র ভিত্তিক কমাণ্ডারগণ। কোথাও কমাণ্ডারদের ব্যক্তিত্বের কারণে পার্টির নেতাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেবলমাত্র হিজব-ই-ইসলামের নেতা মৌলভী ইউনিস খালিসই একাধারে একজন ফিল্ড কমাণ্ডার এবং পার্টি নেতাও ছিল।

www.nagorikpathagar.org

সমস্ত কমাণ্ডার যোগ দিলে আহমেদ শাহ মাসুদ অনেকটা অনিচ্ছাস্বত্ত্বে এ কাউন্সিলে যোগ দিতে দশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত আফগানিস্তান ছেড়ে পেশাওয়ারে আসে। এ কাউন্সিল গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিকে এড়াবার যাবতীয় প্রস্তাব রাখলেও কোনটাই গৃহীত হয় নি; বরং মতবিরোধ আরও বাড়ে। আহমেদ শাহ মাসুদ এ কমাণ্ড কাউন্সিল থেকে বের হয়ে যাবার ঘোষণা দিলে কাউন্সিল ভন্ডুল হয়ে যায়। মাসুদ ইতিপূর্বে উত্তর কাবুলে নিজস্ব এলাকায় এলাকা ভিত্তিক পৃথক কমাণ্ড কাউন্সিল গঠন করে পেশাওয়ারে বৃহত্তর কাউন্সিলে নিজের সম্পৃক্ততা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এ সিদ্ধান্তানুযায়ী বৃহত্তর কাউন্সিল ত্যাগের ঘোষণা দিলে পাকিস্তানের চিত্রালের গরমচসমা নামক জায়গায় এ দু'দিনের শেষ প্রচেষ্টা উত্তপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত হয়। সম্মেলন শেষে হেকমতইয়ার তার প্রতিপক্ষ মাসুদের মতই নিজের ধারায় এ সমস্যা সমাধানের প্রতিজ্ঞা করে এ মিটিং এর প্রস্তাবনাগুলোকে অ-ইসলামিক বলে স্থান ত্যাগ করে। পাকিস্তানী সমন্বয়করীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত পরিস্থিতি অবলোকন করে। বস্তুতঃপক্ষে তাদের কিছুই করার ছিলনা। ইসলামাবাদে তখন নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে নতুন সরকার।

এমতাবস্থায় কাবুলের দখল নিয়ে দু'পক্ষে সংঘর্ষে একদিকে দোস্তাম-মাসুদ বাহিনী সম্মিলিতভাবে হেকমতইয়ারের বাহিনীকে কাবুলের বাইরে ঠেলে দেয়। ১৯৯১ এর সমস্ত সময়টা জুড়েই এ দু'বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ১৯৯২ সনের মাঝামাঝি হেকমতইয়ারের বাহিনী পশ্চাদাপসারণ করে কাবুলের দক্ষিণে লোগার প্রদেশের পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে কাবুলে প্রতিপক্ষের অবস্থানের উপর অবিরাম মিসাইল আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

যখন উত্তরে আহমেদ শাহ মাসুদ আর দক্ষিণে হেকমতইয়ারের বাহিনী কাবুল নিয়ন্ত্রণের জন্যে যুদ্ধরত ঠিক এ সময়ে অরক্ষিত কাবুলে ইরান সমর্থিত শিয়া হিজব-ই-ওয়াহদাদ নামের মুজাহিদ গোষ্ঠী শহরের উত্তরে সবার অজান্তে ঢুকে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে। অন্যদিকে দোস্তামের বাহিনীও তখন কাবুলের বাইরে। এহেন অবস্থায় কাবুলের পরিস্থিতি আরও তমশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এসব হানাহানির মধ্যেই হিজব-ই- ওয়াহদাদ রাব্বানীর সমর্থনে হেকমতইয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কাবুলের পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সহসা কারও পক্ষেই কাবুল দখল করা সম্ভব হয় নি তথাপি সকল

www.nagorikpathagar.org

বিবাদী পক্ষ থেকেই কাবুলের উপর চলে উপর্যুপরি হামলা। প্রতিনিয়ত রকেট হামলায় কাবুল এক প্রত্নতাত্ত্বিক নগরীতে পরিণত হয়।

এ গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ে ১৯৯২ সনের শেষের দিকে কাবুল ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। সে সময় কাবুলে শিশু, মহিলা আর অতিশয় বৃদ্ধ ছাড়া সবাই কোন না কোন পক্ষে গৃহযুদ্ধে সামিল হয়। ঐ সময়ে কাবুলে কোন কার্যকর সরকারই ছিল না। ছিল না কাবুলকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন কর্তৃপক্ষ। দিনে কাবুল মাসুদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলে রাতে হেকমতইয়ারের যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসত।

কাবুলস্থিত জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিঃ বেনন সেভন কাবুলের এহেন পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শীর পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল মাত্র। কাবুলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহযোগিতা এবং পরে একটি সুবিন্যাস্ত (Broad Based) সরকারের গঠন ইত্যাদি তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। ঐ সময়ে তার একমাত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল চারদিক থেকে অব্যাহত আক্রমণের মুখে নজিবুল্লাহ্ এবং তার সমর্থকদের নিরাপত্তা বিধান করা। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা স্বত্ত্বেও কোনভাবেই নজিবুল্লাহ্কে কাবুলের বাইরে পাঠাতে সক্ষম হয় নি। অবশেষে নজিবুল্লাহ্ ত্রিমুখি আক্রমণের মাঝে জাতিসংঘের শরণে কাবুলে বেননের অফিসে আশ্রয় নিলে কাবুল সরকারবিহীন হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্য কাবুল দখলের প্রচণ্ড তাড়াহুরা পড়ে যায়। মিঃ বেনন ঐ সময়ে ইউ এন ও'র নিকট এক রিপোর্টে বলে যে, একটি গ্রহণযোগ্য সুবিন্যাস্ত (Broad Based) সরকার গঠনে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তার মতে, পাকিস্তান আমেরিকার সমর্থনে হঠাৎ করেই আহমেদ শাহ্ মাসুদকে স্বত্বর কাবুল দখলের পথ খুলে দেয়ার কারণে ইউ এন ও'র পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে যায়।

মিঃ বেনন সেভনের বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, হঠাৎ করেই পাকিস্তানের মুজাহিদ বিশেষজ্ঞরা হেকমতইয়ারকে ঠেকিয়ে আহমেদ শাহ্ মাসুদের বাহিনীকে কাবুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শহরটিকে দখল করার সুযোগ করে দেয়। পাকিস্তানের এহেন সিদ্ধান্তের কারণ যদিও পাকিস্তানীরা কখনও ব্যাখ্যা করে নি তবে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত কারণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। পাকিস্তান চাইছিল যে, পেশাওয়ারের সমঝোতা মোতাবেক বোরহান উদ্দীন রাব্বানী, মুজাদ্দিদীর অন্তর্বর্তীকালীন তিন মাসের সময়সীমা পার হবার পর অস্থায়ী সরকার গঠন

www.nagorikpathagar.org

করে আফগানিস্তানে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পথ প্রশস্ত করুক। দ্বিতীয়ত: দীর্ঘ সময়ের জন্যে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকলে বাইরের অন্যান্য দেশ বিশেষ করে রাশিয়া এবং ভারতের অনুপ্রবেশ অত্যন্ত সহজ হবার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত: কাবুলে দুর্বল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার বৃহত্তর পশতুন সংগঠনগুলো এবং পাকিস্তানের উপরেই নির্ভরশীল থাকবে বেশী। সর্বশেষে হেকমতইয়ারের সাথে জিয়াউল হক উত্তর পাকিস্তান সরকারের দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। এসব কারণেই পাকিস্তান গৃহযুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির জন্যেই এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে।

যখন আহমেদ শাহ্ মাসুদ কাবুল প্রবেশ করে মুজাদ্দিদীকে সর্বসমম্মতিক্রমে তিন মাসের জন্যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকে সমর্থন করলে আহমেদ শাহ মাসুদকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্য দিকে কমাণ্ডার আব্দুল হককে কাবুলের পুলিশ প্রধান আর পীর সৈয়দ গীলানীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বহাল করলেও হিকমতইয়ার আর দোস্তামের আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

চারদিকের এ অরাজকতার মধ্যে পেশাওয়ার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাবুলে স্থানান্তরিত করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্যান্য মন্ত্রীত্ব সাত গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে বন্টন করলে কোন গ্রুপই এসব নিয়োগকে তাদের উপযুক্ত প্রাপ্য বলে স্বীকার করতে পারে নি। মন্ত্রিসভা কাবুলে চলে এলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সমগ্র কাবুল আবার চরম অরাজকতায় নিমজ্জিত হয় এবং শহরের প্রতিটি রাজপথ আর গলি দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। স্মরণযোগ্য যে, নজিবুল্লাহ্র সময়ও দোস্তামের বাহিনীই কাবুলের নিয়ন্ত্রণেই ছিল এবং এক্ষণেও ঐ একই বাহিনী কাবুলের রাজপথের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়াতে অবস্থার অকস্মাৎ অবনতি হয়। তাজিক আর উজবেকদের হাতে হাজার হাজার পশতুন নিধন হতে থাকে।

অস্থায়ী সরকার কাবুলে চলে আসার নব্বই দিন পর বোরহান উদ্দিন রাব্বানী মুজাদ্দিদীর স্থলে রাষ্ট্রপতি নিয়োজিত হলে কাবুলে তথা আফগানিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ তাজিকরা প্রথমবারের মত সরকার পরিচালনায় প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে যখন বোরহানউদ্দিন রাব্বানী রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয় ঐ সময়েই দোস্তাম মাসুদের দলত্যাগ করে তার বাহিনী নিয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। এ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাবুলে প্রতিদিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথে শুরু হয় আন্ত গ্রুপ বিবাদ। প্রমাদ গুণতে থাকে কাবুলের বাসিন্দারা। অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বড় শহরগুলোতে প্রায় একরকম অবস্থাই বিরাজমান থাকে।

কাবুলে অন্যান্য গ্রুপের সাথে পাকিস্তানের ISI এর তৎপরতা বাড়তে থাকে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ তার পূর্বসূরী জিয়া আর আখতার আব্দুর রহমানের মত নিজেকে কাবুলের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানীদের মধ্যে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ হারাবার ব্যথা এবং লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আফগানিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠে। এরই প্রচেষ্টারত নওয়াজ শরিফের বেসামরিক সরকারও ISI এর প্রাধান্য বজায় রাখে। সমগ্র আফগানিস্তানের বিষয়টি CIA এর পরিবর্তে ISI এর হাতে চলে আসে এবং এর পর থেকে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ISI এক ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

এদিকে পেশাওয়ারে গঠিত সর্বগোত্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিল সাত গ্রুপের কর্তৃত্বকে শেষ করে সরকারকে আরও 'ব্রড বেজ্‌ড' করবার জন্যে আমেরিকা এবং জাতিসংঘ উভয়ের নিকটই আবেদন জানায়। তাদের মতে অতি স্বত্বর কাবুলে আরও 'ব্রড বেজ্‌ড' গ্রহণযোগ্য সরকার না হলে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের অবসান সম্ভব হবে না। এসব কমাণ্ডাররা স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, পেশাওয়ার সেভেন গ্রুপ তৈরী করা হয়েছিল CIA/ISI এর তত্ত্বাবধানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের জন্যে, পরবর্তীতে কোন সরকার গঠনের জন্যে নয়। তাদের এ আবেদনে সাড়া দেয়ার মত জাতিসংঘের তখন মনমানসিকতা ছিলনা আর আমেরিকার বুশ প্রশাসন তখন পূর্বইউরোপ নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই আফগানিস্তানের মত পশ্চাদপদ অঞ্চলের জন্যে তার নিকট সময়ই ছিল না।

পাকিস্তানের জন্যে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। বিগত একদশকের যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থীকে পাকিস্তান এককভাবে তার ভূমিতে শরণ দিয়েছিল। এ শরণার্থী কাবুল তথা সমগ্র আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে নিজের দেশে ফিরতে পারছিল না। এদের অনেকেই পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্তানের স্বগোত্রীয় পশতুনদের সহায়তায় অবৈধভাবে থেকে যাওয়া মনস্থ্ করলে পাকিস্তান সরকারের জন্যে এদের খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে বৃদ্ধি পেতে থাকে মাদকাশক্তি, মাদকের চোরচালনী আর অবৈধ অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা । সে সাথে পাকিস্তানের

www.nagorikpathagar.org

সমাজে হিংসা আর হানাহানি বৃদ্ধি পায়। জন্ম নেয় সন্ত্রাসী গ্রুপের। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো অর্থ আর উপকরণের অভাবে তাদের কার্যক্রম হ্রাস করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় জানুয়ারী ১৯৯২ সনে আমেরিকা এবং নব্যস্থাপিত রাশিয়ান ফেডারেশান আফগানিস্তানে সমস্ত প্রকার অস্ত্র গোলাবারুদ যোগান দেবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এপরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রথম বারের মত পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ নওয়াজ জানজুয়া জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শান্তি পরিকল্পনার সাথে একমত প্রকাশ করে, হেকমতইয়ারের পক্ষপাতিত্ব না করে নিজে রোমে নির্বাসিত বাদশাহ জহির শাহের সাথে দেখা করে তাকে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কাবুলে সরকার গঠন করে 'লোয়া জিরগা' পুনঃগঠনের মাধ্যমে দেশে একটি নির্বাচিত সরকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানায়। জানজুয়ার এ পদক্ষেপে হিকমতইয়ার প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং বৃদ্ধ জহির শাহের আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

রোম থেকে ফিরে এসে জানজুয়া তৎকালীন ISI প্রধান জেনারেল আসাদ দুররানীকে আফগানিস্তানে সকল প্রকার অস্ত্রের যোগান দেয়া এবং আফগান সীমান্তে সমস্ত প্রশিক্ষণ শিবির বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। জানজুয়া, জিয়ার সময়কার ISI প্রধান, তৎকালীন মুলতানের কমাণ্ডার হামিদগুলকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতিও দেয়। এর কারণ হামিদগুলের সাথে হেকমতইয়ারের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে হামিদগুল আফগান পলিসিতে রদবদলের প্রচেষ্টায় প্রায়ই বাদসাধত।[৪] ঐ বছরেই জানুয়ারী ২৭, জেনারেল জানজুয়া সরকারীভাবে আফগানিস্তানে জাতিসংঘের পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সম্মেলন ডাকলে হিকমতইয়ার ও অন্যান্য ইসলামিক কট্টরপন্থীদের সাথে মিলে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গ্রহণে অপারগতা এবং আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যেতেই অস্বীকৃতি জানায়।

যাই হোক রাব্বানী রাষ্ট্রপতি হবার পর জাতীয় জীবনে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় হেকমতইয়ারকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে অনেক চাপাচাপির পর হেকমতইয়ারের বাহিনীকে শান্ত করানো হয়। যদিও হিকমতইয়ার শুরু থেকেই আফগানিস্তানের প্রথমে রাষ্ট্রপতি হবার ইচ্ছা পোষণ করলেও সে ইচ্ছাকে আপাতত দমিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

৪। Afghanistan Wars 1839-1992 : P. 232.

www.nagorikpathagar.org

কাবুলে রাব্বানী, হেকতইয়ার এবং মাসুদের ত্রয়ী শক্তি কিছুদিনের জন্যে একরকম একটি যুগ্ম সরকার গঠন করলেও আফগানিস্তানের অন্যান্য শহর এবং অঞ্চলগুলোতে আত্মঘাতী যুদ্ধের অবসান হয় নি; বরং বিভিন্ন জায়গায় পুরানো স্টাইলে যুদ্ধবাজ নেতাদের পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়।

যদিও একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কাবুলে এতদিন আন্তদলীয় সরকার টিকে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল তবুও এদের অন্তরদ্বন্দ্বের শেষ কখনই হয় নি। অনেক কারণেই পাকিস্তানের সাথে হেকমতইয়ারের সম্পর্ক অস্বাভাবিকভাবে খারাপ হতে থাকে আর রাব্বানী-মাসুদ-দোস্তাম সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে সবসময়েই পশতুন এবং হিকমতইয়ারকে তাদের বিরুদ্ধাচারণের কারণে সন্দেহ করে আসছিল।

১৯৯৫ সনের শেষের দিকে রাব্বানীর সাথে পশতুন প্রধান দলগুলোর বিশেষ করে হেকমতইয়ারের সাথে নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একদিকে আহমেদ শাহ মাসুদ এবং অন্যদিকে কাবুলে আর এক যুদ্ধবাজ নেতা দোস্তাম ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতেই থেকে যায়। কাবুল তখনও অশান্ত। আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে আন্তগোত্র এবং আন্ত মুজাহিদী গ্রুপের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে কলহ সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হতে থাকলে কাবুলে সরকার এসব দ্বন্দ্ব মিটাতে অপারগ হয়ে পড়ে। বিরাজমান অশান্ত পরিবেশের কারণে ক্রমেই সাধারণ আফগানদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। একদা সমরনায়ক হিসেবে পরিগণিত মুজাহিদ নেতারা নিজস্ব স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে জনগণের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আপামর জনগণ অপেক্ষায় থাকে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণকর্তা বা কোন দৈব শক্তির আবির্ভাবের। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে অভ্যুদয় হয় তালেবান নামক এক শক্তির।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং এদতঅঞ্চলে দুটি নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম লগ্ন থেকেই আফগানিস্তানের ভৌগলিক গুরুত্বের কদর আন্তর্জাতিক থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে চলে আসে। অন্যান্য দেশের মত আফগানিস্তান দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বের সন্ধিস্থলে না থাকায় এদেশের গুরুত্ব যেমন বোঝা যায় নি তেমনি এদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়েও পশ্চিমা বিশ্ব তেমন মাথা ঘামায় নি। তৎকালীন আফগানিস্তান সরকার কয়েকবার চেষ্টা করেও পশ্চিমা

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের নজর কাড়তে পারে নি। সামান্যতম অর্থসাহায্যও আফগানিস্তান পশ্চিমা বিশ্ব থেকে য়োগাড় করতে পারে নি। এহেন অবস্থায় এবং ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারণেই আফগানিস্তান সোভিয়েত রাশিয়ার মুখাপেক্ষি হয়ে পড়ে বেশী।

কাবুলের যতটুকু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এবং অবকাঠামোর উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার সিংহভাগই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সরাসরি সাহায্য সহোযোগিতার ফসল। স্বাভাবিক কারণে রাশিয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্যও জাতীয় রাজপথগুলো পুনঃনির্মাণ অথবা পুনঃবর্ধন করা হয়। আফগানিস্তানে প্রধান সড়ক পথ প্রতিটি বড় শহরকে সংযুক্ত করলে এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তলন, সঞ্চালন থেকে শুরু করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই রাশিয়ার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এমনকি আফগান সশস্ত্রবাহিনীর প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে অস্ত্রের সরবরাহ ইত্যাদিও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মুখাপেক্ষি ছিল। তবুও বাদশাহ জহির শাহ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সবসময়েই যত্নবান ছিল।

আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৯৪৭ সনের পর থেকেই পাকিস্তানের সাথে পশতুনদের এবং পশতুনিস্তান নিয়ে বিরোধের কারণে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল। এর মূলে ছিল খান আব্দুল গফফার খানের 'রেডসার্ট' আন্দোলন আর সে সাথে পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু ভারতের উস্কানী। আফগানিস্তানে রুশ-ভারতের প্রভাবই ছিল পাকিস্তানের মাথা ব্যথার কারণ। অন্যদিকে আমেরিকা তথা উন্মুক্ত বিশ্বের জন্য পাকিস্তান ছিল সম্ভাব্য দক্ষিণমুখী রুশ আগ্রাসনের প্রথম সারির দেশ।

১৯৭৩ সনের পর থেকে আফগানিস্তানের উপরে রাশিয়ার প্রভাব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেলেও তখনও তাবদ বিশ্ব ততটা সংকিত হয় নি। আর ঐ সময় থেকেই কাবুলে চলতে থাকে ক্ষমতার লড়াই। আর এ লড়াই একদিকে যেমন সীমাবদ্ধ থাকে রুশ সমর্থিত সোসালিস্ট পার্টিগুলোর মধ্য তেমনি এদের বিরোধিতায় গড়ে উঠে ইসলামপন্থী গোপন দলগুলো। শুরু হয় ত্রিমুখী সংঘাত। এ সংঘাত ভয়াবহ রূপ নেয় ১৯৭৮ সনের 'সওর রেভ্যুলিউশনের' পরপর। সেই থেকে ইসলামপন্থীদের সাথে একদিকে খোলখুলি দ্বন্দ্ব অন্যদিকে বহিঃবিশ্বের হস্তক্ষেপের মুখে পড়ে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানে ইসলামী বিরোধিতা শুরু হয় ১৯৭৩ সনে কিন্তু এটার

www.nagorikpathagar.org

জেহাদী রূপ নেয় ১৯৭৯ সনের সোভিয়েত রাশিয়া সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং শারীরিক উপস্থিতির পর থেকে। আর সেই থেকেই উগ্রবাদী আর মধ্যপন্থী মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে জেহাদে পরবর্তী পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। এখানে একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় প্রয়োজনীয় যে, আফগান ইতিহাসে এবং সামাজিক পটভূমিতে যুদ্ধবাজ নেতাদের মধ্যে গোত্রীয় ভিত্তিক বৈরিতা থাকলেও বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রায় সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যা হয়েছিল সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময়েও।

পাকিস্তানের পেশাওয়ার সেভেন বলে খ্যাত মুজাহিদ গ্রুপগুলোই ছিল এ জেহাদের প্রধান যোদ্ধা সংগঠন এবং মাত্র গুটিকয়েক নেতা এবং মাঠ পর্যায়ে কমাণ্ডারগণ ছিল সর্বাগ্রে। এসব বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে মুজাদ্দিদী, রাব্বানী, পীর গিলানী আর হেকমতইয়ার শুরু থেকেই পাকিস্তানী এবং আরও পরে আমেরিকানদের নেক নজরে ছিল। জেহাদী হিসাবে এদের সুনাম ছিল অন্যদের থেকে বেশী। পশতুন হিকমতইয়ার হিসেবে পাকিস্তানে সমাদর ছিল অন্যদের থেকে একটু আলাদা। অন্য কমাণ্ডারদের মধ্যে আহমেদ শাহ মাসুদ, আব্দুল হক প্রমুখ ছিল মুখ্য। কাজেই ১৯৮৯ সনে সোভিয়েত কর্তৃক আফগানিস্তান ত্যাগের পরে স্বভাবতঃই ক্ষমতার দ্বন্দ্বও চলে ঐসব নেতা আর কমাণ্ডারদের মধ্যে। এদের সাথে যোগ দেয় আরও একটি নাম, বারবার উচ্চারিত এ ব্যক্তি হল আব্দুর রশিদ দোস্তাম। দোস্তাম আজও আফগান রাজনীতি তথা রণক্ষেত্রের রহস্যময় ব্যক্তি বলে পরিচিত এবং ভবিষ্যতেও দোস্তাম আফগানিস্তানে একটি ফ্যাক্টর হয়ে থাকবে।

কাবুলের পতনের পর মুজাহিদদের মধ্যকার আন্ত গ্রুপ সংঘাতও এসব নেতাদের মধ্যেই সীমিত থাকে। মুজাদ্দিদী, রাব্বানী, হেকমতইয়ার, মাসুদ ও দোস্তাম হয়ে উঠে সোভিয়েত উত্তর আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারক। অন্যরা ক্রমেই হারিয়ে যায় ইতিহাসের অন্ধকারে। আজও ক্ষমতার লড়াইয়ে এ কয়টি নামই হয়ে আছে 'নর্দান এলায়েন্স' বা 'উত্তর জোট' নামক রাজনৈতিক ও সামরিক গ্রুপে। পুনরায় এ গ্রুপই পরিণত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কূটনীতির দাবার ঘুঁটি।

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্জাতিক কোম্পানী-তেল-গ্যাস পাইপ লাইন ও তালেবান

'সরিয়ত আর সুন্নার প্রয়োগেই আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ।'

হঠাৎ করেই বিশ্বের যাবতীয় ভাষায় তালেবান শব্দটি সংযোজিত হল। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পরের দিন থেকে অখ্যাত তালেবানরা পৃথিবীর তাবৎ নেতাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বে তালেবান ছাড়া আর কোন বিষয়ই কোন ধরনের মিডিয়াতেই স্থান পায় নি। তালেবান আর আফগানিস্তান এক হয়ে ছিল অথচ এদের মধ্যে মুজাহিদদের মত কোন বড় নেতার নাম জড়িত ছিলনা। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর ভূঁইফোঁড় শক্তির মত বিশ্বের মঞ্চে প্রধান চরিত্রে পরিণত হল। তালেবান নেতাদের বেশীর ভাগই একসময় ছিল নাম নাজানা যুদ্ধাহত মুজাহিদ।

১৯৯৪ এর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে দু'বছরের মধ্যে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে তাকে এতদঅঞ্চলের ইতিহাসের অস্বাভাবিক ঘটনা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তালেবানদের ভূঁইফোঁড় উৎপত্তি মনে হলেও তেমনটা কিন্তু নয়। এ শক্তির উৎপত্তির পেছনে সোভিয়েত উত্তর আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা এবং মুজাহিদ নেতাদের নৈতিক স্খলন ইত্যাদি বলে মনে হলেও এর প্রধান কারণ ছিল ইসলামপন্থী একটি স্থিতিশীল সরকারের অনুসন্ধান। অনেকেই একে এককভাবে পাকিস্তানের প্রচেষ্টা বলে মনে করলেও আমেরিকাও এর সমর্থনে ছিল। আমেরিকার সমর্থনের একমাত্র কারণ ছিল অনেকটা অর্থনৈতিক। আর পাকিস্তানের ছিল অর্থনৈতিক এবং সামরিক উভয়ই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উভয়দেশকেই হতাশায় ভুগতে হয়। তালেবানরা বৃহৎ অংশে পশতুন তাই পাকিস্তানের সামাজিক বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এদের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল অধিক।

www.nagorikpathagar.org

তালেবান নামক শক্তির উত্থানের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা জড়িত থাকলেও এর সামরিক শক্তিমত্তার উৎস আজও রহস্যাবৃত। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাবুলে বিবাদমান মুজাহিদ গ্রুপের এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিরাজমান অরাজকতা থেকে দেশকে পরিত্রাণ দেয়া সে সাথে একটা দুর্নীতিমুক্ত ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলা। যুদ্ধোত্তর আফগানিস্তানে যে স্থিতির প্রয়োজন ছিল তা যুদ্ধবাজ নেতাদের স্বার্থান্বেষণের কারণে সম্ভব হয় নি বিধায় তালেবানেরা এর বিরুদ্ধে অতি সহজেই জনসমর্থন পায়। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আত্মাহুতি দেবার মন্ত্র নিয়েই তালেবানরা যুদ্ধবাজ নেতাদের প্রতিহত করবার জন্য সংগ্রামে ব্রত হলে ক্রমেই এরা হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য।

এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মোল্লা ওমর নামক এক যুবকের দ্বারা প্রবহমান 'অ-ইসলামিক' কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর প্রাক্তন মুজাহিদ দেশের অরাজকতার বিরুদ্ধে মাত্র ১৬ জন সঙ্গী নিয়ে সর্বপ্রথম সমরে আর্বিভূত হয়। ঐসময়ে যখন প্রাক্তন মুজাহিদরা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেয়।[১] এসব তথাকথিত মুজাহিদগণ মহাসড়কে চাঁদাবাজি, রাহাজানি আর ডাকাতির পথ বেছে নিলে মোল্লা ওমরের মত অনেক যুবকই এদের প্রতিহত করবার জন্য সশস্ত্র বিরোধিতায় নিঃস্বার্থে নেমে আসে। ক্রমেই মোল্লা ওমরের সাথে তার এলাকা কান্দাহারের 'সিংগেসারের' প্রায় সমস্ত যুবকই যোগ দিলে এরা সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে থাকে। উল্লেখ্য, এদের সবাই বয়সে তরুণ এবং মাদ্রাসার ছাত্র। এদের মধ্যে অনেকের জীবনের দশবছর পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে এবং সীমান্ত প্রদেশের শিবিরে কেটেছে। ক্রমেই ওমরের দল কান্দাহার থেকে হেরাতের রাজপথ দুর্বৃত্ত মুক্ত করে।

এ সময়ে পাকিস্তানে বেনজীর ভুট্টো দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতায় এবং তার ধর্মমন্ত্রী ছিল জে ইউ আই (JUI) নেতা মওলানা ফজলুর রহমান। পাকিস্তান সরকারের নিকট মোল্লা ওমরের দলের সংবাদ ISI এর মাধ্যমে পৌঁছালে ফজলুর রহমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন জেনারেল নাসিরুল্লাহ্ বাবর এ নতুন দলকে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে পরিণত করবার সংকল্পে সর্বপ্রকার সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে।[২]

১। Here comes Taleban 'News Line', February 1995.

২। A discussion with the writer and Amir Sultan Alim Colonel Imam.

www.nagorikpathagar.org

প্রাথমিকভাবে তালেবানদের হাতিয়ার মৌলভী ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামীর তরফ থেকে যোগান দিলেও এদের সাহায্যার্থে হেকমতইয়ার বিরোধী অনেকেই এগিয়ে আসে যাদের মধ্যে মুজাহিদ কমাণ্ডার হাজী বশির এবং আব্দুল গফফার আখন্দজাদ প্রমুখ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ওমর আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেই নিজেদের শক্তির উৎস খুঁজে বের করবার প্রচেষ্টায় কিছু কিছু প্রাক্তন মুজাহিদ কমাণ্ডারদের সাহায্য নিয়ে কান্দাহারের বিস্তৃর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্যায়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর কাবুলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বোরহানউদ্দিন রাব্বানীর সাথে যোগাযোগ করে কান্দাহারের পরিস্থিতি অবহিত করে। তখনও হেকমতইয়ারের বাহিনী কাবুলে উপর্যুপরি রকেট হামলা অব্যাহত রেখেছিল। রাব্বনী তালেবানদের হেকমতইয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও রাব্বনীর সাহায্য তালেবানদের হাতে পৌঁছে নি।

তালেবানরা অবশেষে পাকিস্তানের মওলানা ফজলুর রহমান, মওলানা সামিউল হক এবং প্রাক্তন জেনারেল হামিদগুলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। ঐ সময়ে বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশে আফগান শরণার্থীদের জন্য স্থাপিত এবং পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে প্রচুর আফগান ছাত্ররা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষারত ছিল। সীমান্তের এ মাদ্রাসাগুলো পাকিস্তানের ধর্মীয় রাজনৈতিক দল বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান ভিত্তিক দল জে ইউ আই (JUI) এর প্রভাবে পরিচালিত হতো। আর এ দলেরই নেতা হল মওলানা ফজলুর রহমান যে নিজেই পশতুন।

বেনজীর ভুট্টোর দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় আসার পূর্বেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দাভাব যাচ্ছিল, বিশেষ করে রপ্তানীক্ষেত্রে। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ এবং বিশাল সংখ্যার শরণার্থী উপস্থিতি, সবমিলিয়েই রপ্তানীমূলক ব্যবসায় স্থবিরতার কারণেই বৈদেশিক মুদ্রাপরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে গিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল নতুন বাজার সৃষ্টি করার। মধ্যএশিয় প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গুলো বিশেষ করে উজবেকিস্তান হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টার সফলতার পর কাবুলের পরিস্থিতির কারণে অন্যপথের খোঁজে কোয়েটা-চমন-কান্দাহার-হেরাত-মাজার-ই-শরিফ রাস্তার প্রয়োজনীতা অনুভব করা হয়। আর এ কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে এ রুটের নিরাপত্তার। এহেন পরিস্থিতিতে এবং তালেবানদের ক্রমবর্ধমান সামরিক অগ্রগতির সমন্বয়,

www.nagorikpathagar.org

অস্ত্র আর প্রশিক্ষণের আশ্বাস দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তানের SSG থেকে প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে গেরিলা যুদ্ধের যাবতীয় রণকৌশল শিখানো হয় (অনেক ভারতীয় ভাষ্যকার এ পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল মোশারফের সম্পৃক্ততার কথাও বলে বস্তুত কর্ণেল ইমাম-ই ছিল প্রধান)।

একদিকে পাকিস্তানের ISI আর SSG সমর্থন অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলো থেকে আগত ছাত্রদের তালেবান আন্দোলনে যোগদান সবমিলিয়েই ক্রমেই তালেবানদের শক্তি বাড়তে থাকে। তালেবান শক্তি বর্ধনের সাথে সাথে ক্রমেই দক্ষিণ পূর্ব আফগানিস্তানে হেকমতইয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে স্পিন বলদাকের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং পাশা নামক স্থানের অস্ত্রভান্ডার দখলের সফলতার কারণে সমগ্র আফগানিস্তানে তালেবানদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এর পরে একে একে হেরাত আর মাজার-ই-শরিফ দখল করতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। ক্রমেই এ আন্দোলনের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন জনগণ সমর্থন দিতে থাকলে তালেবান এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৯৬ সনে এর অভ্যুদয়ের পর থেকে প্রায় দু'বছরের মাথায় ১৯৯৭ সনে এর শেষের দিকে কাবুল থেকে রাব্বানী সরকারকে হটিয়ে এবং আহমেদ শাহ্ মাসুদের বাহিনীকে পরাজিত করে তারা কাবুল দখল করে নেয়। ইতিপূর্বেই হেকমতইয়ারের এবং দোস্তামের উজবেক বাহিনী পশ্চাদাপসারণ করে। ১৯৯৬ সনের মধ্যেই তালেবানরা সালাং গিরিপথের দক্ষিণ এবং উত্তরে মাজার-ই-শরিফসহ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ দখল করে নেয়।

কাবুলে প্রবেশের সাথে সাথে তালেবান যোদ্ধারা প্রায় চার বছর আত্মগোপন অবস্থায় থাকা ডা. নজিবুল্লাহ এবং তার এক ভাইকে জাতিসংঘের চৌহদ্দী থেকে বের করে প্রথমে দৈহিক নির্যাতন চলায় এবং পরে কাবুলের জনসন্মুখে ফাঁসী দেয়। এককালীন রাষ্ট্রপতি নজিবুল্লাহ্ ও তার ভ্রাতার লাশ বেশ কয়েকদিন কাবুলের প্রধান সড়কের পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এ অমানবিক কাজটি পশ্চিমা বিশ্বে তালেবান আন্দোলনের এক ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ তালেবানদের দখলে এলেও উত্তরে পাঞ্জশীর উপত্যকাসহ প্রায় ১০ ভাগ রাব্বানী সমর্থিত আহমেদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে থেকে যায়। এ বাহিনীর সাথে অন্যান্য ছোটখাট দলও যোগ দেয়। 'নর্দার্ন এলায়েন্স' নামে পরিচিত এ জোট বিগত পাঁচবছর ধরে

www.nagorikpathagar.org

তালেবানদের সাথে কাবুল দখলের প্রচেষ্টায় যুদ্ধে লিপ্ত যদিও এ 'এলায়েন্স' সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী 'তাজিক' দের প্রাধান্য তবুও অন্যান্য গোত্রের বিভিন্ন দলছুটরাও সামিল রয়েছে। অপর দিকে মাজার-ই-শরিফের উত্তরে আব্দুর রশিদ দোস্তামের বাহিনী ইদানীং নর্দার্ন এলায়েন্সের সাথে যোগ দিয়েছে। এ লেখা পর্যন্ত (৯ নভেম্বর ২০০১) মাজার-ই-শরিফ দখল নিয়ে যুদ্ধ শেষে নর্দার্ন এলায়েন্স শহরটি পুনঃদখল করে। নর্দার্ন এলায়েন্সের সামরিক নেতা আহমেদ শাহ মাসুদ গত অক্টোবর ৯, ২০০১ সনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় মৃত্যুবরণ করলে এর গতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তবে আফগানিস্তানে আমেরিকার হামলা শুরু হলে এ এলায়েন্স দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে।

যে সব পন্ডিত ব্যক্তি, গবেষক বা সামরিক বিশেষজ্ঞরা আফগানিস্তানের চলমান ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখেছে তাদের নিকট তালেবানদের হঠাৎ অভ্যুদয় এবং দু'বছরের মাথায় দোস্তাম, মাসুদ আর হেকমতইয়ারের মত যুদ্ধবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রাপ্তিতে আশ্চর্যান্বিত হবার কথা। তালেবানদের এ উত্থান সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনার অংশ বলে মনে হয়। তালেবানদের সাহায্যে প্রথমত এগিয়ে আসে বেশ কয়েকজন মুজাহিদ কমাণ্ডার যারা সোভিয়েত পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে নি। এদের মধ্যে রয়েছে জালালউদ্দিন হাক্কানী এবং নজিবুল্লাহর এককালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাহনওয়াজ তানাইয়ের যোদ্ধারা। আরও শোনা যায় যে, দোস্তামের বাহিনীর এক অংশ তালেবানদের সাথে যোগ দেয়। এদের প্রশিক্ষণ, যার মধ্যে ট্যাংক যুদ্ধ থেকে, উড়োজাহাজ চালনা পর্যন্ত পাকিস্তানের সহায়তায় হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান তালেবানদের জনবল দিয়েও সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সনে ১০০ জন নিয়ে অভিযান শুরু করে পরবর্তীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে তালেবানরা। এদের সহায়তায় আছে মধ্যপ্রাচ্যের স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধার দল। আজ কারও সন্দেহ নেই যে, মাত্র সাত বছরের মাথায় তালেবান হয়ে উঠেছে এক দৃঢ়চিত্ত বাহিনী যেটি আজ পর্যন্ত (০১-১১-২০০১) বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকা এবং মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় দু'মাস প্রতিরোধ করতে পেরেছিল।

www.nagorikpathagar.org

তালেবান সামরিক শক্তি গত পাঁচবছর উত্তর জোট বা নর্দার্নএলায়েন্সকে পাঞ্জশীর উপত্যকা থেকে বের হতে দেয় নি। প্রবল বিরোধিতার মধ্য দিয়েও রাশিয়া, ভারত আর অন্যান্য দেশ এমনকি ইরানের সাহায্য সত্ত্বেও উত্তর জোট তালেবান সরকারের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি। আজ (১২ই নভেম্বর ২০০১) প্রায় চার সপ্তাহ অনবরত আমেরিকার প্রচণ্ড বোমা হামলার পরে উত্তরজোট মাজার-ই-শরিফ প্রায় চার বছর পর পুনঃদখল করতে সক্ষম হয়।

আমেরিকা তালেবানদের উত্থানে ঐ সময়ে মৌন সায় দিয়েছিল বলেই পাকিস্তান এদের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করতে পেরেছিল অন্যথায় সম্ভব হতো না। আর মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় ওসামা বিন লাদেনের এবং তালেবানদের ইসলামিক মৌলবাদের কারণেই সমগ্র বিশ্বে এরা ধিকৃত বলে প্রচারিত হলেও আমেরিকার তালেবান বিরোধের প্রকৃত রহস্য অন্য কোথাও অন্তর্নিহিত রয়েছে। আমেরিকার তালেবান বিরোধের লুক্কায়িত কারণটি হল আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষত আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে ক্রম বর্ধমান তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা এবং তা বাজারজাতকরণ।

পৃথিবীর বর্তমান তেল এবং গ্যাসের চাহিদা আগামী বিশ বছরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি চলে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে। অপরদিকে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্তমানে উপসাগরীয়, উত্তর আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে তেলের অব্যাহত ব্যবহার এবং উত্তলন প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি চলে আসছে। অগামী ৩০ বছরে এতদঅঞ্চলের রিজার্ভ তেলে হাত দিতে হবে। তাছাড়া রয়েছে এসব অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা। সবকিছু মিলিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে এবং বর্তমান ওপেক (OPEC) দেশগুলোর বিপরীতে অন্যান্য অঞ্চলের তেল ও গ্যাস সম্পদকে আহরণ করবার জন্য পৃথিবীর তাবদ উন্নতদেশের বেসরকারী কোম্পানী গুলোর তৎপরতা বেড়েছে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী। তেল এবং গ্যাসের নতুন ক্ষেত্র হল মধ্য এশীয় দেশগুলো যার মধ্যে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ।

এসব দেশের তেল ও গ্যাসের সন্ধান এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হলেও এর ব্যাপক বাণিজ্যিক পরিবহন এতদঅঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্থায়ী ও দায়িত্বশীল সরকারের অভাবে এখনও সম্ভব হয় নি। মধ্যএশিয়ার

www.nagorikpathagar.org

তেল এবং গ্যাস পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপের জন্যে এবং পরবর্তীতে আমেরিকায় রপ্তানীর জন্যে তেমন বেগ পেতে হচ্ছেনা। এরকারণ বর্তমানে 'বাকু' অঞ্চলের গ্যাস পাইপলাইন ব্যবহার এবং ঐ অঞ্চলে মোটামোটি শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কারণে। যেখানে একমাত্র সমস্যা, 'চেচনিয়ায়' সেটাও সমাপ্তির পথে।

পৃথিবীর যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাত কোম্পানী মধ্যএশীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী পুঁজি লগ্নি করেছে বা করবার চেষ্টা করছে তার মধ্যে বৃহত্তম আমেরিকার কোম্পানী ইউ এন ও সি এ এল (UNOCAL ইউনিকল); সোকাল (SOCAL) ইত্যাদি।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ২০১০ সনের মধ্যে সমগ্র ওপেক (OPEC) এর উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় বিশভাগ পরিমাণ তেল উত্তোলন করবার জন্য মধ্যএশীয় দেশগুলো তৈরী হবে। এখানে উপরে উল্লেখিত দুটো কোম্পানী নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের পরপরই সোকাল কর্তৃক (SOCAL) মধ্য এশীয় তেল ট্রান্স-আফগান পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান হয়ে আরব সাগরে নির্মিত টারমিনালে পৌঁছানোর কথা ছিল। সঙ্গতঃ কারণে মধ্যএশিয়ার তেল উত্তোলন এবং বাজারজাত করণের ব্যাপারে দূরত্ব কম হলেও ইরানের ভূ-খন্ড ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এর বিপরীতে পাকিস্তানের ভূ-খন্ডই সবচেয়ে নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য এবং এসব পরিকল্পনার আওতায় মধ্যএশিয়া হতে দক্ষিণমুখী যে কোন পথ ইরানকে বাদ দিয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়েই ব্যবহার করতে হবে। সোকাল (SOCAL) এর ভবিষ্যৎ প্ল্যানে তুর্কমেনিস্তান থেকে যে পাইপলাইনটি দক্ষিণে নেমে আসার কথা ছিল তার প্রধান পথটি কাবুলের উত্তরে অবস্থিত বিধায় বিগত দশবছরে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৫ সনে তালেবান কর্তৃক আফগানিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল দখল এবং শৃংখলা ফিরিয়ে আনার প্রেক্ষিতে সোকালের সামনে নতুন পরিবর্তিত সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুলে যায়। এ সংক্ষিপ্ত পথটি হল তুর্কমেনিস্তান থেকে হেরাত-কান্দাহার হয়ে বেলুচিস্তানের সুই গ্যাস লাইনের সাথে সংযোগ এবং তেলের জন্যে সমান্তরালে নতুন পাইপলাইন বসানো।

অন্যদিকে তেল ও গ্যাসের ইউরোপীয় বাজার চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে বিধায় পৃথিবীর বিশেষ করে আমেরিকার বড় কোম্পানীগুলো মধ্যএশীয়

www.nagorikpathagar.org

দেশগুলোর উৎপাদিত তেল এবং গ্যাসের রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান এশিয়ান বাজারের দিকে নজর দেয়। অন্যান্য এশীয় দেশের মধ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে অগ্রগামী চীন এবং ভারতসহ বাদবাকী দেশসমূহে জ্বালানীর প্রয়োজনীয়তা বাড়াতে এ অঞ্চলে বাজারজাতের প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি প্রধান পরিকল্পনার বিষয়ে দাঁড়ায়। কাজেই তেল এবং গ্যাসের উভয়ের পরিবহনের জন্য প্রয়োজন নতুন করে পাইপ লাইনের বিন্যাস। আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আর অবিশ্বাসের কারণে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগরের টার্মিনাল পর্যন্ত নিয়ে পরিবহন ও সরবরাহ করবার পবিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এমনকি পশ্চিম ও পূর্ব চীনের জন্যে পাইপ লাইন ও আফগানিস্তানের উপর দিয়েই স্থাপনার পরিকল্পনাও হাতে রয়েছে। সে সাথে রয়েছে খোদ আফগানিস্তানে প্রচুর তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের সম্ভাবনা।

যদিও ভারত-পাকিস্তানে নিজস্ব গ্যাস পাইপ লাইন রয়েছে সেগুলোর সাথে মধ্যএশীয় গ্যাস পরিবহন লাইন সম্প্রসারণ করা সম্ভব তবে তেলের ক্ষেত্রে তেমনটি হবেনা। কারণ এতদঅঞ্চলে সাধারণত জ্বালানী তেল মধ্যপ্রাচ্য থেকে জাহাজ যোগেই আসে। সে ক্ষেত্রে মধ্যএশীয় তেল জাতীয় পদার্থও একমাত্র পাইপ লাইন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বাজারজাত করা সম্ভব নয়। এ জন্যেও প্রয়োজন আফগান ভূ-খন্ডের।

এক্ষণে এতদঅঞ্চলে বাজারের অন্বেষা, সম্ভ্যাব্য উত্তোলন এবং বাজার জাত করণের জন্যে UNOCAL, EXXON, AMOCO এবং BENZZOIL তৎপর থাকলেও UNOCAL এদের মধ্যে শীর্ষে (UNOCAL বাংলাদেশেও তৎপর)। ১৯৯৩ সনে UNOCAL পাকিস্তানের এবং তুর্কমেনিস্তানের সাথে যৌথ প্রযোজনায় উৎপাদিত তেল গ্যাস পাকিস্তানে বাজারজাত করণের জন্যে পাইপ লাইন তৈরীর কাজের এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। UNOCAL এর সাথে তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে এসব বাজারজাত করার নিমিত্তে সে দেশের সাথে নতুন পাইপ লাইন তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩] এ চুক্তির আওতায় পাকিস্তানের ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে ভারতমহাসাগরের অঞ্চলে সরবরাহের জন্যে ১.৮ বিলিয়ন ডলারের একটি উত্তোলন এবং মধ্যএশিয়া হতে পরিবহনের পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা যাচাই করাবার জন্যে রাশিয়ার মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীন হবার সাথে সাথেই ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার UNOCAL

৩। Women and Pipe Line: Barnet R. Rubin: P. 286.

www.nagorikpathagar.org

খরচ করে বসে। এরই মধ্যে তালেবানদের উত্থান ও সরকার গঠন পশ্চিমাদেশের স্বীকৃতি না থাকায় UNOCAL পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে না পারায় বর্তমানে দারুণ অর্থনৈতিক লোকসানের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে UNOCAL এর অপারগতা এবং তুর্কমেনিস্তানের সাথে চুক্তি অগ্রগতি না হওয়ায় তুর্কমেনিস্তান ইরানের সাথে সরাসরি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৯৮৮ সনে চুক্তির আওতায় ইরান স্বউদ্যোগে তুর্কমেনিস্তানের সাথে সরাসরি পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে উত্তর ইরানের জন্যে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানী করবে। এ চুক্তি UNOCAL কে আরও চাপের মধ্যে ফেললে UNOCAL আমেরিকাকে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিতে চাপদিতে থাকলে ১৯৯৮ সনের পূর্ব-আফ্রিকার পরিস্থিতির কারণে আমেরিকা এ অনুরোধ বিবেচনা করতে পারে নি।

তালেবানদের উত্থানের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ১৯৭৭ সনে আফগানিস্তানের চুক্তি মোতাবেক গ্যাস সাপ্লাই পুনরায় চালু করতে তালেবান সরকার আগ্রহী হয়ে উঠে। স্মরণযোগ্যযে, এ চুক্তি মোতাবেক উত্তর আফগানিস্তানের সিবারগান প্রদেশে উৎপাদিত গ্যাস উজবেকিস্তানে রপ্তানীর কথা থাকলেও নজিবুল্লাহ সরকারের আগ পর্যন্ত একে পুনঃচালু করা সম্ভব হয় নি। আফগানিস্তানের পরিসংখ্যানে এ গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদন হবে প্রায় ১,১১০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। যাই হোক নজিবুল্লাহর পতনের পরে তালেবান আর উত্তরজোটের সংঘর্ষের কারণে এ রপ্তানীও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। UNOCAL এর সাথে পাকিস্তানীরাও এ গ্যাসফিল্ডে লগ্নি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যা কার্যকর হতে পারে নি।

১৯৯৪ সনে তালেবানদের উত্থান এবং অতিদ্রুত দেশের ৯০ ভাগ দখল করাতে প্রথমে আমেরিকার সায় থাকলেও কাবুল দখলের পর তালেবান সরকারের অমানবিক কার্যকলাপ এদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হতে বিরত থাকে। বিশেষ করে ডাঃ নজিবুল্লাহ এবং তার সহযোগীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে রাজপথে গলিত লাশ ঝুলিয়ে রাখা মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রমাণ দেয়। এসব কার্যকলাপ পাকিস্তান সরকারের জন্যেও বিব্রতকর প্রমাণিত হয়। এর মধ্য আরও যোগ দেয় ধর্মের অজুহাতে মহিলাদের সর্বপ্রকারের অধিকার হরণ এমনকি শিক্ষার পথ বন্ধ করণ, চাকুরীচ্যুতি হতে ভবিষ্যতে চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলা নিয়োগ নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত উপর্যুপরি মানবাধিকার লংঘনের মত কারণে পশ্চিমা বিশ্বে তালেবানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে।

www.nagorikpathagar.org

এসমস্ত কারণেই অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং চাপ থাকা সত্ত্বেও তালেবানদের স্বীকৃতি দেয় নি। অপর দিকে তালেবান সংগঠনকারী দেশ বলে পরিচিত পাকিস্তানের সাথে অনেক কারণেই তালেবান সরকারের সাথে সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হয়। আফগানিস্তানে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন কায়েম করার বিরুদ্ধাচারণ করাতে দু'সরকারের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। কাজেই এসব ঘোলাটে পরিস্থিতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী তেল ও গ্যাস কোম্পানীগুলো যে কোন পন্থা অবলম্বন করে আফগান সমস্যার নিস্পত্তি করবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ অব্যাহত রাখে।[৪]

আমেরিকার কঠোর মনভাবের জন্যেই ১৯৯৯ সনে জাতিসংঘ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অবরোধ জারী করেও তেমন সুবিধে করতে পারে নি। এর মধ্যেই UNOCAL এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তালেবানদের ধর্মীয় গুরু মোল্লা ওমরের সাথে হেরাত-কান্দাহার-চমন পাইপ লাইনের এবং অন্যান্য পরিকল্পনার কথা উঠলে মোল্লা ওমর UNOCAL এর সাথে কোন চুক্তি এমনকি আমেরিকান কোন কোম্পানীকে সম্মতি দেয়া হবে না বলে জানায় এবং তার মতে UNOCAL এর প্রস্তাব আফগানিস্তানের অনুকুলে নয় বলে জানিয়ে আর্জেনটিনার এক কোম্পানী ব্রিদার্সকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরের কাজ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা জানালে UNOCAL সন্তুষ্ট হতে পারে নি। মোল্লা ওমরের এ সিদ্ধান্তের পেছনে ওসামা বিন লাদেনের পরামর্শ ছিল। ব্যবসায়িক আঙ্গিকে পটিয়শী বিন লাদেন UNOCAL এর সাথে চুক্তি পাকাপোক্ত করাবার পূর্বে তুরস্ক, ইরাক আর ইরাক সিরিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তেল এবং গ্যাস লাইনের চুক্তির ধরন দেখে নেবার পরামর্শ দেয়। তালেবান সরকার বেশকিছু সরকারী মিল কারখানা সস্তায় বে-সরকারী খাতে বিক্রির জন্যে পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দেবার পূর্বেও ওসামা রাষ্ট্রীয় ক্ষয়ক্ষতির কথা ওমরকে স্মরণ করিয়ে দিলে এ উভয় কার্যক্রমই স্থগিত করা হয়। এতে পাকিস্তানী পুঁজিপতিরাও সন্তুষ্ট হতে পারে নি।[৫]

ইতিপূর্বেও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ভিত্তিক ছিল তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতিই এককভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিকে পরিচালিত করছে। পৃথিবীর জ্বালানী পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ নিয়ে

৪। UNOCAL : Report to House Committee on the International Relation : Februry 20, 1998.

৫। ইন্টারনেট : ফ্রন্টলাইন ম্যাগাজিন।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা উদ্বিগ্ন বিশেষ করে এশিয়ায় জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য দেশগুলোর উপরে নির্ভরশীল। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন রয়েছে সরবরাহ ক্ষেত্রের বিন্যাস ও সম্প্রসারণ করা। নতুন নতুন গ্যাস এবং তেলের সন্ধান চলছে প্রায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিখন্ডিত হবার পর মধ্যএশীয় অঞ্চলগুলোতে এসব অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়ে উঠলে এতদ অঞ্চলকে পশ্চিমা বিশ্ব নিকট ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প এবং বর্তমানে সস্তা জ্বালানী প্রাপ্তির উৎস বলে চিহ্নিত করে। তবে এসব ক্ষেত্র বিন্যাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ অঞ্চলের অশান্ত পরিবেশ আর ভঙ্গুর রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন আঞ্চলিক অস্থিরতা চেচনিয়া, দাগেস্থান, কিরগিজিয়া অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মুখে ইউরোপের জন্যে নতুন সরবরাহ ক্ষেত্র সম্প্রসারণ সম্ভব হয়ে উঠছেনা। তাই এসব অঞ্চলে যে কোন উপায়েই হোক প্রয়োজন শান্তি স্থাপনের। অপর দিকে ক্রমবর্ধমান এশীয় অঞ্চলের চাহিদা মিটাতে হলে মধ্যএশিয়ার মজুদ ভান্ডার থেকে উত্তোলিত জ্বালানী একমাত্র পাইপ লাইন দিয়েই পরিবহন সম্ভব হবে। তাই যে কোন মূল্যে এ সরবরাহ পথের দেশগুলোতে শান্তির প্রয়োজন রয়েছে। আফগানিস্তান নামক দেশটি তেমনি এক অন্তরায়।

বর্তমানে চলমান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতায় তালেবানদের প্রধান শত্রুতে পরিণত করবার পেছনে বিশ্ব জ্বালানী পরিস্থিতি এবং এতদঅঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও একটি প্রধান কারণ। বিশ্বের সব দেশ বিশেষ করে পশ্চিমা দেশ এবং এদের বড় লগ্নিকারী কোম্পানীগুলো আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পরিবর্তে একটি সর্বজন স্বীকৃত স্থিতিশীল সরকার কামনা করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পন্থায় এ সমস্যার সমাধান হবে এটা বলা দুস্কর। তবে ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানের সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধবাজ নেতাদের বাদ দিয়ে বা সম্মতিবিহীন সরকার গঠন প্রচেষ্টা নিস্ফল যে হবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। তালেবানদের ভূঁইফোঁড় শক্তি বলে অনেকেই আখ্যায়িত করেছে কিন্তু আসলে তা নয়। আফগানিস্তানের এ শক্তির পেছনে ঐ সময়ে জনসমর্থন না থাকলে এরা দেশের নব্বই ভাগ প্রায় ছয় বছর কাল শাসন করতে পারত না। উল্লেখ্য, যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আফগানিস্তানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জহির শাহের রাজত্বের পরবর্তীতে তালেবান সরকারই এককভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্যে কাবুলে ক্ষমতায় ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তালেবানদের পরে কে বা কারা

www.nagorikpathagar.org

আফগানিস্তানে স্থিতিশীল সরকার দিতে পারবে? যদিও এখন ছয় মাসের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে।

এখানে একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণা না করলেই নয়। বিশ্বের বড় জ্বালানী ব্যবসায়ে জড়িত কোম্পানীগুলো আমেরিকার তত্ত্বাবধানে মধ্যএশীয় সম্পদ বাজারজাত করবার প্রয়োজনেই আফগানিস্তানের ভূ-খন্ডের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তানে যে কোন ধরনের সরকার কায়েম থাকুক তাতে এসব কোম্পানী বা সরকারের খুব একটা মাথা ব্যাথা নেই যদি সে সরকার আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে এবং আফগানিস্তানে অঞ্চলভিত্তিক যুদ্ধবাজ নেতাদের নিজেদের আয়ত্ত্বের মধ্যে রাখে। তবে সে সরকার এবং যুদ্ধবাজ নেতাদের অবশ্যই পশ্চিমের বড় কোম্পানীর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দিতে হবে।

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে অস্থিরতা প্রবাহমান ছিল তা কোনভাবেই এতদঅঞ্চলে আমেরিকার বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মোটেই অনুকূলে ছিল না। আর সে কারণেই আমেরিকার দুই মিত্র পাকিস্তান এবং সৌদী আরবের প্রত্যক্ষ সমর্থনে তালেবানদের উত্থানকে আমেরিকার সরকার মৌন সমর্থন দিয়েছিল। যদিও তালেবানদের উত্থানের সময়ে আমেরিকা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের মাধ্যমে কি ধরনের সাহায্য দিয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া দুস্কর তবুও আমেরিকার পরোক্ষ সায় উল্লেখযোগ্য। বিল ক্লিনটনের প্রশাসন আফগানিস্তানে কট্টরপন্থী ওয়াহাবী আন্দোলনকে এ কারণে গ্রহণ করে যে, তালেবানরা কোন এক পর্যায়ে শিয়া অধ্যুষিত ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে সাহায্য করবে এবং ইরান বিরোধী মনোভাব দক্ষিণের পরিকল্পিত পাইপ লাইনের নিরাপত্তার সহায়ক হবে। কারণ দক্ষিণমুখী তেল এবং গ্যাসের পাইপ লাইনগুলো ইরানকে বাদদিয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণে পশতুন এলাকার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ সব কারণেই আমেরিকার কংগ্রেস নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ইরানকে অস্থিতিশিল করে তোলবার জন্যে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশেষ বাজেট CIA কে বরাদ্দ দেয়। এর প্রেক্ষিতে ইরান প্রায়ই ওয়াশিংটন কর্তৃক তালেবানদের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইরানে বিশৃঙ্খলতা ঘটানোর প্রচেষ্টার অভিযোগ আনতে থাকে। যদিও ওয়াশিংটন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।[৫]

৫। Taleban : Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia : Mr. Ahmed Rashid. P. 46

www.nagorikpathagar.org

তালেবানদের উত্থানের এ সময়টিতে ১৯৯৪-৯৭, UNOCAL এর পাইপ লাইনের সাপোর্টে আমেরিকার কূটনৈতিক প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠে। আফগান ভূ-খন্ডের উপর দিয়ে UNOCAL প্রস্তাবিত পাইপ লাইনের সমর্থনে ১৯৯৬ এর মার্চ মাসে আমেরিকার সিনেটর মি. হ্যাঙ্ক ব্রাউন কাবুল সফর করে। হ্যাঙ্ক তালেবান নেতাদের সাথে দেখা করে তাদের একটি দলকে আমেরিকায় UNOCAL আয়োজিত আফগানিস্তানের উপর গোলটেবিল বৈঠকেও আমন্ত্রণ জানায়। ঐ একই মাসে আমেরিকা পাকিস্তান সরকারকে ১৯৯২ সনে সম্পাদিত আর্জেন্টিনার 'ব্রিদার্স' কোম্পানীর সাথে চুক্তি বাতিল করে আমেরিকার কোম্পানীর সাথে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য চাপদিতে থাকে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় 'ব্রিদার্স' এর পাইপ লাইনের সম্ভাব্য পথের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখার অনুমোদন পরবর্তীতে তালেবানরাও দিয়েছিল। এ কারণেই UNOCAL এর সাথে মোল্লা ওমরের বিবাদ বাধে। কথিত আছে যে, UNOCAL মোল্লা ওমরের তহবিলে দশ মিলিয়ন ডলার দিতেও রাজী হয়েছিল।

তালেবান কর্তৃক ৯০ ভাগ আফগানিস্তান দখলের পর আমেরিকার প্রশাসন দোটানায় পড়ে। প্রথমদিকে স্বাগত জানালেও পরে নিশ্চুপ থাকে। কাবুল দখলের পর তালেবান সদস্যরা যে ধরনের বর্বরতার পরিচয় দেয় ঐ কারণেই প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে আমেরিকা দ্বিধাবোধ করে। তবে ১৯৯৬ সনের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনের সময় এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিস্ রবিন রাফায়েল বলে যে, 'তালেবানরা দেশের দুই তৃতীয়াংশের অনুশাসনে রয়েছে, এ বাহিনী আফগানিস্তানেরই নাগরিক দ্বারা গঠিত এবং তারা ক্ষমতা ধরে রাখার শক্তি রাখে। যদিও তালেবানরা ধর্মের নামে নানা ধরনের জোর জবরদস্তি করছে তবুও বেশীর ভাগ জনগণের সমর্থন তাদের পক্ষে রয়েছে এবং দেশে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শান্তির পরিবেশ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই তালেবানদের একঘরে করে রাখা আমাদের এবং আফগানিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে নয়।' [৬]

এদিকে UNOCAL ওয়াশিংটনের সম্মতি নিয়ে তালেবান নেতাদের তাদের পক্ষে প্রভাবিত করবার সকল প্রকার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তালেবান নেতাদের আর্জেনটিনার কোম্পানী 'ব্রিদার্স' কে বাদ দেবার জন্যে সকল প্রকার

৬। The Taleban, the US and the Resources of Central Asia : Peter Symonds : World Socialist Website : October 24, 2000.

www.nagorikpathagar.org

কলাকৌশলের আশ্রয় নেয়। এ প্রয়াসেই UNOCAL প্রায় ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে ওমাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে আফগান স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করে এ স্টাডির উপর ভিত্তি করেই কান্দাহারে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে পাইপ সংযোজন বৈদ্যুতিক কাজ থেকে সুতারের কাজে হাতে কলমে শিক্ষা দেবার জন্যে স্কুলের পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৯৭ এর নভেম্বরে তালেবানদের একটি দল এক চোখ কানা মোল্লা গউসের নেতৃত্বে হিউস্টন টেক্সাসে এক সফরে যায় এবং সেখানে টেক্সাস স্টেটের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দেখাও করে।[৭]

এত দহরম মহরমের পর হঠাৎ করে তালেবানদের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক এত খারাপ হয় যে, আমেরিকা সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর আগেই আফগানিস্তানে উত্তরজোট এবং CIA এর সমন্বয়ে শীত মৌসুমের পূর্বেই হামলা করবার পরিকল্পনা করে। এ কারণেই CIA ১৯৯৭ সন থেকেই দক্ষিণ আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী প্রাক্তন মুজাহিদ কমান্ডারদের সহায়তায় বিদ্রোহের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এতে বিশেষ করে কমান্ডার আব্দুল হকের সহযোগিতা ছিল উল্লেখনীয়। এই একই প্রচেষ্টায় বর্তমানে কাবুলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হামিদ কারজাইও গত দুবছর থেকে তার অঞ্চলের তালেবান বিরোধীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। একই সাথে উত্তর জোটের সহায়তায় উত্তর থেকে হামলা চালানোর পবিকল্পনার জন্যে আমেরিকাসহ ইরান, রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব খবর নভেম্বর ১৮, ২০০১ এ ওয়াশিংটন পোস্টের পাতায় বব উডওয়ার্ড নামক বিখ্যাত সাংবাদিকের উদ্ঘটিত তথ্যের বিবরণে পাওয়া যায়। এই বব উডওয়ার্ড নিক্সনের 'ওয়াটারগেট' কেলেঙ্কারির উদ্ঘাটক বলে পরিচিত। এ নিবন্ধে উডওয়ার্ড আরও উল্লেখ করে যে, 'বিগত ১৮ মাস CIA দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন তালেবান বিরোধী যুদ্ধবাজ নেতাদের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটানোর সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছিল এবং এদের মধ্য দিয়ে ক্রমেই CIA এ অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়'। এসব তথ্যের বিশ্লেষণে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রায় এক বছর পূর্ব থেকেই আমেরিকা তালেবান উৎখাতের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায়ই আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ওসামার সন্ত্রাসীদের তৎপরতার বিশদ খবর মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে

৭ Opcit

www.nagorikpathagar.org

ধরত। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নভেম্বর ১২, ২০০১ এ উত্তর জোটের নিকট কাবুলের পতনের পরপরই আমরা অতিদ্রুত সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের মুজাহিদ নেতাদের অল্প সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশ এবং স্ব স্ব বাহিনী দ্বারা বিভিন্ন শহর দখলের খবর শুনি। সামরিক আঙ্গিকে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এত দ্রুত সংঘবদ্ধ হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, আমেরিকা প্রথমতঃ মধ্যএশিয়ায় প্রভাব বিস্তার আর অর্থনৈতিক কারণে এবং ওসামা সংক্রান্ত অসহযোগিতার কারণে তালেবানদের উৎখাত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। ১৯৯৮ সনে পূর্বআফ্রিকায় দূতাবাসগুলোতে হামলা এ সুযোগ আরও ত্বরান্বিত করে। জাতিসংঘ কর্তৃক তালেবানরা একঘরে হয়ে যাওয়াতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে এবং বাইরে তালেবান বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রয়াসগুলো প্রায় ধূম্রাচ্ছন্ন থাকে। তালেবান নেতৃবৃন্দ এসবের কতখানি জানত তা বলা বড় কঠিন কারণ তালেবান বিরোধী এ সব গোপন আয়োজনের মধ্যেও তালেবান সদস্যরা বামেয়ান প্রদেশের হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধমূর্তি ভেঙ্গে তাদের চালচিত্র আরও অসহনীয় করে তোলে।

এ প্রসংগে মার্চ ২১, ২০০১ এর 'জেনস্ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি' যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিরাপত্তা বিষয়ক সাপ্তাহিকীতে বলা হয় যে, আমেরিকা বুশ প্রশাসন প্রথম থেকেই তালেবান বিরোধী বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে। তালেবান সরকারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য আমেরিকা ভারত আর রাশিয়ার সাথে একজোট হয়। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ঐ একই উদ্দেশ্যে ভারত উত্তর জোটকে সামরিক উপকরণ, উপদেষ্টা, কারিগরী সহায়তা এবং হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করছিল। প্রবন্ধে আরও প্রকাশ যে, এ কারণেই ভারত এবং রাশিয়া উভয়েই তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের বিমান ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

এমনি বহু তথ্যই প্রমাণ করে যে, আমেরিকা এবং বিশ্বের বহুদেশ তালেবানদের উৎখাতে তৎপর হয়েছিল আর সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনে এ লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। স্মরযোগ্য যে, আমেরিকার সকল তৎপরতা এখন তালেবানদের উৎখাত এবং তালেবানদের আধ্যাত্মিক নেতার সমূলে উৎপাটন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হয়েছেও তাই। আর সে সাথে ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে বা নিধন করতে যতই সময় নেবে ততই আফগানিস্তানে

www.nagorikpathagar.org

বিদেশী সৈনিকদের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে। তবে সমস্ত অবস্থাতেই মনে হয় মোল্লা ওমর আর ওসামা নিধনের পরেও গোত্রীয় যুদ্ধ ঠেকাতে আমেরিকার স্পেশাল ফোর্স অথবা বিশেষজ্ঞরা কাবুলের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর নিরাপত্তার নিমিত্তে থেকে যাবে। এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বহুজাতিক তেল এবং গ্যাস কোম্পানীগুলো তাদের প্রস্তাবিত পাইপ লাইনের প্রথম ভাগের কাজ কত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে পারে সেটাও হবে লক্ষণীয় বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা - সি আই এ এবং ইসলাম

'আমেরিকা সবসময়েই মুসলমানদের সাথে ছিল।'

কাবুল, অক্টোবর ২৭, ২০০১। তালেবান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান বার্তা কর্মকর্তা আবদুল হান্নান হামিদের কক্ষ। মাত্র দু'দিন আগে এই ইমারতের পাশে রেডক্রসের খাদ্যগুদামে আমেরিকান এফ -১৮ হরনেট থেকে রকেট দাগা হলে একজন প্রহরীর মৃত্যুসহ মজুদ ভান্ডারের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। আজ আবার ঐ একই জায়গায় হামলা হলে এবার তথ্যমন্ত্রণালয়ের একাংশের বিপুল ক্ষতি হয়, বিশেষ করে ফাইল সেকশনগুলোতে। এ ফাইল সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি রয়েছে। রয়েছে বাদশাহ জহির শাহের আমল থেকে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময়কার যাবতীয় তথ্য আর বহু পুস্তকাদি, এরই বেশ কিছু উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে আবদুল হান্নান। আজ প্রায় বিশদিন গত হতে যাচ্ছে আমেরিকা যথেচ্ছা বিমান হামলা করে যত্রতত্র বোমা ফেলে যাচ্ছে। এতে অনেক বেসামরিক জনগণ হতাহত হচ্ছে। অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন বোমা হামলা। এ হামলায় তালেবান সংগঠনের কতখানি ক্ষতি হবে তা হয়ত আমেরিকার জনগণের বুঝবার প্রয়োজন নেই। হান্নান ভাল করেই বুঝতে পারে আমেরিকার মত দেশে এসব দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখালে বেশীরভাগ বিশ্ব সম্বন্ধে অসচেতন আমেরিকান নাগরিকরা কতখানি উৎফুল্ল হয়। তাই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ তার জনগণকে দেখাবার জন্যে আফগানদের উপরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

হান্নান রেডিওতে পশ্চিমা বিশ্বের অতিরঞ্জিত খবর যতই শোনে ততই পুলকিত বোধ করে। পুলকিত হয় যখন আমেরিকার প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি (মন্ত্রী) আর জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ জেনারেল (এয়ার ফোর্স) মায়ার মিলে সমান তালে তালেবানদের কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার ধ্বংসের আর আকাশসীমা

www.nagorikpathagar.org

দখলের কথা বলে। হান্নানের হাসি পায় কমান্ড এন্ড কন্ট্রোলের নাম শুনে। আমেরিকার বড়বড় নেতা অবলীলাক্রমে তাদের জনগণকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছে। কি ধরনের কমান্ড কন্ট্রোল তারা আশা করে? আফগানিস্তানে কি NATO স্টাইলের সেনাবাহিনী রয়েছে? আকাশ সীমা জয়ের কথা বলাতো অবান্তর কারণ সাধারণ বিমান বিধ্বংসী কামান আর হাতে গোনা প্রায় পনের বছর পুরানো SCUD মিসাইল এবং কয়েকটি STINGER মিসাইল ছাড়া তাদের আর কি রয়েছে? আমেরিকা ভাল করেই জানে তাদের বোমারু বিমানগুলো যে উচ্চতা থেকে বোমাবর্ষণ করে সে সব জঙ্গী বিমানের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র অকার্যকর বলতে হবে। অন্যদিকে বিশটি MIG-21; MIG-19; SUKO; এবং ষোলটি MI-17/21 হেলিকপ্টরের বিমান বাহিনী এসবের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় অচল। এ জন্যেই বিমান বাহিনীর সদস্যদের সেনাবাহিনীর সাথে একত্রিভূত করা হয়েছে। তবে দেশের প্রতিটি পরিত্যক্ত বিমান বন্দরে কয়েকশত সোভিয়েত রাশিয়ার নির্মিত বিমান বিকল অবস্থায় পড়ে থাকায় আমেরিকার পাইলটদের ক্যামেরার জন্য ভাল ছবির উপকরণ হয়েছে মাত্র। এছাড়াও সোভিয়েত সময়ের নির্মিত প্রচুর কমিউনিকেশন সেন্টার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। তবে হান্নানের মতে, আমেরিকার প্রযুক্তির প্রশংসা করতেই হয় কারণ বোমাগুলোর শতকরা আশিভাগই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি।

হান্নানের মতে, আমেরিকা তথা পশ্চিমা শক্তিগুলো ১৯৮৯ সনের মত একই ভুল করে যাচ্ছে। তালেবানদের বিপক্ষে রাজনৈতিক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পূর্বে সামরিক ব্যবস্থা নেয়াতে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। তালেবানদের পতন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু আফগানিস্তানে স্থিতিশীল সরকারের স্থাপনা মনে হয় অত্যন্ত কঠিন এবং দুস্কর ব্যাপার। ওসামা বিন লাদেনকে 'জীবিত অথবা মৃত' অবস্থায় ধরতে হবে বলে যে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছিল তা পর্যায়ক্রমে তালেবান উৎখাতের সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এতে পাকিস্তানও যোগ দিয়েছে।

আমেরিকার সরব হামলার পরপরই রোমে অবস্থানরত বাদশাহ জহির শাহকে নিয়ে কাবুলে গ্রহণযোগ্য সরকার গঠন এবং 'লোয়া জিরগার' পুনঃগঠনের প্রস্তাব দিয়ে জহির শাহকে রাজী করিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধাচলাকালে কাবুলে সরকার পরিবর্তনের কথা বলাতে তালেবান বিরোধী রাব্বানী সমর্থিত উত্তরজোটও সায় দেয়। পশ্চিমা বিশ্বও যেন হঠাৎ করে জহির শাহের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

এতগুলো বছর পরে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়। জহির শাহ্ এখন চুরাশি বছরের বৃদ্ধ। ইতিপূর্বেও দু' দু'বার তাকে দিয়ে কাবুলে সরকার সামলানোর কথা উঠেছিল। একবার মস্কোপন্থী সরকারের সময় আর একবার মাত্র কয়েক বছর পূর্বে গৃহযুদ্ধ চলার সময়ে। প্রতিবারেই কোন না কোন কারণে জহির শাহের কাবুলে ফিরে আসা আর হয়ে উঠে নি। এবার আবার তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে তার সম্মতিও রয়েছে। এসব কারণেই গত বছরের শেষের দিকে পর্যন্ত (২০০১ সন) এ নিয়ে প্রচুর জল্পনা কল্পনা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও শেষ করা হয়। জহির শাহের আবির্ভাবের সম্ভাবনা এবং তালেবান কর্তৃক বাতিলকৃত অনেক প্রাক্তন মুজাহিদরা যখন তাদের নিজস্ব পশতুন অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তৎপর ঠিক সে সময়েই ঘটে গিয়েছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দুটি ঘটনার প্রথমটি হল সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী যুদ্ধের সময় মৌলভী ইউনুস খালিসের হিজব এর অন্যতম কমান্ডার আবদুল হকের গ্রেফতার এবং দ্বিতীয়টি তার বিচারের পর তালেবান কর্তৃক হত্যা। এ হত্যার পর তালেবানরা জহির শাহের পুনর্বাসনের পরিকল্পনাকে নাকচ করে দিয়ে প্রাক্তন বাদশহের সমর্থকদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেবার পর জহির শাহকে নিয়ে উচ্চবাচ্য স্তিমিত হয়েছিল।

হান্নান, আব্দুল হকের গ্রেফতার হওয়া এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তার ভাইপো ইজ্জতউল্লাহ এবং আরেক প্রাক্তন কমান্ডার হাজী দুররানী সমেত মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবার পর প্রেস রিলিজ জারী করে। ঐ একই ব্যাখ্যা পাকিস্তানে আফগান দূতাবাস থেকেও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেয়া হয়। হান্নান তার ব্যাখ্যায় জানায় যে, আব্দুল হক তার আরও দু'জন সাথীকে নিয়ে আমেরিকার পক্ষে এবং তালেবানদের বিপক্ষে সামরিক ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের জন্য স্বীয় অঞ্চলের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল। তাদেরকে যেহেতু দেশের বিরুদ্ধে কার্যকলাপে জড়িত পাওয়া গিয়েছিল তাই দেশদ্রোহী হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। খবরে আরও প্রকাশ যে, তাকে উদ্ধারের জন্য আমেরিকার সামরিক বাহিনীর দুটো হেলিকপ্টার এলেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য আব্দুল হককে উদ্ধারের প্রচেষ্টার বিষয়টি পেন্টাগন পরের দিনই মানে অক্টোবর ২৭, ২০০১ এ অস্বীকার করে বিবৃতি দেয়।

কমান্ডার আব্দুল হক প্রফেসর ইউনুস খালিসের দলের একজন দক্ষ যোদ্ধা ছিল। দুররানী পশতুন সম্প্রদায়ের আব্দুল হক হিজব-ই-ইসলামের জেহাদীদের

www.nagorikpathagar.org

সংগঠনের মধ্য দিয়ে কাবুল এলাকার কমান্ডার হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করে। এ জেহাদের সময়েই তরুণ আব্দুল হকের সাথে আমেরিকান জার্নালিস্ট সহ প্রচুর কেউকেটাদের পরিচয় হয়। পরে CIA এর আর্শিবাদপুষ্টদের মধ্যে একজন হয়ে উঠে। আফগান গৃহযুদ্ধের সময় তাকে হিজব-ই-ইসলামীর তরফ থেকে কাবুলের শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত করলে আব্দুল হক যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোন সুবিধা করতে সক্ষম না হলে তালেবানদের আক্রমণের পূর্বেই কাবুল ত্যাগ করে পাকিস্তানের পেশাওয়ারে সপরিবারে চলে আসে। ১৯৯৮ সনে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে পেশাওয়ারের হায়াতাবাদে তার পুত্র ও স্ত্রী নিহত হয়। অনেকেই আব্দুল হকের বিপক্ষের সদস্যদের কাজ বলে মনে করে। প্রায় তিন বছর দুবাইতে কাটিয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই পেশাওয়ার ফিরে এসেই তালেবানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। এ একই কারণে 'কুররাম এজেন্সি' দিয়ে তার গ্রাম ও পুরাতন রণক্ষেত্রে জহির শাহের স্বপক্ষে অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে ধৃত হয়ে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার সাথে আরও চল্লিশজনের মত অনুসারীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে তাদের নিয়তিতে কি জুটেছে সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায় নি।

আব্দুল হান্নান হামিদ, নিজে একজন পশতুন সরকারী কর্মকর্তা, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। আফগানিস্তানের সুদিন দুর্দিন দুই দেখেছে। দেখেছে বিশ্বের পরাশক্তিদ্বয় কিভাবে আফগানিস্তানকে ব্যবহার করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই, গৃহযুদ্ধ তারপর তালেবানদের পাচঁ বছর সে সাথে উত্তরজোটের সাথে চলমান যুদ্ধ। আর এখন আরব সন্ত্রাসীদের নিধনে নেমেছে এককালের 'জেহাদের' পক্ষের শক্তি, আমেরিকা আজ জেহাদীদের বিপক্ষে। আরব-আফগানদের ছেড়ে মোল্লা ওমরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। সবই হান্নানের কাছে আশ্চর্য মনে হয়। মনে হয় এই বোধহয় বিশ্ব কূটনীতি। ইতিপূর্বে হান্নান পররাষ্ট্র বিষয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি কিন্তু আশির দশকের জেহাদকে সাহায্য করবার জন্যে আমেরিকাকে রুশদের অপেক্ষা ইসলামের নিকটতম বন্ধু ভেবেছিল কিন্তু কার্যত স্যেটা ছিল ভুল ধারণা। হান্নান পুরো জেহাদের সময়ে প্রথমে কান্দাহারে পরে তৎকালীন মিত্র শক্তি CIA এবং ISI এর সাথে কাজ করেছিল। ISI এর বহু কর্তাব্যক্তিদের সাথে সে পরিচিত। ঐ সময়ে CIA এবং আমেরিকা আফগান তথা মধ্যপ্রাচ্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের অধিক তোয়াজ করে চলত। CIA আফগানদের

www.nagorikpathagar.org

যে কোন প্রকারের সাহায্য প্রদানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পরাশক্তি হবার দর্পচূর্ণ করে নাজেহাল অবস্থায় আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করা। CIA ভাল করেই জানত যে, সোভিয়েত রাশিয়ার দিন প্রায় শেষ তবে এ শেষ ধাক্কা দিতে পারলে রাশিয়ার ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হবে। সে কারণেই আমেরিকা যে কোন মূল্যে মুজাহিদদের ঐক্য অটুট রাখতে যত্নবান ছিল। এ প্রয়াসের জন্যে CIA মুজাহিদ কমান্ডারদের নগদ অর্থ থেকে শুরু করে স্ব স্ব এলাকায় আফিম হেরোইন ও গাঁজা চাষে উৎসাহিত করেছে। আফগানিস্তানের মুক্ত এলাকাগুলো বিশেষ করে পাকিস্তানের সাথে লাগোয়া এলাকাগুলোতে ব্যাপক পপির চাষে উৎসাহিত করেছিল, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। শুধু চাষই নয়, উৎপাদিত হেরোইন রুশ সেনাদের মধ্যে নামমাত্র দামে বিক্রি থেকে শুরু করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে চোরাচালানীর সকল প্রকার পথ সুগম করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতাও করেছিল। কিন্তু এসব মাদক দ্রব্য শুধু রাশিয়া পর্যন্তই নয়, ক্রমেই বৃহৎ আকারে চোরা পথে খোদ আমেরিকার শহরগুলোতে পৌঁছতে শুরু করলে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশের সরকারগুলোর টনক নড়ে; কিন্তু ততদিনে পানি মাথার অনেক উপরে। এসব চোরাচালানীর সাথে অনেক মুজাহিদ কমান্ডারদের নাম জড়িয়ে পড়ে।

এতসব সাহায্য সহযোগিতা করবার পর আজ এককালের বন্ধুপ্রতিম দেশ, ইসলামী 'জেহাদের' হোতা আমেরিকা আল-কায়দা ছেড়ে আফগানদের বিরুদ্ধে। একেই বলে জাতীয় স্বার্থ। স্বার্থ রক্ষার জন্যে আমেরিকার মত দেশগুলো পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে গুড়িয়ে দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নি, ভবিষ্যতেও হবেনা।

ইসলামিক বিশ্বের সাথে আমেরিকার দহরম মহরম শুরু হয় বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সোসালিজম আর চীনের কম্যুনিজমকে নব্য স্বাধীন দেশগুলোতে ছড়িয়ে পরতে বাধা দেয়ার সক্রিয় প্রয়াস থেকে। আমেরিকা তখন পুঁজিবাদ বিশ্বের নেতা আর সোভিয়েত রাশিয়া বিভক্ত পূর্বইউরোপ নিয়ে নিজের প্রভাব বলয় বিস্তার করে বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলোকে, বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করছিল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক সদ্য স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের (সোসালিজম) সংঘাতে গৃহযুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছিল। আর এসব দেশ স্বাধীন হবার পর বহু বছর পর্যন্ত পশ্চাদপদ আর অশান্তির অঞ্চলে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল। অনেক দেশে এর জের আজও

www.nagorikpathagar.org

চলছে। পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিবাদে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে জীবন দিতে হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশক থেকেই আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক গড়ে তুললেও অন্যদিকে ইসরায়েলের রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির শক্ত ভিত হয়ে উঠছিল। এ অবস্থার তেমন বিশেষ পবির্তন আজও হয় নি। বিশ্বে একনায়কতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোর রাজতন্ত্র আর এনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে নি ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত এসব সরকার সরাসরি আমেরিকার নীতির বিরুদ্ধাচারণে সোচ্চার না হত। মুসলিম দেশের সোসালিস্টপন্থী সমাজব্যবস্থা স্থাপনের যে কোন প্রচেষ্টাকে ইসলাম বিরোধী নাম দিয়ে সে সবদেশে বৈধ ইসলামপন্থী অথবা অবৈধ সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখত অথবা প্রয়োজনে সে সব দেশের সরকার পরিবর্তনেও পিছপা হতোনা। এককথায় আমেরিকা ইসলামকেই ধর্মবিহীন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র আর চীনের কম্যুনিজমের একমাত্র মারণাস্ত্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমেরিকার ইসলাম প্রীতির প্রেক্ষিতে আমরা পঞ্চাশের দশকে মিশরের নাসেরের উত্থান, আর সোসালিজমের মধ্যপ্রাচ্যে প্রসার ইত্যাদি আমেরিকা কর্তৃক প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করতে দেখি। এসব দেশের মধ্যে লিবিয়া, ইরাক আর সিরিয়ার মত দেশকে শায়েস্তা করবার জন্য ইসরায়েলকে ক্রমেই শক্তিশালী করতে দেখা যায়। একই সাথে PLO, PFLP এর মত ফিলিস্তিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবাদের লেবেল আঁটতে দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে নাসেরের 'প্যান এরাবিজম' এবং 'সোসালিজম' ঠেকাতে মিশরের মৃত প্রায় ইসলামী কট্টরপন্থী সংগঠন 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এর মত সংগঠনগুলোকে পুনঃগঠন করে সমগ্র আরব বিশ্বে যেখানেই প্রয়োজন বিকাশে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। আর এ ধরনের ইসলামিক আন্দোলনকে বেগবান করবার জন্য মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আরও অনেক মুসলিম বিদ্যাপিঠগুলোকে আরও বিকশিত হতে উৎসাহিত করতে দেখা যায়। আমেরিকার সাহায্যে বা পশ্চিমা বিশ্বের সোসালিজম ঠেকাও এর নীতির ছত্রছায়ায় এসব ইসলামিক আন্দোলনগুলো আলজেরিয়া হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে মুসলিম সংখ্যা লঘিষ্ঠ

www.nagorikpathagar.org

দেশগুলোতেও ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপক সম্প্রসারণ হয় যেমন নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া এবং ভারতে।

রাশিয়া ঠেকাও এর নীতিতে ইসলামিক দেশগুলোর সাথে আমেরিকা এবং বৃটেন একযোগে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ CENTO এবং SEATO । ইরানে পঞ্চাশের দশকে রেজা শাহ পেহলভীর বিরুদ্ধে রাশিয়া সমর্থিত মোসাদ্দেকের ক্ষমতা দখল এবং আমেরিকার CIA কর্তৃক পাল্টা অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্র পুনঃবহালের পর থেকেই আমেরিকা এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যে আরও তৎপর হয়ে পড়ে। রাশিয়ার 'সফট বেলি' (Soft Belly) বলে পরিচিত এতদঅঞ্চলে আমেরিকা আর রাশিয়ার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে রাশিয়া বিখন্ডিত হওয়া পর্যন্ত। আর আমেরিকার ইসলাম প্রীতি তখন তুঙ্গে। আমেরিকার পেছনে এসে দাঁড়ায় পূর্বের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো, যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি আর পর্তুগালের মত দেশগুলো। এসব ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নাসেরের আরব সোসালিজমকে নস্যাৎ করবার জন্যে যে ধরনের ছায়াযুদ্ধের অবতারণা করে তাতে ইসলাম বাঁচাও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নাসের তখন আরব তথা মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার দু'মুখো নীতির ঘোর বিরোধী এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কন্ঠ হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠলে পশ্চিমা বিশ্ব সংকিত হয়ে উঠে।

নাসের শুধু ইসরায়েলের বিরোধীই ছিল না; বরং মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরোধিতা করে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পাল্টানোর সমর্থক বলে চিহ্নিত হয়। নাসেরের অনুপ্রেরণাতেই পশ্চিমা পন্থী রাজতন্ত্রকে হটিয়ে সোসালিস্টপন্থী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জন্য বাথ (Baath) ও নাসেরপন্থীরা লিবিয়া, সিরিয়া আর ইরাকের মত দেশে রাশিয়া সমর্থিত সোসালিস্ট সরকার কায়েম করে। সোসালিজমকে ধর্মহীনতা আখ্যা দিয়ে 'ব্রাদারহুডের' আন্দোলন শুরু হলে শুধু মিশরেই নয় বাকী দেশগুলোতেও এদের নিষিদ্ধ করে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ হলে ক্রমেই এ আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে মাথা গজিয়ে উঠে। নাসেরের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী আনোয়ার এল-সাদাত নিজেকে নাসেরের আবর্ত থেকে বের করে নিজস্ব ইমেজ তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে। এ সময়েই সাদাত নিষিদ্ধ মুসলিম ব্রাদারহুড এবং অন্যান্য ইসলামপন্থী নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়। ইসলামপন্থীদের সাথে সাদাতের দহরম

www.nagorikpathagar.org

মহরমের সুবাদে এবং অর্জিত সমর্থনেই মিশর রাশিয়ার সমস্ত সামরিক উপদেষ্টাদের রাতারাতি বহিষ্কার করে প্রায় দু'দশক পরে পুনরায় আমেরিকার বলয়ে চলে আসে। আমেরিকার ইসলাম তোষণ নীতি চরমে উঠে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সূচনার লগ্নে। এ সংঘাতে আমেরিকা তার গুপ্ত সংগঠন CIA এর মাধ্যমে শুরু করে এক দীর্ঘমেয়াদী জেহাদের আবরণে ছায়াযুদ্ধ। এ 'জেহাদ' পরিচালিত হয় পাকিস্তানের মাটি থেকে। নেপথ্যে সহযোগিতায় থাকে মিশর আর সৌদী আরব। এ জেহাদের শেষে আমেরিকার দ্বিমুখী আরব নীতি; ইসরায়েল তোষণ আর নিজেদের দেশের নীতি বিবর্জিত, দুর্নীতিবাজ এবং 'ইসলামিক মূল্যবোধ' বিবর্জিত সরকারের বিরুদ্ধে আফগান ফেরত মুজাহিদদের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়।

আফগান জেহাদের হোতা CIA এর এককালের শিক্ষার্থীরা আজ তাদেরই চোখে সন্ত্রাসী অথচ সি আই এ (CIA) এখন আর এদের অতীতকে প্রাধান্য দিতে চায়না। এমনকি এদের তৈরীর পেছনে CIA এর সরাসরি অবদানকে পারতপক্ষে অস্বীকার করে চলেছে।

আফগানিস্তানে CIA এর সোভিয়েত বিরোধী ছায়াযুদ্ধ (Proxy War) যদিও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কার্টারের সময় পরিকল্পিত হয় তবে প্রাণ পায় ৪০ তম রাষ্ট্রপতি হলিউডের প্রাক্তন চিত্র তারকা রোনাল্ড রিগানের সময় (১৯৮১-৮৯) থেকে। এসময় থেকেই শুরু হয় CIA এর কর্মতৎপরতা। শুরু হয় আফগান মুজাহিদদের জেহাদে প্রত্যক্ষ সাহায্য।

পাকিস্তানের জিয়াউল হক সে দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পরোক্ষ মদদে ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সবচেয়ে কঠোর সামরিক শাসনের প্রবর্তন করে। ১৯৭৭ সনের ঐ সময়টিতে আফগানিস্তানের মস্কোপন্থীদের তৎপরতা মধ্যএশিয়া সমস্যা বলে পশ্চিমা দেশগুলো পাত্তা দেয় নি। অপরদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭৪ সনে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর থেকে গোপন পথে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রযুক্তির সাহায্যে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে যায়। যদিও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবুও মনে করা হয় ভুট্টো আর লিবিয়ার নেতা কর্ণেল গাদ্দাফির মধ্যে এক অলিখিত সমঝোতার মাধ্যমে লিবিয়া পাকিস্তানের পারমাণবিক পরিকল্পনার অর্থ যোগান দেয়। সে সাথে চীনের সক্রিয় সাহায্যতো রয়েছেই। ঐ সময়ে

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকা পাকিস্তানের উপর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী বন্ধ করার জন্যে চাপ দিতে থাকে। এ পর্যায়ে পাকিস্তানকে সকলপ্রকার সামরিক সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখা হয়। এমনকি এ ব্যাপারে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকেও খর্ব করার জন্যে 'সাইমিংটন এমেনডমেন্ট' নামক এক বিল পাশ করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমা দেশগুলো পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের অনাদায়ী কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণে অস্বীকৃতি জানায়। এসবের প্রেক্ষিতে জিয়াউল হকের সামরিক অভ্যুত্থান এ পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে। একদিকে সামরিক বাহিনীর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী অব্যাহত রাখবার চাপ অন্যদিকে অসহিষ্ণু রাজনৈতিক নেতাদের ৯০ দিনের মাথায় নির্বাচনের ওয়াদা রক্ষার চাপ, সবমিলিয়েই জিয়া বেশ বেগতিক অবস্থায় কাটাতে থাকে। জিয়ার জন্যে প্রয়োজন নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টা। এমতাবস্থায় ১৯৭৯ সনে সমগ্র বিশ্বের চাপকে উপেক্ষা করে জিয়াউল হক ভুট্টোকে ফাঁসীতে ঝুলায় আর সে বছরেই ইরানে ইসলামিক অভ্যুত্থান হলে আর আমেরিকার বিপর্যয় ঘটতে থাকলে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ওয়াশিংটনের নিকট পাকিস্তানের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

ইরানে আমেরিকার বিপর্যয় জিয়াকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। জিয়াউল হকের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ আসে সে দেশের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র জন্মবার্ষিকীর ছুটির আগের রাতে সোভিয়েত বাহিনীর আফগানিস্তান দখলের মধ্য দিয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে জিয়াউল হক এ পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখার জন্যে তার ঘনিষ্ট সহচর পশতুন জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান খানকে ISI এর দায়িত্ব দেয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ISI প্রধান জিয়াউল হককে সোভিয়েত বাহিনীর আসন্ন দক্ষিণমুখী অগ্রযাত্রা এবং বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগর পর্যন্ত সোভিয়েত দখলের সম্ভাবনার তত্ত্ব পেশ করলে জিয়াউল হক অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে। আখতার আব্দুর রহমান বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এখন এ সময়েই পাকিস্তান একাই আফগান মুজাহিদদের সাহায্যের হাত বাড়াবে সে সাথে বন্ধুপ্রতিম মুসলিম দেশ, বিশেষ করে সৌদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মত ধনী দেশগুলোর সাহায্য চাইবে। চীনের কাছেও প্রকাশ্যে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্যের আবেদনও জানাবে। সাহায্য সহযোগিতা আপাততঃ চীনা অস্ত্র আর পাকিস্তানী প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এব্যবস্থা বলবৎ থাকবে বিশ্বের

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য দেশ বিশেষ করে এ সংঘর্ষে আমেরিকা সরাসরি যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। পাকিস্তান এ ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করতে চাইবে। এসব পরিকল্পনাই আখতার আব্দুর রহমান তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূতকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

এরই মধ্যে আমেরিকার ছায়াযুদ্ধের সিদ্ধান্ত জিয়াকে শিহরিত করে তোলে। জিয়া আর আখতার আব্দুর রহমান তখন জেহাদের অগ্রসেনা। এর কিছু পরেই কার্টার প্রশাসন ব্রেজেন্স্কির মাধ্যমে পাকিস্তানকে সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্যে 'সাইমিংটন এমেণ্ডমেন্টকে' রোধ করে সাহায্যের হাত বাড়ালে জিয়া কিছুটা দরকষাকষি করে প্রাথমিক অনুদানের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নেয়।

জানুয়ারী ১৯৮০ তে ব্রেজেনস্কির পাকিস্তান সফরের সময়েই জিয়াউল হক পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, আমেরিকার সাহায্য সহযোগিতা সরাসরি সি আই এ'র মাধ্যমে না হয়ে পাকিস্তানের মাধ্যমে হতে হবে। তদুপরি সি আই এ এ ছায়াযুদ্ধ আই এস আই এর সমন্বয়ে পরিচালনা করবে। সব শর্তই সেদিন কার্টার প্রশাসন মেনে নিয়ে ছায়াযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

আরও পরে রাষ্ট্রপতি রিগানের সময় এসব সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। তবে সে সময়ের এসব সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে বিশ্বে কি ধরনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে তা হয়ত সেদিন আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের প্রশাসন একবার ভেবেও দেখে নি। তখন তাদের মাথায় রাশিয়াকে হেনস্তা করবার যে কোন শর্তে যে কোন ছাড় দেবার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা প্রাধান্য পায় নি। তবে এখন সেই আফগানিস্তান ঘিরে যখন বিশ্বে অশান্তিকর পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে, হয়তবা কার্টার তার আত্মজীবনীতে সে সময়কার এ সব সিদ্ধান্তের কথাগুলো পুনঃবিন্যাসিত করে লিপিবদ্ধ করবে।

অতঃপর ঐ সময়ে পাকিস্তান আমেরিকার মত দেশকে তাদের শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। ইসলামপন্থী জিয়াউল হক দৃশ্যত আমরণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। ঐ বৈঠকেই জিয়া নীতিগত সিদ্ধান্তের আওতায় আরও তিনটি সুস্পষ্ট শর্ত রাখে। প্রথমতঃ যে সব দেশ থেকে আমেরিকার পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ত্র চালান ও অর্থ যোগান আসবে তাদেরকে এসব চালনা এবং পরে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে

www.nagorikpathagar.org

গোপন রাখতে হবে এমনকি সরকারীভাবেও প্রকাশিত করা যাবে না। এসব দেশের তালিকায় ছিল মিশর, সৌদী আরব, চীন, আমেরিকা আরও পরে বৃটেন, ফ্রান্স এবং এমনকি পরে ইসরায়েলও যোগ দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত অস্ত্রের চালান সরাসরি পাকিস্তানে পাঠাতে হবে এবং সমুদ্র পথে সরাসরি করাচি বন্দরে খালাস করা হবে। তৃতীয়তঃ পরিবহন বিমানে অস্ত্র চালানের প্রেক্ষিতে তা সপ্তাহে দু'টিতে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।[১]

এসব শর্ত সাপেক্ষে গোটা জেহাদ পরিচালিত হয়েছিল। যদিও এসব অস্ত্রের হিসাবের বিষয়ে প্রচুর সতর্কতা নেয়া হয়েছিল তবু জিয়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এসব অস্ত্রের চুরি এবং পরবর্তীতে চোরাচালান সহ কালোবাজারে বিক্রী বন্ধ করতে পারে নি। এর পরের অস্ত্র চালানের প্রতিটি ঘটনা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হয়ে উঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে মিশর থেকে পরিত্যক্ত সোভিয়েত হাতিয়ারের চালান দিয়ে সি আই এ (CIA) জেহাদের সূচনা করে। এসব চালানের মধ্যে ছিল একে-৪৭, বাজুকা এবং এস এ এম-৭ (SAM) এর মত হাতিয়ার এমনকি এতে আরবদের নিকট থেকে ইসরায়েল কর্তৃক উদ্ধারকৃত হাতিয়ারও এসব চালানের মধ্যে স্থান পায়। মিশরে সোভিয়েত সাহায্যে ষাটের দশকে স্থাপিত অস্ত্র কারখানাগুলোকে পুনরুদ্ধার করে সোভিয়েত মার্কায় হাজার হাজার টন অস্ত্র তৈরী করা হয়। একমাত্র একে-৪৭ (AK-47) ক্লাসনিকভ রাইফেল তৈরী করা হয় ৬ মিলিয়নের উপর। তার উপরে ছিল এর গোলাবারুদ। জেহাদে বিমান বিধ্বংসী মিসাইল যোগান দেবার জন্যে সি আই এ (CIA) সুদূর পোল্যান্ড থেকে সোভিয়েত মার্কা সংযুক্ত SAM-7 চড়াদামে কিনে যোগান দেয়। আরও পরে আশির দশকের মাঝামাঝি আমেরিকার স্টিংগার মিসাইল প্রথম বারের মত সে দেশের বাইরে আফগান জেহাদে সাপ্লাই দেয়। বৃটেন থেকে খরিদ করা হয় 'ওরলেকনের' মত অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী কামান। সরবরাহ করা হয় কয়েক কোটি স্থলমাইন। সি আই এ একদশক ধরে এসব অস্ত্র বিভিন্ন দেশ থেকে খরিদ করে সরাসরি যোগান দেয়। তবে এ যোগানের জন্যে এবং অস্ত্র ক্রয়ের যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে তা রীতিমত যে কোন রহস্য উপন্যাসকেও হার মানাবে (এসব অস্ত্র এবং অর্থ বিতরণের পদ্ধতি স্কেচে দেয়া হল)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে সি আই এ (CIA) দ্বারা বিভিন্ন ছদ্মনামে পরিচালিত

১। Un holy Wars : P-54

www.nagorikpathagar.org

আফগান জেহাদে অর্থ এবং অস্ত্রের সঞ্চালন[২]

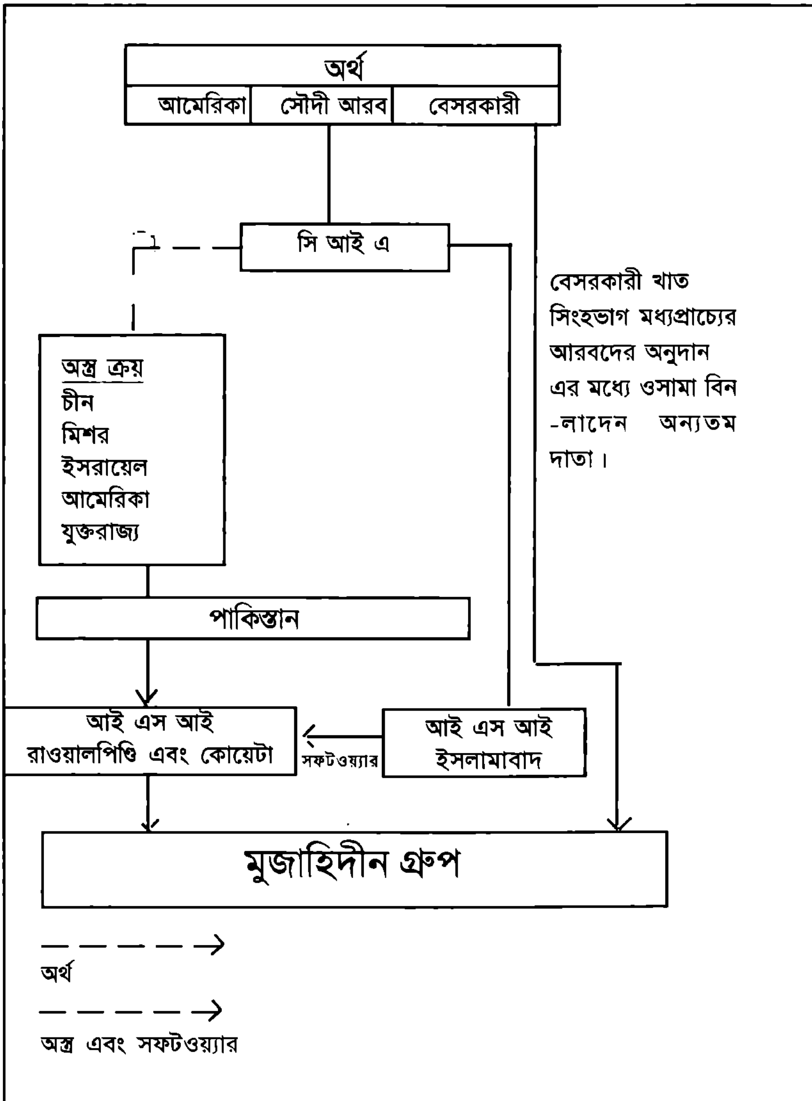

২। Brigadier Mohammad Yousuf : The Bear Trap: 1992/93.

www.nagorikpathagar.org

কতগুলো অস্ত্রব্যবসায়ী কোম্পানীর নামে পূর্ব ইউরোপ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় উৎপন্ন অস্ত্র ক্রয় করে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এগুলোকে বিভিন্ন অঞ্চলের আমেরিকাপন্থী গেরিলা বাহিনীগুলোকে সরবরাহ করা হতো। আফগান জেহাদের জন্যে একই পদ্ধতিতে বড় ধরনের বিভিন্ন মাপের অস্ত্র যেগুলো মিশরীয় কারখানায় তৈরী সম্ভব হতো না সে গুলোও মিশরের মাধ্যমেই মুজাহিদদের চালান দেয়া হতো। সি আই এ কর্তৃক গৃহীত 'সোভমেট' (SOVMAT) নামক এ পরিকল্পনার কথা পাকিস্তানের আই এস আই ((ISI) পর্যন্ত জানতে পারে নি। এসব রাশিয়ান অস্ত্র আমেরিকার পরীক্ষাগারেও ব্যবহৃত হয়েছে। এসব অস্ত্রের জবাবে আমেরিকান অস্ত্র তৈরীর জন্যে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো প্রতিপক্ষের হাতিয়ারকে প্রতিহত করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনার। সমগ্র আফগান যুদ্ধে উভয় পরাশক্তি নিজ নিজ দেশের সশস্ত্রবাহিনীর জন্য উদ্ভাবিত নিত্যনতুন অস্ত্র পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এসবের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহারকারীকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হতো। এর একটি উদাহরণ বিশ্বে আলোচিত আমেরিকার তৈরী স্টিংগার মিসাইল (Stinger Missile)। এসমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার প্রয়াসে ক্রমে আফগানিস্তান হয়ে উঠে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের স্থান। সোভিয়েত অস্ত্রের উপর পরীক্ষানিরীক্ষাও অব্যাহত থাকে আফগান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। বেশ কয়েকটি মুজাহিদ সংগঠন কর্তৃক রাশিয়ার সৈন্যদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র চড়া দামে সি আই এ'র নিকট বিক্রয় করবার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এমন কি রাশিয়ার স্পেশাল ফোর্স, SPETZNAZ এর ব্যবহৃত অত্যাধুনিক অস্ত্রের তালিকা প্রতিটি মুজাহিদীন গোষ্ঠীকে দেয়া হয়েছিল যাতে ঐ সব অস্ত্র সি আই এ'র হাত এসে পৌঁছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে রুশ সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য অনেক অব্যবহৃত অস্ত্রও সরাসরি মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয়। সমগ্র আফগান যুদ্ধে বহু মুজাহিদ কমাণ্ডারগণ এ ব্যবসা এবং যুদ্ধে ব্যবহারের নিমিত্তে প্রাপ্ত অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় পাকিস্তানের সীমান্তে এবং করাচী বন্দর নগরীতে অস্ত্রের কালোবাজারে রমরমা ব্যবসা জমে উঠে। আশির দশকে করাচীর বাজারে একে-৪৭ (ক্লাসনিকভ) প্রতি রাইফেল আনুমানিক রূপি ১৪,০০০ পাওয়া যেত।

এখানে বহুল আলোচিত স্টিংগার মিসাইল আফগান যুদ্ধে ব্যবহারের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সনে এ মিসাইলের চালানটি মুজাহিদদের

www.nagorikpathagar.org

হাতে পৌঁছে। এর চালনার উপরে CIA এর সরাসরি উপস্থিতিতে ISI কর্তৃক প্রদান করা হয়। পরে রাশিয়ার 'হাইন্ড' হেলিকপ্টর গানশিপের বিরুদ্ধে প্রথম বাস্তব পরীক্ষামূলক ব্যবহার অত্যন্ত কৃতকার্য হয়। এরপর থেকে এ মিসাইল ব্যবহার অত্যন্ত কৃতকার্য হয় বলে বিশ্বে প্রচারিত হয়ে পড়ে। স্টিংগার মিসাইল আফগান যুদ্ধের বদৌলতে রূপকথার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। আফগান জেহাদে স্টিংগার মিসাইল সন্নিবেশ ছিল সোভিয়েতদের নিকট এক দুঃস্বপ্নের মত। এর কার্যকারিতার কারণে সোভিয়েত হেলিকপ্টার গানশিপগুলো পূর্বের মত স্বাধীনভাবে মুজাহিদ নিধন অথবা খোলাখুলি ধাওয়া করতে সক্ষম হয় নি। আফগান মুজাহিদরাও সোভিয়েত হেলিকপ্টার গানশিপের বিরুদ্ধে প্রথম বাস্তব পরীক্ষামূলক ব্যবহারে অত্যন্ত কৃতকার্য হয়। স্টিংগার মিসাইল হাতে আসার পর আফগান মুজাহিদরা সোভিয়েত হেলিকপ্টারগুলোকে প্রলুব্ধ করে ধ্বংস করত। কতগুলো Stinger Missile আফগান মুজাহিদদের দেয়া হয়েছি সে বিষয়ে আজও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি তবে Stinger উদ্ভাবন করার পর বাস্তবে এর ব্যবহার আফগান জেহাদেই প্রথম হয়েছিল। আমেরিকার সেনাবাহিনীর জন্যে এক সদস্যের, কাঁধ থেকে ছোড়া, এ Heat Seeking Missile এর দাম ছিল প্রতিটি ৩৫,০০০ মার্কিন ডলার তা ১৯৯০ সনের দিকে কালোবাজারে ১,০০,০০০ মার্কিন ডলারেও বিক্রী হয়েছে বলে তথ্যে প্রকাশ।

সি আই এ (CIA) সূত্র মোতাবেক ১৯৮৭ সনে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আফগান মুজাহিদ কমান্ডর হেকমতইয়ার কর্তৃক ১৬টি স্টিংগার মিসাইল প্রতিটি ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যে বিক্রী করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।[৩]

এসব Stinger Missile জেহাদ শেষে মুজাহিদদের থেকে পুনঃক্রয়ের মাধ্যমে ফেরত নেবার জন্যে বুশ (সিনিয়র) প্রশাসন থেকে CIA ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশেষ অনুমোদন নেয়। কিন্তু পুনঃক্রয়ের ব্যাপারে CIA তেমন সুবিধা করতে পারে নি। অব্যবহৃত মিসাইলগুলো ততদিন চড়াদামে হাত বদল হয়ে মধ্যএশীয় রাষ্ট্রগুলো আজারবাইজান, আরমেনিয়া আর চেচনিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যায়।

আমরা আগেও যেমন দেখেছি সমগ্র আফগান জেহাদে যে ধরনের অস্ত্রের প্রাচুর্য দেখা যায় তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া এর পরের আর কোন যুদ্ধে দেখা

৩। AFP Despatch, Peshawar, Pakistan, March, 7, 1994.

www.nagorikpathagar.org

যায় নি। এর ভয়াবহ দিকটি ছিল যে, এসব অস্ত্র একবার মুজাহিদদের হাতে পৌঁছার পর এর কোন হিসাব রাখা সম্ভব হয় নি। কাজেই এর হদিস রাখা এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। জেহাদের অগ্রযাত্রার সাথে পাহাড়ের ভিতরে অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলে সেখানে প্রচুর বেহিসাবী অস্ত্রের মজুদ রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ জেহাদে অংশগ্রহণকারী আরব ব্রিগেডের সদস্য ওসামা বিন লাদেনের নিজস্ব নির্মাণ কোম্পানী কর্তৃক দখলকৃত এলাকায় প্রচুর গুহা তৈরী করে এসব গুহায় অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। এসব স্থান সি আই এ'র কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। আরও পরের দিকে জালালাবাদের তোড়াবোড়া পাহাড়ের গুহার কথা জানাব।

যেমনটা আমরা এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি যে, জেহাদের পুরো সময়টাতেই সি আই এ (CIA) এবং আই এস আই (ISI) সবচেয়ে বেশী অস্ত্র সরবরাহ করে হিকমতইয়ারের সংগঠন হিজব-ই-ইসলামিকে। হিকমতইয়ার জিয়ার পোষ্যপুত্র পরিণত হওয়ায় অন্য সংগঠনগুলো অসন্তোষ প্রকাশ করলেও এতে জিয়া মোটেই বিচলিত হয় নি। এ এক কারণে মৃত্যুর পূর্বে জিয়ার সাথে মধ্যপন্থীবলে বিবেচিত মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সাথে সম্পর্ক অম্লমধুর ছিল। রাব্বানী এবং আহমেদ শাহ মাসুদ এদের মধ্যে অন্যতম।[৪]

আফগান জেহাদের যে দশবছর আমেরিকা সরাসরি লিপ্ত ছিল তার প্রতিটি বছরে শুধুমাত্র অস্ত্র ক্রয় বাবদ খরচ হতো ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক নিয়ে এ খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফি বছর। এসব অর্থের যোগান দিয়েছিল আমেরিকার সাথে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ সৌদী আরব। সৌদী আরব সমগ্র জেহাদে CIA প্রদত্ত অর্থের সম্পূরক হিসেবে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিল। সৌদী আরবের বেশীর ভাগ অর্থই আসে সে দেশের বেসরকারী অনুদান থেকে। এ অর্থ যোগানে ওসামা বিন লাদেনের মত বহু সৌদী ধনকুবেররাও এগিয়ে এসে জেহাদে তাদের নাম লিখিয়েছিল। এদের অনেকেই সুদূর জেদ্দায় অথবা আমেরিকায় বসে জেহাদের সওয়াব অর্জন করেছিল। ওসামা বিন লাদেন এবং তার সাথে অনেকেই ছিল এদের ব্যতিক্রম।

আফগান জেহাদের অর্থায়ন প্রচেষ্টায় সি আই এ (CIA) যে সব অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে তার জের পড়তে শুরু করে আরও পরে এবং এসব অর্থের

৪। ১৯৮৮ সনে প্রফেসর বোরহানউদ্দীন রাব্বানীর সাথে ইসলামাবাদে লেখকের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর ঘটনাতেও করা হয় বলে অনুমেয়। যদিও সি আই এ এখন এসব অর্থকে আল-কায়দার অর্থ বলে চালালেও, ওয়াশিংটন ভাল করেই জানে এর উৎস সি আই এ আফগানিস্তানের মাটিতেই বপন করে এসেছিল। আরও পরে আল-কায়দা ও সি আই এ (CIA) এর অনুকরণে SOVMAT এর আদলে বহু ছদ্ম কোম্পানী পরিচালনার মাধ্যমে অর্থের লেনদেন থেকে শুরু করে অস্ত্র সংগ্রহেও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল।

জেহাদ শুরু হবার আগে থেকেই আফগানিস্তানের পূর্বে পাকিস্তান সংলগ্ন সীমান্ত এলাকাতে এবং অন্যান্য প্রদেশে প্রচুর 'পপি' এবং গাঁজার চাষ অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। আর এগুলো চাষের পেছনে ছিল অত্যন্ত শক্তিধর যুদ্ধবাজ নেতা অথবা কাবুল সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য জেহাদের সময় মুজাহিদ কমান্ডারগণ নিজ নিজ বাহিনীর যাবতীয় খরচার সংগতি করার নিমিত্তে একাজে হাত দিয়েছিল। বাদশাহ জহির শাহের সময় তার সমর্থক বলে বিবেচিত পরে প্রখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার এবং ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF) এর নেতা সৈয়দ আহমেদ গিলানী, 'পপি' এবং হেরোইন ব্যবসার প্রথম সারির একজন বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল।[৫] এবং এ ফ্রন্ট আফগান যুদ্ধের সময় সি আই এ এবং আই এস আই এর নাকের ডগায় 'পপি' ফুল থেকে উৎপাদিত হেরোইনের চোরাচালান অব্যাহত রাখে। সমগ্র রাশিয়া, যার মস্কো হয়ে উঠে গিলানীর বৃহত্তম বাজারগুলোর অন্যতম।[৬] আফগান জেহাদের শুরু থেকেই রুশ সৈন্যরা আফগানিস্তানে মাদকাশক্ত হয়ে উঠে এবং এরই বদৌলতে রুশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাদকের নেশা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে রাশিয়ার সরকার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এ সময় মাদক ব্যবসা শুধু মস্কোর আন্ডার গ্রাউণ্ড সন্ত্রাসীদের মধ্যেই নয়; বরং ডুমা (DUMA -রাশিয়ার পার্লমেন্ট) এবং পলিটব্যুরোর সদস্যরাও এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। জেহাদ চলার সময়েই এক রুশ সমীক্ষায় জানা যায় যে, আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় পপি এবং গাঁজার চাষের আরও ব্যাপ্তি হয়েছিল। রাশিয়ার এ সমীক্ষার মতামতে জানা যায় যে, এসব কাঁচামাল থেকে, বিশেষ করে আফিম থেকে উন্নত মানের মরফিন জাতীয় হেরোইন তৈরীর প্রযুক্তি পশ্চিমা দেশের তত্ত্বাবধানে সরবরাহ এবং CIA এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুত

৫। Islam & Resistance : Oliver Roy P. 42.
৬। Voina V Afghanistan ; Moscow PP-131-2.

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছিল। পরে অবশ্য আফগানরা নিজেরাই এ ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠে। এ সমস্ত ল্যাবরেটরিগুলো বেশীর ভাগ হিকমতইয়ার এবং গিলানীর মুজাহিদ ক্যাম্পের আওতায় পরিচালিত হতো অন্যদের চেয়ে বেশী। গিলানীর পূর্ব রেকর্ড এবং জেহাদের সময় তার বিস্তীর্ণ হেরোইন ব্যবসার নেটওয়ার্কের কারণে রাশিয়ানদের নিকট সে 'হিরোইনের রাজা' বলে পরিচিতি লাভ করে। রাশিয়ার সূত্র মতে, এ সময় আমেরিকার সি আই এ হিকমাতইয়ার এবং গিলানীকে এ হেরোইন ব্যবসায় প্রচুর সহযোগিতা করে।[৭]

সি আই এ'র (CIA) মাদক ব্যবসার সাথে বিভিন্ন সময়ে জড়িত হবার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপ শুরু হয় ইন্দো-চায়না যুদ্ধের সময়। ঐ সময় সি আই এ (CIA) স্থানীয় উপজাতীয় বাসিন্দাদের ব্যাপক হারে পপি এবং গাঁজা চাষে উৎসাহিত করত যাতে অর্থের অভাবে এসব উপজাতীয়রা কম্যুনিস্টদের সহায়তা না করে। যদিও এর পরে আমেরিকার ডি ই এ (DEA: ড্রাগ এনফোরস্‌মেন্ট এডমিনস্‌ট্রেশন) সময় সময় সি আই এ'র এ মাদক যুদ্ধের ক্ষমতা খর্ব করে তবুও সি আই এ প্রয়োজনবোধে এসব বাধ্যবাধকতা প্রায়শঃই উপেক্ষা করে আসছে তেমনি ঘটেছিল আফগানিস্তানের ব্যাপারেও।

আফিম ও হেরোইনের অবৈধ ব্যবসায় সাতটি মুজাহিদ গ্রুপই কমবেশী জড়িত ছিল। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, কেবল মাত্র ১৯৮৯ সনেই প্রায় ৮০০ টন আফিম উৎপাদিত হয়েছিল। এসব আফিমের চালান প্রায় প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের খাইবার গিরিপথের শেষ বাজার লান্ডিকোটাল থেকে বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হয়ে থাকত। সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সমগ্র সময়ব্যাপী লান্ডিকোটাল পৃথিবীতে আফিমের সবচেয়ে বড় বাজারে পরিণত হয়। এর মধ্যে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের বহু ব্যক্তি আফিমের রপ্তানীকারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠে।

আফিম উৎপাদন আর এর চোরাচালান সবই সি আই এ'র তত্ত্বাবধানে করার জন্যে রিগানের সি আই এ ডাইরেক্টর উইলিয়াম কেসি ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৮২ সনে সি আই এ'র উপর মাদক চোরাচালানে সহায়তা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে শিথিল করাতে সক্ষম হলে অতপর সি আই এ কে এ ব্যাপারে

৭। Unholy Wars p -131

www.nagorikpathagar.org

আর কারও কাছে জবাবদিহী করতে হয় নি।

CIA এর উৎসাহ আর মুজাহিদ নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্রমেই আফগানিস্তানের অত্যন্ত বিশুদ্ধ হেরোইন বিশ্ববাজারে প্রচুর চাহিদার সৃষ্টি করে। আর এসব হস্তান্তর হয়ে পাকিস্তানী চোরাকারবারিদের মাধ্যমে ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, নাইজেরিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, বৃটেন, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, এবং ফিনল্যান্ড পর্যন্ত বাজার বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আফগান জেহাদের পর আফিমের চাষ আর বন্ধ করা সম্ভব হয় নি বরং এর চাষ আরও ব্যাপক হয়েছে। আফগানিস্তানের হিরোইন নিউইয়র্কের বাজার হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড পর্যন্ত পৌছতে শুরু করলে আমেরিকার টনক নড়ে উঠে। এ হিরোইনের ব্যবসা এমনই জমজমাট হয়ে উঠে যে, এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতিপত্তি পাকিস্তানের আই এস আইও খর্ব করতে পারে নি। এমনি এক ব্যক্তি হাজী আইয়ুব আফ্রিদী। হাজী আফ্রিদীর বিরুদ্ধে আমেরিকা অনেক চেষ্টা করেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। আফ্রিদীর সাথে এখনও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল পিপিপি (PPP) এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে বলে প্রকাশ।

জেহাদ চলার সময়ে যে পরিমাণ আফিম উৎপাদন এবং এর থেকে যে হেরোইন তৈরী হয় তার পরিমাণ প্রায় ৫০০ টন বলে অনুমান করা হয়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত আফগানিস্তানে পপি উৎপাদন থেকে হেরোইন বাজারজাত করে প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জিত হয়েছিল। এ ব্যবসা এখনও চলছে তবে সি আই এ বা আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় আফিম উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী বলে ধরা হচ্ছে। আফগানিস্তানে আফিম চাষ ও চোরাচালান তালেবানদের সমর্থনে হচ্ছিল বলে জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়। তালেবানদের এসব মাদক উৎপাদন বন্ধ করবার জন্যে জাতিসংঘ কর্তৃক চাপ প্রয়োগ করা হলে যৎসামান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় মাত্র তবে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয় নি। ১৯৯৯ সনে জাতিসংঘ কর্তৃক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করার পর থেকে মাদক ব্যবসা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যার সাথে আল-কায়দার জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ তালেবানরাই প্রায় সব মুজাহিদ কমাণ্ডারদের অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনের এবং ব্যক্তিগতভাবে মাদকদ্রব্যের চোরাচালানীর সাথে জড়িত থাকার জন্যে অভিযুক্ত করে আসছিল। অথচ তালেবানরাও কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা আর খড়ার কারণে গতানুগতিক

www.nagorikpathagar.org

ফসল না হওয়ার অজুহাতে আফিম চাষ অব্যাহত রেখেছিল।

আফগানিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় অতি সহজে উৎপাদনযোগ্য আফিম এর চাষ বহুযুগ থেকেই হয়ে আসছিল তবে তা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে নি এবং এত বড় বাজারে প্রবেশও করে নি। যৎসামান্য চাষ বেশীরভাগ সীমান্ত এলাকায় নিজেদের ব্যবহারের জন্যেই হতো। কিন্তু আফগান জেহাদের সময় হেরোইন উৎপাদন এবং একে বাজারজাত করণের মত অবস্থা ইতিপূর্বে কখনই ছিলনা। এ জেহাদের সময় থেকে আফিমের এ ব্যাপক চাষ এখন জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা বিশ্বের জন্যে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জতিসংঘের মাদক বিষয়ক UNINCB (UNINCB: ইউনাইটেড নেশান ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল বোর্ড) এর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সনেই প্রায় ২,২০০ টন আফিমের চাষ হয়েছে যা এর পূর্বের বছরের তুলনায় ৯% বেশী।[৭] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১০ টন আফিম থেকে ১ টন হেরোইন উৎপাদিত হয়। আজ আফগানিস্তান মায়ানমারকে পেছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর মাদক উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। আফগানিস্তানের এ পরিচয়ও সি আই এ পরিচালিত জেহাদের ফসল। এ অভিশাপ থেকে কবে মুক্ত হবে তা বলা দুস্কর।

১৯৮১ সনের জানুয়ারীতে আমেরিকায় রিগান প্রশাসনের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আফগান জেহাদে প্রকৃতপক্ষে গতির সঞ্চার হয়। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিগান তার পূর্বসূরীর স্থবির বৈদেশিক নীতির ঘোর বিরোধিতা করেই আমেরিকার হারানো গৌরব পুনঃরুদ্ধার করবার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তার প্রথম দায়িত্বই ছিল ইরানে বিপর্যয়ের ঘোর থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করে জাতীয় মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। যদিও ইরানের ঘটনাগুলোর সাথে রাশিয়ার কোন যোগসূত্র ছিল না তবুও আমেরিকার নীতিনির্ধারকরা ভাল করেই জানত যে, ঐ সুযোগ নিয়েই রাশিয়া আমেরিকার নাকের ডগার উপর দিয়ে শতবছরের স্বপ্ন Warm Water Port দখলের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। 'একে যেকোন মূল্যেই রুখতে হবে।' আর এটা করা যেতে পারে তার পূর্বসূরী অনুসৃত হাতে নেয়া পরিকল্পনার গতি সঞ্চার করে। রিগান জানত যে, এটা সহজ কাজ হবে না। তাকে ধৈর্য ধারণ করে এ ছায়াযুদ্ধ

৭। Time/Asia: March 22, 1999, Vol. 153, No. 11

www.nagorikpathagar.org

চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন একজন অত্যন্ত বেগবান ব্যক্তির যে সি আই এ কে সচল করতে পারে।

রোনাল্ড রিগান জেহাদে গতি সঞ্চার করার জন্যে তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ট বন্ধু উইলিয়াম জোসেফ কেসিকে আমেরিকার সি আই এর পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে আফগান জেহাদের সম্পূর্ণ ভার তার হাতে ছেড়ে দিল। শুরু হল আমেরিকার ইসলাম প্রীতির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই থেকে কেসি আফগান জেহাদের অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হল।

উইলিয়াম কেসি একজন সার্থক আইনজীবী। রিচার্ড নিক্সনের এবং রিগানের নির্বাচনের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবার সুবাদে রিপাবলিকান পার্টির একজন নিবেদিত প্রাণে পর্যবসিত হয়েছিল। কে সি, আফগানিস্তান সোভিয়েত মুক্ত হবার দু'বছর আগেই মারা যায় বলে তার পরিশ্রমের ফল দেখে যেতে পারে নি। তবে আজও সি আই এ'র সোনালী ইতিহাসের পাতায় কেসির নাম থাকবে সর্বাগ্রে। কারণ, যদিও ছোট আকারে তবুও আফগানিস্তান অনুরূপ ছায়াযুদ্ধ সে মধ্য আফ্রিকা আর এঙ্গোলাতেও অত্যন্ত দক্ষহাতে পরিচালিত করেছিল। কেসি সি আই এ পরিচালনায় তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগ OSS এ কাজ করবার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। কেসির অনেকগুলো কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এ জেহাদে আফগান মুজাহিদ ছাড়াও অধিকতর মুসলিম দেশ এবং মুসলমানদের এ জেহাদে যুক্ত করা এবং এদের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেনিং দেয়া। এতে আমেরিকান মুসলমানদের যোগদানকেও স্বাগত জানানো হয়েছিল। কেসির মূলমন্ত্র ছিল 'যেই কথা সেই কাজ।' তার কাছে পশ্চাদাপসারণ ছিল সহ্যের বাইরে, অকল্পনীয় বিষয়।

প্রথম পদক্ষেপ এবং পূর্ব শর্তের প্রেক্ষিতে, কেসি পাকিস্তানের আই এস আই এর প্রধান জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান এবং আফগান বিষয়ক ডেস্কের প্রধান ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ এর সাথে সি আই এ'র সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। কেসি যতদিন এ দায়িত্বে ছিল প্রতি বছরই ইসলামাবাদে আই এস আই এর সাথে একই পদ্ধতিতে সরাসরি যোগাযোগ রেখেছিল আর এ কারণেই ক্রমেই সি আই এ এবং আই এস আই প্রায় এক অবিচ্ছেদ্য সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। কেসির প্রথম কাজটি ছিল পাকিস্তানের আই এস আই কে নতুন করে পুনঃবিন্যাস

www.nagorikpathagar.org

করা এবং সি আই এর ধাঁচে সর্বপ্রকারের ট্রেনিং দেয়া। আফগানিস্তানে জেহাদের কারণেই আই এস আই তে কট্টর ইসলামপন্থী অফিসারদের জায়গা দেয়া হয়। আই এস আই এর প্রায় ৯০% ভাগ অফিসার যার মধ্যে এ সংস্থার প্রধানও সামিল, চাকুরীরত সামরিক অফিসারদের থেকেই নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রথমতঃই আই এস আই এর মেয়াদ শেষে বিভিন্ন সেনা ইউনিটে বদলি করা হয়। আই এস আই থেকে বাইরে চাকুরী করলেও এসব কর্মকর্তাদের পুরানো যোগাযোগ অব্যাহত থাকে বিশেষ করে সিনিয়র কর্মকর্তাদের বেলায়। কাজেই আই এস আই (ISI) এর ভাবধারা সহজেই সমগ্র সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে।

সি আই এ'র ধাঁচে প্রশিক্ষণের জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে আই এস আই এর জন্য CIA এর 'অপারেশনাল ম্যানুয়াল' গুলো উর্দুতেও তর্জমা করতে হয়। এসব ম্যানুয়ালের অনেকগুলোরই হদিস পরে আর পাওয়া যায় নি। ধরে নেয়া হয় যে, এসব ম্যানুয়েল বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন অফিসারের ব্যক্তিগত ব্যবহারে চলে যায়। এসব ম্যানুয়েল অবৈধ পথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতেও চলে আসার খবরও পাওয়া যায়।

কেসি-আখতারের প্রথম বৈঠকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সাব্যস্ত হয় যে এ জেহাদের বিষয়ে শুধুমাত্র মুজাহিদদের কার্যকলাপ ছাড়া আর কোন বিষয়েই এবং কোন দেশের সম্পৃক্ততার কথা বা প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি বা কোন ব্যাপারেই সরকারী স্বীকৃতি দেয়া যাবেনা। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ এবং অ-আফগানদের এ যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে। এর কারণ, যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর উপর প্রতিক্রিয়া হলে CIA এর কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হতে না পারে। এ ধরনের কার্যকলাপ প্রকাশ হলে সোভিয়েত জোট একে প্রপাগাণ্ডার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারত বলে এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। আরও সাব্যস্ত হয় পাক-আফগান সীমান্ত জুড়ে প্রায় ১৪০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে যেগুলো মুজাহিদ এবং শরণার্থী শিবির থেকে রিক্রুটকৃত জেহাদীদের প্রশিক্ষণের জন্যে। এসব বিশেষ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্যে আমেরিকার স্পেশাল ফোর্সের আদলে গড়ে উঠা পাক সেনার SSG কে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছিল। আর এ জন্যে পাকিস্তানী প্রশিক্ষকদের যুক্তরাষ্ট্রে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত বিশ্বের সেরা কমাণ্ডো বা 'স্পেশাল ফোর্স' ট্রেনিং ক্ষেত্র বলে পরিচিত, ফোর্ট বেনিং এ কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আরও

www.nagorikpathagar.org

সাব্যস্ত হয় যে, অ-আফগান স্বেচ্ছাসেবক জেহাদীদের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে সিআই এ এবং স্পেশাল ফোর্সের তত্ত্বাবধানে মিশরে এবং উত্তর আমেরিকার মুসলমানদের জন্যে ক্ষোদ আমেরিকাতেই স্পেশাল ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হবে এবং হয়েছিলও তাই। অন্যান্য দেশের স্বেচ্ছাসেবক জেহাদীদের পাকিস্তানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে অ-আফগান সেক্টরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আফগান মুজাহিদদের সাথে প্রয়োজনবোধে সীমান্ত এলাকার পাকিস্তানী পশতুন স্বেচ্ছাসেবকদের সামিল করা ইত্যাদি। এসব সিদ্ধান্ত ঐ সময়ে চূড়ান্ত করা হলেও ইতিপূর্বেও ঐ শর্তেই কার্টার প্রশাসনের সময়েই জেহাদের সূচনা করা হয়েছিল।

পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক CIA এবং ISI যৌথ ভাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায় একশ'র উপরে এবং বেলুচিস্তান সীমান্তের নিকট আর চল্লিশটির মত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলে। এসব কেন্দ্রগুলো আরো পরে মুজাহিদ কর্তৃক আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে মুক্ত এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কান্দাহার এলাকার এসব বেশীর ভাগ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো আরও পরে তালেবান এবং আল-কায়দার ট্রেনিং ক্যাম্পে পরিণত হয়।

অন্যদিকে আফগান জেহাদের সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিবেশী চীন তার নিজস্ব ভূকৌশলগত কারণে আফগান সংলগ্ন সিনজিয়াং প্রদেশের মুসলমান প্রধান উইগুড় অঞ্চলে স্থানীয় জেহাদীদের জন্যে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিল। স্মরণযোগ্য যে, আফগানিস্তানের সাথে চীনের এ অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র সীমান্ত পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ওয়াখান কড়িডোরটি সোভিয়েতরা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিল। চীনা মুসলমানদের প্রাথমিক প্রয়াসই ছিল ওয়াখান অঞ্চলকে মুক্ত করা। যদিও চীন আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের বহু আগে থেকেই কাবুলে মস্কোপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পাকিস্তানের মাধ্যমে সামরিক সাহায্য পাঠাচ্ছিল কিন্তু সরাসরি অংশগ্রহণ করে নি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদে চীনের মুসলমানদের অংশগ্রহণ এবং বেজিং এর সাহায্য প্রদান অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত মনে করে আমেরিকা চীনের সমর্থন সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। একারণেই জিমি কার্টারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হ্যারোল্ড ব্রাউন ১৯৮০ সনের ৩-১৩ জানুয়ারী এক লম্বা সফরে বেজিং এ উপস্থিত হয়। হ্যারোল্ড ব্রাউন সে সময় চীনের নেতা দেং শিয়াওপিং এবং প্রধানমন্ত্রী হুয়া গুয়া ফেং এর সাথে আফগানিস্তান এবং পরিকল্পিত জেহাদ

www.nagorikpathagar.org

সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে। আলোচনার মধ্যেই ব্রাউন উপলব্ধি করে যে, বহু আগে থেকেই চীন এ জেহাদের সামিল হবার জন্যে একতরফা প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছিল।

চীনের সম্মতির পরপরই চীনের নিকট আধুনিক প্রযুক্তির সামরিক উপকরণ বিক্রয়ের উপর আমেরিকার যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তার অবসান ঘটে। প্রথম পর্যায়ে অত্যাধুনিক এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সেটেলাইট এর মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধার জন্যে 'গ্রাউন্ড স্টেশন' বিক্রয়ের অনুমোদন দেয়া হয়। মে ২০, ১৯৮০ সনে চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী গোংবিয়াও ওয়াশিংটন সফর করে মিশর, সৌদী আরব, পাকিস্তান আর আমেরিকার সাথে একযোগে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে অংশগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। এ সফরের পরপরই চীনের সামরিক বাহিনীর জন্যে আমেরিকার তৈরী প্রচলিত (Conventional) সামরিক উপকরণের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। হ্যারোল্ড ব্রাউনের চীন সফর এবং পরে চীনকে জেহাদে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের সাথেই আমেরিকার একটি অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দা ফাঁড়ি (Intellegence Post) উইগুড় মুসলিম সায়ত্তশাসিত এলাকায় স্থাপন করা হয়। এ ব্যাপারটি বহু বছর সবার অগোচরে গোপন থাকে।[৮] এ দুটি গোয়ান্দা পোস্টের প্রয়োজনীয়তা আমেরিকা ও ন্যাটোর রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মিসাইল সাইট এবং সামরিক গতিবিধির নিরিখের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজেনীয় ছিল। ইতিপূর্বে এধরনের দুটি পোস্ট ইরানের উত্তরাঞ্চলে ছিল যেগুলো ইরানে ইসলামিক অভ্যুত্থানের সময় অকেজো করে ফেলাতে প্রায় একবছর ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার সামরিক গতিবিধির স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব হচ্ছিলনা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, চীন আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এ দুটি গোয়েন্দা পোস্টে CIA এর উপস্থিতিও মেনে নিয়েছিল। এ গোয়েন্দা পোস্ট দুটি স্থাপনের পর এগুলোকে আমেরিকায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চীনা কারিগর দ্বারা পরিচালিত হলেও সমগ্র প্রজেক্টই ছিল CIA এর সাইন্স এণ্ড টেকনোলজী ডাইরেক্টরেটের অধীনে।[৯] এ গোয়েন্দা পোস্টের স্থাপনায় ওয়াশিংটন এবং বেজিং উভয়কেই রাশিয়ার তৎকালীন মধ্যএশীয় অঞ্চলের সামরিক তৎপরতার পুঙ্খানুপুংখ তথ্য পরিবেশন করতে সাহায্য করে। যদিও ওয়াশিংটন নেপথ্য এ পোস্ট দুটির বাগডোর ধরে রাখলেও বেজিংকে বাহ্যতঃ এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ

৮। Unholy Wars : P-66

৯। Ibid : P 69

www.nagorikpathagar.org

আর ব্যবহারের অধিকার দেয়া হয়েছিল। পরে এ অত্যন্ত গোপনীয় এবং স্পর্শকাতর পোস্ট দুটির নিয়ন্ত্রণ চীনের হাতে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। সেদিন হয়ত ওয়াশিংটন এবং বেজিং বুঝতে পারে নি যে, আরও এক যুগ পরে উইগুড় মুসলিম বিদ্রোহীরা এ অঞ্চল বেজিং এর নিয়ন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নেবার প্রয়াস করবে। 'কিতাই' এবং 'কোবলা' নামক এ দুটি পোস্ট এপ্রিল ১৯৮৯ সনে চীনের তিয়েনানম্যান চত্বরে ঘটে যাওয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সামরিক শক্তি দিয়ে স্তিমিত করবার বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রতিবাদ স্বরূপ বন্ধ করে দেয়। এদুটি পোস্ট বন্ধ করার পেছনে ওয়াশিংটনের অন্য ধরনের মনবৃত্তিও কাজ করছিল। আর তা হল সোভিয়েত বাহিনীর বিপর্যয়ের পর ওয়াশিংটন রাশিয়ার ভাঙ্গনের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হওয়ায় এ পোস্টের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে মনে করে নি। ততদিনে চীনের সাথে বহু কারণেই আমেরিকার মতবিরোধ বাড়ছিল এবং আমেরিকা চীনা নেতৃত্বকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

প্রায় ৩০,০০০-৪০,০০০ উইগুড় মুসলমান এবং পাকিস্তানের আরও উত্তরেস্থিত রাশিয়ান কিরগিজ মুসলমানদের সমন্বয় করে জেহাদের প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব চীনের পিপলস্ লিবারেশ আর্মির গোয়েন্দা বিভাগের উপর দেয়া হয়েছিল। এসব চীনা মুজাহিদরা 'ওয়াখান' কড়িডোর এলাকা দিয়ে চীনা গোয়েন্দা সংস্থা এবং ISI এর সমন্বয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করে। আরও পরে, সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগের পর চীনের সিনজিয়াং প্রদেশে চলে উইগুড় মুসলমানদের বেজিং এর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নবাদ যুদ্ধ। যা বর্তমানে বেজিং এর জন্যে মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগান জেহাদে অংশগ্রহণকারী উইগুড় মুসলমান জেহাদিদের বিরুদ্ধে বেজিং বর্তমানে সমগ্র অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বেজিং সরকার উইগুড় মুসলমানদের এ বিচ্ছিন্নবাদ আন্দোলনে তালেবানদের সহযোগিতার অভিযোগ তুলে ২০০১ সনে আবার আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী জোটের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে রাশিয়া মধ্য এশীয় অঞ্চল কিরগিজিস্তানেও চলছে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন। এসমস্ত আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বে রয়েছে একদা CIA আর ISI থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রাক্তন মুজাহিদ বা জেহাদীরা। এদের হাতে রয়েছে আফগান যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র। এরা নতুন মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে CIA এবং স্পেশাল ফোর্সের ম্যানুয়েল

www.nagorikpathagar.org

মোতাবেক। এরাই বর্তমানে চীন, রাশিয়া আর ভারতের জন্যে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ পর্যায়ে সুধী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ না করলেই নয়। তা হল আফগান জেহাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের একটি উদাহরণ চেচনিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম আন্দোলন। চেচনিয়া দক্ষিণ পশ্চিম রাশিয়ার মধ্যে একটি দ্বীপের মত। ১৮৫৮ সনে ওসমানীয় (OTOMAN) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকে এলাকাটি মুসলমান প্রধান হয়ে উঠে। ৯০০০ বর্গমাইলের এ এলাকটিতে মোট ১২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২,৮০,০০০ রুশ এবং ৭,৩৫,০০০ স্থানীয় চেচেন অধিবাসী। সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গার পর চেচনিয়া স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত। ইতিপূর্বেও ১৯৪২ সনে বিদ্রোহ দমনের জন্যে তৎকালীন স্বৈরশাসক স্টালিন চেচনিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজধানী গ্রোজনী থেকে বিদ্রোহী নেতাদের রাশিয়ার মধ্য এশীয় অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠায়। বর্তমানে চেচনিয়াতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দালনে আফগান মুজাহিদদের নেতৃত্বে রয়েছে বলে প্রমাণিত। এছাড়া গুলবদিন হেকমতইয়ার চেনিয়ার যুদ্ধে সরাসরি যোগাযোগ রেখেছিল। পরে তালেবান এবং আল-কায়দার জড়িত থাকার অভিযোগ রাশিয়ার সরকার প্রায়সই করে থাকত এবং এখনও করছে। রাশিয়া চেচনিয়ার স্বাধীকারের যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করে চেচনিয়াকে তার অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে বর্ণনা দেয়। চেচনিয়ার ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা অনেকটা ভারতের কাশ্মীরের মত। এতদিন আমেরিকা চেচনিয়ায় রাশিয়া কর্তৃক মুসলিম নিধনকে কৌশলগত কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে আসছে। তবে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের পরের পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় রাশিয়া আমেরিকার সাথে জোটভুক্ত। কাজেই ভবিষ্যতে চেচনিয়া আদৌও আমেরিকার নৈতিক সমর্থন পাবে কিনা তা অনিশ্চিত। হয়ত চেচেনদের স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আরও বহু বছর।

ফিরে আসি চীনের জেহাদে অংশগ্রহণের বিষয়টিতে। কম্যুনিস্টপন্থীদের উত্থানের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় মাও এবং বামপন্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেবার পূর্বঅভিজ্ঞতা চীনের থাকলেও আফগান জেহাদের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। এ অভিজ্ঞতা শুধু একসাথে এ বিরাট এবং আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়াই ছিল না; বরং ছিল

www.nagorikpathagar.org

প্রথমবারের মত ধর্মভিত্তিক গেরিলাযুদ্ধে চীনের যোগাদানের বিরল অভিজ্ঞতা। চীনের জন্যে আরও একটি বিরল অভিজ্ঞতা হল, বিগত চল্লিশ বছর ধরে 'কাগুজে বাঘ" আখ্যায়িত পুঁজিবাদ বিশ্বের নেতা আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত বিরুদ্ধচারণ করা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চীনের প্রশিক্ষণের এবং জেহাদীদের অস্ত্রায়ন সহ যাবতীয় বিষয়ে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পূর্ণ খরচ CIA বহন করে। যদিও চীন এযুদ্ধে পূর্ব থেকেই হাতিয়ার সরবরাহ করে আসছিল তবুও ১৯৮৪ সনের পরই উইগুড় মুসলিম মুজাহিদ এবং আফগান মুজাহিদদের ১০৭ মি.মি. মর্টার; ১২২ মি.মি. গান এবং টাইপ ৬৩-১:১২ টিউব বিশিষ্ট রকেট লাঞ্চার যোগান দিয়েছিল। সে সাথে অগণিত সংখ্যায় যোগান দেয় গোলাবারুদ।[১০] আজও এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্র আফগানিস্তানে ব্যবহৃত হচ্ছে। হালকা অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে উইগুড় অঞ্চলে খোদ বেজিং এর বিরুদ্ধে। এ সময়ে চীন প্রায় ৫০,০০০ মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

সোভিয়েত বিরোধী আফগান জেহাদে চীন প্রথমে স্বতস্ফূর্তভাবে শুধুমাত্র রাশিয়া বিরোধের কারণে এবং চীনের দক্ষিণ পশ্চিমে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার রোধের প্রচেষ্টায় আফগান মুজাহিদদের যৎসামান্য অস্ত্র দ্বারা সহযোগিতা দিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল মাত্র। ক্রমেই আমেরিকা আর CIA এর মত চীনও সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণমুখী সম্ভাব্য অভিযাত্রার তত্ত্ব বিশ্বাস করে সরাসরি উইগুড়ের মুসলমানদের এ জেহাদে সামিল করতে সম্মত হয়েছিল।

আফগান জেহাদের সময়সীমা এক দশক হলেও এর প্রথম দু'বছর শুধুমাত্র আফগান মুজাহিদরা নিজস্ব এলাকা ভিত্তিক নেতৃত্বে মস্কোপন্থী সরকার এবং রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ঐতিহাসিক নিরিখে আফগানরা নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে আবহমানকালের প্রচলিত গেরিলাযুদ্ধে পারদর্শী। এর সত্যতা চেঙ্গিস খান হতে ভারতের শেষ বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনও স্বীকার করেছিল। ১৯৮২ সন থেকে রিগান প্রসাশনের সরকার এ জেহাদকে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ছায়াযুদ্ধে (Proxy War) পরিণত করতে শুরু করেছিল। এরই আলোকে প্রশিক্ষণের নীতিগত ব্যবস্থা নির্ণয়নের পর শুরু হয় CIA এবং আমেরিকার অভ্যন্তরে FBI কর্তৃক মুসলমান তরুণ জেহাদীদের CIA এর তালিকাভুক্তি করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর আফগান যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে পাকিস্তানে প্রেরণ।

১০। Mohammad Yousuf : Bear Trap P. 83-85

www.nagorikpathagar.org

এরই মধ্যে প্রথম পর্যায়েই সৌদী আরব থেকে ওসামা বিন লাদেন পেশাওয়ারে এসে পৌঁছে। প্রথমেই আফগান জেহাদের পরিস্থিতি অনুধাবন করবার পর অ-আফগান মুজাহিদদের সংগঠন করে যুদ্ধে বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠীকে সহায়তা করবার দায়িত্ব নেয়। এ কাজ সুচারুভাবে করবার জন্যে ওসামা বিন লাদেন ১৯৮৪ সনের দিকে সম্পূর্ণ স্বউদ্যোগে এবং নিজস্ব খরচে প্রথমে আব্দুল্লাহ আজ্জমের সাথে এবং এর পরে নিজে আল-কায়দা (বেস বা মূল) নামক সংগঠন গড়ে তোলে। এ সংগঠনের কাজ ছিল অ-আফগান মুজাহিদদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা এবং বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত করা। এখানে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত নথিপত্র সবিস্তারে রাখা হতো যাঁর মধ্যে জেহাদে আগত প্রতিটি অ-আফগানদের সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ থাকত যা আজও রয়েছে। ক্রমেই ওসামা বিন লাদেন নিজের উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ইসলামপন্থী সংগঠন এবং এদের রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে রিক্রুট করতে শুরু করে এবং এদের অনেকেই CIA এর মাধ্যমে আল-কায়দায় এসে উপস্থিত হয় আফগান জেহাদে যোগ দেবার জন্যে । আমরা আল-কায়দা বর্ণনায় আর একটু পরে ফিরে আসব।

CIA এর পরিকল্পনানুযায়ী জেহাদীদের রিক্রুটিং শুরু হয় ১৯৮২-৮৩ সনের মাঝামাঝি থেকে। খোদ আমেরিকার মুসলমানদের মধ্যে আরব বংশদ্ভূত স্থায়ী এবং অস্থায়ী নাগরিক, অধ্যায়ন রত ছাত্র এবং ব্ল্যাক মুসলিম আমেরিকানদের FBI এর মাধ্যেমে রিক্রুট করা শুরু হয়। এদের তালিকাভুক্তির পর কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ ধরনের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল নিউইয়র্কের আরব ডিস্ট্রিক, ব্রুকলেনের আটলান্টিক এভিনিউতে। আরেকটি ছিল কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন রাইফেল ক্লাবে। এমনি আরও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল ডেট্রয়েট এবং ডিয়ারবর্ণ এর আরব আমেরিকান এলাকায় আরও ছিল মিসিগান আর লস্এঞ্জেলস্ এর মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোতে।

এসবের মধ্যে ব্রুকলেনের 'আল-কিফাহ' আফগান 'রিফিউজি' কেন্দ্র ছিল একাধারে রিক্রুটমেন্ট সেন্টার এবং অনুদান গ্রহণ করবার মূল কেন্দ্র। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এখানে প্রচুর অনুদানের অর্থ জমা হয়। এর মধ্যে আরব-আমেরিকান এমনকি নিউইয়র্কে সফররত আরব ধনকুবেররা প্রচুর অর্থ যোগান

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছিল। এক কথায় এ কেন্দ্র আমেরিকায় আফগান জেহাদীদের মূল প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল আর এর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল আমেরিকার FBI।

ব্রুকলেনের এ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল প্রাক্তন প্যালেস্টাইনীয়া গেরিলা নেতা, 'হামাস' (HAMAS) নামক মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক সংগ্রামী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ আজ্জম। হামাস ((HAMAS) আজও গাজা এবং পশ্চিমতীরে সক্রিয় রয়েছে। আব্দুল্লাহ আজ্জমের প্রতিনিধি মোস্তফা চালাবি ব্রুকলেনের এ কেন্দ্র সার্বিকভাবে দেখাশোনা করত। আব্দুল্লাহ আজ্জম স্বউদ্যোগে আফগানিস্তানে জেহাদের জন্যে সমস্ত আমেকিরা ঘুরে জেহাদীদের ভর্তি করবার দায়িত্ব নিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করে। পরে CIA এর তথ্যে জানা যায় যে, আব্দুল্লাহ আজ্জম আফগান জেহাদী সংগ্রহ করা ছাড়াও 'হামাস' এর জন্যেও অর্থ সংগ্রহের যুগপৎ প্রয়াস চালিয়েছিল। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ আজ্জম ১৯৮৮ সনে এক গাড়ীতে রাখা বোমার আঘাতে রহস্যজনকভাবে পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করে। আজ্জমের মৃত্যুর পেছনে পৃথিবীর সকল গোয়েন্দাবাহিনীকে সন্দেহ করা হয় এমন কি খোদ CIA এ কেও। এর সন্দেহের কারণ ছিল আফগান জেহাদে 'হামাস' প্রধান এর প্রকাশ্যে সংযুক্তি CIA এর জন্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির অবতারণা করেছিল।[১১] আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চাদাপসারণের পর আব্দুল্লাহ আজ্জমের জেহাদীদের অনেকেই ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দার সাথে জড়িত রয়ে যায়। আব্দুল্লাহ আজ্জমের সহযোগী মোস্তফা চালাবি ১৯৯১ সনে নিউইয়র্কে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে রহস্যজনক ভাবে খুন হয়। FBI এ হত্যার পেছনে অর্থের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদকে কারণ দেখিয়ে তদন্তের নথি বন্ধ করে দেয়।

CIA এর ছত্রছায় জেহাদের জন্যে অনেক রিক্রুটকৃত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেহাদীরা আফগান যুদ্ধের শেষে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মিশর হতে বিতাড়িত অন্ধ ধর্মীয় নেতা শেখ ওমর আব্দুল রহমান, যার দুই ছেলেকে আজ্জম জেহাদের জন্যে আফগানিস্তানে পাঠায় এবং পরে এরাও ১৯৯৩ সনে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলা, ঐ একই বছরের জাতিসংঘের সদরদপ্তর উড়িয়ে দেবার এবং FBI সদর এবং টানেল ইত্যাদিকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্রেও জড়িয়ে পড়ে। এসব রিক্রুটদের একজন ছিল রামজে আহমেদ ইউসুফ। তাকে এসবের হোতা বলে ধরা হয়েছিল।

১১। Un holy Wars : P-236

www.nagorikpathagar.org

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৩ সনে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের গাড়ীতে রাখা বোমা হামলায় ঐ গাড়ীর পার্কে প্রায় ২০০ ফিট প্রশস্ত এবং ২০ ফিট গর্ত তৈরী হয়েছিল কিন্তু ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারের তেমন কোন ক্ষতি হয় নি। হামলায় ছয় জন নাগরিক মারা গিয়েছিল। এ বোমা তৈরী হয়েছিল 'এমোনিয়াম নাইট্রেড' আর জ্বালানী তেলের ব্যবহারে। তৈরী পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা তবে মজার ব্যাপারটি হল যে, এ ধরনের বোমা তৈরীর পদ্ধতি CIA এর ম্যানুয়ালে যেভাবে দেয়া আছে ঠিক সেভাবেই তৈরী হয়েছিল। এ বোমা তৈরী এবং একে সঠিকভাবে লাগানোর পেছনে ২৯ বছর বয়স্ক বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী রামজে আহমেদ[৫] ইউসুফের হাত ছিল।

---

[৫] রামজে আহমেদ ইউসুফের বৃত্তান্ত হলিউডের জমজমাট ছবির রোমাঞ্চকর গল্পের মত শোনা যেতে পারে। ১৯৯৩ সনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বোমা হামলার প্রধান হোতা হিসেবে বর্তমানে আমেরিকার ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের হাকিম কেভিন ডাফি প্রদত্ত ১৮০ বছরের কারাদন্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার সাথে আরও পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে সালমেহ, আহমেদ এজাজ, নিদাল আইয়াদ এবং মোহাম্মদ আবু হালিমকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এদের মধ্যে আরও একজন আহমেদ রহমান ইয়াসিনকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। মনে করা হচ্ছে ইয়াসিন ইরাকে পালিয়ে আছে। এদর সবাইকে মিশরের বর্তমানে অন্ধ ধর্মযাজক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল রহমানের অনুসারী মনে করলেও রামজে ইউসুফ ছিল CIA কর্তৃক আফগান জেহাদে ঠেলে দেয়া হাজার হাজার তরুণের মধ্যে একজন।

রামজে ইউসুফের সাথে এক পর্যায়ে ওসামা বিন লাদেনের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৯৩ এর ঘটনার পূর্বে রামজে ইউসুফ প্রায় দু'বছর ওসামার অর্থে পরিচালিত পেশাওয়ারে 'বাইয়েত আসহুদা' নামক অতিথিশালায় থাকত। আর পরে ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৯৫ সনে CIA, FBI এবং ISI এর সমন্বয়ে গঠিত একদিন হামলা চালিয়ে, ইসলামাবাদে ওসামা পরিচালিত আরও একটি অতিথিশালা 'সুকামা' থেকে গ্রেফতার করে। রামজে ইউসুফের বিরুদ্ধে ম্যানিলায় পোপকে হত্যার অভিযোগও আনা হয়েছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো নিজে রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনকে ১৯৯৩ সনে তাকে (বেনজীর) হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে রামজে ইউসুফের জড়িত থাকার অভিযোগ এনে 'এক্সট্রাডিশন' চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। বেনজীরের এসব কার্যকলাপের জন্যে পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে কট্টরপন্থীরা তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল।[১২]

রামজে ইউসুফ ঐ সময়ে ছিল আমেরিকার লিস্টে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী। যেদিন তার বিচারের জন্যে হাকিমের সামনে আনা হয় সেদিন ইউসুফ বলেছিল 'আমি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি যদি তা হয় আমেরিকা আর ইসরাইলের বিরুদ্ধে..... তোমরা সন্ত্রাসবাদীদের চেয়েও একধাপ উপরে। তোমরা (আমেরিকা) কসাই, মিথ্যুক আর মোনাফেক এই প্যালেসটানিয়ান সন্ত্রাসবাদী সেদিন আরও বলেছিল ইসরায়েল কর্তৃক প্যালেসটিনিয়ানদের হত্যার কথা।

হাকিম ডাফি, তার বিচার শেষে রায় দেবার মুহূর্তে বলেছিল ১৮০ বছরের কারাদন্ড দেয়া হল 'এই মনে করে যে এ দন্ড যারা সমাজে প্লেগ ছাড়ায় তাদের জন্যে'। এছাড়াও ৪.৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল এবং আরও ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঐ বোমা হামলায় মৃতদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে দিতে বলা হল। এর পেছনে যুক্তি ছিল যদি হলিউডের কোন বিকৃত মস্তিষ্ক প্রযোজক রামজে ইউসুফের জীবন বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করে ঐ অর্থের বিনিময়ে ছবি বানাতে চায়, যেমনটি বানিয়েছিল ওজেসিম্পসনের বেলায় তাহলে সে অর্থ সরকারের কোষাগারে যাবে।[১৩]

১২। Reuter, Islamabad, March 17, 1995.

১৩। David Kocienewski, New York Times: Sept. 6, 1996.

www.nagorikpathagar.org

শেখ ওমর আব্দুল রহমান আলী আব্দুল রহমান, মিশরের ইসলামিক ব্রাদারহুডের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিল। কায়রো ইউনিভার্সিটি স্কুল অব থিওলজি থেকে মাস্টারস্ ডিগ্রি প্রাপ্ত শেখ ক্রমেই নাসেরের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে বিশেষ করে ১৯৬৭ সনে আরব ইসরায়েল যুদ্ধে আরব বাহিনী তথা মিশরের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর। এযুদ্ধে মিশর সমগ্র সীনাই অঞ্চল ইসরায়েলীদের হাতে হারায়। ঐ সময়েই কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করবার কালে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সাথে যার মধ্যে আফগান মুসলমানও ছিল, পরিচিত হয় এবং ধর্ম বিষয়ক ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে নৈকট্য বাড়ে। পিএইচ ডি শেষ করবার পর সরকারের খাতে তাকে কায়রোর পশ্চিমে ফিদিমিন বলে এক পাড়াগাঁয়ে ইসলামিক মক্তবে নিয়োগ দেয়া হয়। সে সময়ই সমগ্র অঞ্চলে নাসের বিরোধী প্রচারের দায়ে ১৯৭০ সনে আট মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে যখন ছাড়া পায় তখন নাসের জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে । শেখ আব্দুল্লাহ্ তার কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে নাসেরকে ঈমান বিবর্জিত ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করে তার (নাসেরের) আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করবার সরকারী নির্দেশকে উপেক্ষা করতে ফতোয়া দেয়। পরে তাকে পুনরায় জেলে পাঠানো হয়। নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার সাদাতের সময় পিএইচ ডির বাকী অংশ শেষ করে। সাদাত শেখ ওমরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়। এ সময় সাদাত ইসলামপন্থীদের সাহায্যে নিজের জনসমর্থন বাড়াবার জন্যে কাছে টানার চেষ্টা করে। বিধির কি নির্মম পরিহাস। বহু বছর সাদাতের সরকারের চাকুরী করেও ইসলামের কট্টরপন্থীদের তালিকাভুক্ত শেখ ওমরকে লেফটেনেন্ট খালেদ ইস্তাম্বুলির সাথে সাদাতের হত্যার দায়ে ১৯৮২ সনে আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো হয়। এতগুলো বছরে ডায়বেটিকস রোগে চোখের জ্যোতি হারানো অন্ধ ইমামকে প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীর অভাবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বাকী সব অভিযুক্তদেরকেও রেহাই দেয়া হয়। শেখ ওমরের সাথে এমনি আরেকজন আল-জিহাদের সদস্য বর্তমানে ওসামা বিন লাদেনর সহকারী ডা. আইমেন আল-জাওয়াহরি ও, অভিযোগ থেকে রেহাই পায় আর এর কথা আমরা আগেই জেনেছি। শেখ ওমর আদালত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একবার পেশাওয়ারে আফগান মুজাহিদদের সাহয্যের জন্যে গিয়েছিল। পরে তার পক্ষ থেকে তার দুই ছেলেকে আফগান যুদ্ধে পাঠায়। 'মুসলিম ব্রাদারহুড' দিয়ে শুরু

www.nagorikpathagar.org

করলেও পরে আল-জিহাদের ধর্মীয় গুরু হিসেবে পরিচিত শেখ ওমর আব্দুল রহমান মিশরের ইসলামিক কট্টরপন্থী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা বলে আজও পরিচিত। শেখ ওমর বর্তমানে আমেরিকার মিনিছোটা জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাভোগ করছে।

শেখ ওমরের বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করবার পেছনে বিশেষ কারণ হল সম্মানিত পাঠকদের আফগান যুদ্ধে জেহাদের জন্যে CIA যে ধরনের জেহাদীদের একত্রিত করেছিল এবং এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বহু আগে থেকে নিজের দেশে এবং অঞ্চলে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিল তারই সম্পর্কে ধারণা দেবার প্রয়াসে। এসব সংগঠন হয় ঐসব দেশে সরকার বিরোধী তৎপরতার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল অথবা বিভিন্ন সময়ে এসব সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। আর CIA এদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল প্রকৃত জেহাদী। আজ এরাই আমার CIA এর তালিকায় সন্ত্রাসী।

এসব ইসলামিক গ্রুপ সমগ্র আরব বিশ্বে বিভিন্ন সেল (Cell) এ বিভক্ত হয়ে সক্রিয় রয়েছে। অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশেও এসব সেলের যথেষ্ট প্রভাব এবং যোগসূত্র রয়েছে। কোথাও কোথাও ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় আন্দোলনের যোগসূত্রও রয়েছে। যদিও এদের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশে অভিযোগ ছিল তথাপি সে সব দেশের সরকার এদের কেই CIA পরিচালিত জেহাদে সামিল হবার অনুমতি দিয়েছিল। CIA তখন বুঝতে পারে নি যে, আফগান যুদ্ধের পর এসব জেহাদীরা নিজের দেশে ফিরে গেলে এদের পেছনে ঐসব দেশের গোয়েন্দা বাহিনী পুরনো তথ্যের উপর ভিত্তি করে গ্রেফতার করা থেকে শুরু করে হয়রানি করতে থাকলে সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী এবং যুদ্ধের সাথে সুপরিচিত এসব জেহাদীরা একই ধরনের জেহাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পরবে। এদের অনেকেই কসোভো, বসনিয়া, চেচনিয়া এবং কাশ্মীরের মত উওপ্ত স্থান গুলোতে জেহাদের মন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর যারা নিজেদের দেশে বা অঞ্চলে থেকে গিয়েছে তারা ইসলামিক বিশ্বে শুদ্ধিকরণ অভিযানে সম্পৃক্ত হয়ে আরব বিশ্বে আমেরিকার প্রভাবকে শেষ করতে জেহাদে নেমেছে। ইসরায়েল কর্তৃক প্যালেসটিনিয়ানদের নিধন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত জেহাদে সামিল হয়ে আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এসব আফগান যুদ্ধের বীর যোদ্ধারা।

www.nagorikpathagar.org

আফগান জেহাদে যোগদানকারী আরবদের মধ্যে মিশরের জেহাদীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। এর কারণ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ইসলামের পুনঃজাগরণের প্রচেষ্টার সাথে মিশরের উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত গোপন সংস্থাগুলো তৎপর রয়েছে বেশী। তদুপরি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপিঠে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একত্রিত হয় উচ্চ শিক্ষার জন্যে। এখানে পরিচিত হয় নিষ্কলুস ইসলাম প্রবর্তনের তথাকথিত অগ্রগামী ধর্মীয় গুরুদের সাথে। । এমনিভাবে আজকের যত সন্ত্রাসী নেতাদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের বেশীর ভাগই আফগান ছায়াযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাক্তন অথবা নবীন যোদ্ধা।

আজকের আফগানিস্তানের অবস্থার সৃষ্টি বীজ রোপিত হয়েছিল জহির শাহের উৎখাত থেকে। ১৯৭৯ সনে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখল করে হয়ত ঐতিহাসিক ভুল করেছিল বলে সামরিক ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মানবতার বিরুদ্ধে এক বিরাট পাপ করেছিল। এ পাপটি হল তাদের (রাশিয়ার) এ অভিযানের মধ্য দিয়ে আমেরিকাকে 'ক্রুসেড' আর 'জেহাদ' কে একত্রিত করণের সুযোগ করে দেয়া। স্বভাবসিদ্ধ হস্তে আমেরিকা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জেহাদীদের লাগিয়েছিল পরে এ জেহাদীরাই আমেরিকা প্রদত্ত অস্ত্র তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দিল কারণ তাদের মতে 'প্রকৃত জেহাদ আমেরিকার বিরুদ্ধেই হতে হবে। আমেরিকার ইসলাম প্রীতি এখনও শেষ হয় নি। আমেরিকা এবার সত্যিকারের ইসলাম এবং আফগানদের সহযোগিতার জন্যে আরেকবার পশ্চিমা মিত্রদের নিয়ে মাঠে নেমেছে। তবে এবারও কি তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে? এটা ভবিষ্যতে দেখবার বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে ওসামা বিন লাদেন

'এ যুদ্ধে আমাদের হারাবার কিছুই নেই।'

১৯৮৭ সনের মাঝামাঝি ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে। আল-কায়দা পরিচালনার জন্যে নিজের তহবিল ছাড়াও ওসামা বিন লাদেন বহুবার নিজের দেশ সৌদী আরবে অর্থ যোগানের জন্যে যাতায়াত করেছে। যতবারই সে সৌদী আরব গিয়েছে ততবারই ফিরতি পথে অনেক স্বেচ্ছাসেবক জেহাদীদের সাথে নিয়ে এসেছে। এ সময়েই এবং আরও পরে তার নিজস্ব কনসট্রাকশন কোম্পানীর মাধ্যমে মুজহিদদের অগ্রগামী দলগুলোর জন্যে রশদ বহন করবার নিমিত্তে শতশত মাইল প্রয়োজনীয় রাস্তা তৈরী করা থেকে শুরু করে হাতিয়ার আর গোলাবারুদের ভান্ডার স্থাপন এবং পরিচালনার দায়িত্ব একাই নিয়েছিল। ডা. আইমান আল-জাওয়াহারী এসব হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। বিন লাদেনের আল-কায়দার পরিচালনায় অনেকের মধ্যে আরও একজন ছিল যার নাম আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের তালিকায়। তার নাম মোহাম্মদ আমের। আমেরও মিশরের আল-জিহাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা। মোহাম্মদ আমের ১৯৭৯ সনের নভেম্বর মাসে সৌদী বিদ্রোহীদের দ্বারা পবিত্র মক্কা শরিফের মসজিদুল হারাম দখলকারীদের মধ্যে একমাত্র বহিরাগত অভ্যুত্থানকারী ছিল। ঐ বিদ্রোহের সাথে জড়িত বেশীরভাগ ব্যক্তিবর্গের বিচারে শিরচ্ছেদ করা হলেও আমেরকে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করে জেলে পাঠানো হয়। জেলের মেয়াদ শেষ হবার পরপরই সোজাসুজি ওসামা বিন লাদেনের পেশাওয়ারস্থিত আল-কায়দার মাধ্যমে জেহাদে সামিলের জন্যে দলে যোগদান করে। আরও পরে মিশরের গোয়েন্দা সূত্রগুলো এতথ্যের সত্যতা স্বীকার করে।[১]

ওসামা বিন লাদেন আফগান জেহাদকে তার জীবনের একটা বৃহত্তর ব্রত

1. Unholy Wars p -119

www.nagorikpathagar.org

করে নিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ আজ্জমের এম এ কে (MAK) তে যুক্ত হবার সুবাদে তার সাংগঠনিক তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৮৪ সনে পাকিস্তানের পেশাওয়ার শহরে একটি বিশাল অট্টালিকা ক্রয় করে তাতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত জেহাদীদের আফগানিস্তানে বিভিন্ন মুজাহিদ সংগঠনের যোগদেবার পূর্বে অস্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এ অতিথিসালাটির নাম ছিল 'বাইতুল আনসার'। এখানে শুধু অস্থায়ী বাসস্থানই ছিল না বরং এখানে প্রতিটি অ-আফগান জেহাদীদের আফগানিস্তান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞান দেয়া হত।

বিন লাদেনের আল-কায়দার সাথে আফগান জেহাদের অনেকেই আজ সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়াতে বিভিন্ন দেশের জেলে রয়েছে। এদের মধ্যে এমন একজনের নাম হেজাজী। মাত্র ৩২ বছর বয়সী হিজাজী বস্টনে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে টেক্সি চালাতো। সেখান থেকেই FBI এর মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় যার মধ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক প্রস্তুত করা হতে এর ব্যবহার সামিল ছিল। হেজাজীর বাবা মোহাম্মদ প্যালেসটিনিয়ান সূত্রে জর্দানের নাগরিক তার ছেলে রাইড হেজাজী ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভারসিটিতে বিজনেস এডমিসট্রেশনের ছাত্র থাকা অবস্থায় ফিজিয়ান আমেরিকান এক মুসলমানের মাধ্যমে FBI এর হাত হয়ে আফগানিস্তানে জেহাদে যোগদান করেছিল। হেজাজীর সাহসিকতার জন্যে আফগান মুজাহিদদের মধ্যে তার নাম রাখা হয়েছিল 'আবু আহমেদ মর্টারম্যান এবং আবু আহমেদ দি আমেরিকান।' ১৯৯৯ সনে জর্দানের রাজধানী আম্মানের ৪০০ কক্ষ বিশিষ্ট পাঁচতারকা হোটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করবার প্রয়াসের অভিযোগে পলাতক অবস্থায় মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। জর্দান তথা আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা আজও তার খোঁজে রয়েছে।[২]

১৯৮৫ সনের মাঝামাঝি ওসামা বিন লাদেনের সান্নিধ্যে আফগান জেহাদে সামিল হবার জন্যে CIA এর হিসেব অনুযায়ী কেবল মাত্র মধ্যপ্রাচ্যেরই ১৫,০০০ জেহাদী ছিল। এদের মধ্যে ৫,০০০ সৌদী, ৩,০০০ ইয়ামেনী, ২,৮০০ আলজেরিয়ান, ২,০০০ মিশরীয়, ৪০০ তিউনিশিয়া, ৩৫০ ইরাকি, ২০০ লিবিয়ান, বাদবাকী জর্দান সহ অন্যান্য আরব দেশগুলোর সদস্য ছিল। আফগান যুদ্ধের শেষে এদের মধ্যে এক থেকে দেড় হাজারের মতো আলজেরিয়ার

2. Jane's ; International Security : September 28, 2001.

www.nagorikpathagar.org

সরকার বিরোধী ইসলামী কট্টরপন্থী বলে কথিতদের সাথে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে আলজেরিয়ায় চলে আসে। স্মরণ থাকে যে, আলজেরিয়ার ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যেই ১৯৯২ সনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচনে FIS (FIS : ইসলামিক স্যালভেশান ফ্রন্ট) প্রথম পর্যায়ের ভোটে ১৮৯ আসন দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগুচ্ছিল কিন্তু সে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ মনা FLN (FLN : ন্যাশনাল লিবারেশান ফ্রন্ট) সরকার এবং সেনাবাহিনী এ ফলাফল বাতিল করলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৯৯২-৯৮ পর্যন্ত চলমান এ গৃহযুদ্ধে প্রায় ১,০০,০০০ লোকের প্রাণহানী হয়। আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের ফলাফলের অস্বীকার করবার পেছনে সেনাবাহিনী এবং সাদলী বেঞ্চাদীদের সরকারের, ভবিষ্যতে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক উত্থান, বেআইনী ভাবে রোধের কারণই ছিল প্রধান। এর পেছনে আমেরিকার হাত ছিল বলে আপাতদৃষ্টে মনে হয়। আলজেরিয়ার ইসলামপন্থীরা আমেরিকার দু'মুখোনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আলজেরিয়ায় এখনও গৃহযুদ্ধ চলছে আর FIS এর সাথে যোগ দিয়েছে GIA (GIA : আর্মড ইসলামিক গ্রুপ)।[৩]

আল কায়দার প্রায় অর্ধেকের মত আরব স্বেচ্ছাসেবিরা আফগানিস্তানেই রয়ে যায় এবং পরে আরও অনেকে নতুনভাবে আফগানিস্তানে আল-কায়দায় যোগ দেয়। এদের সংখ্যা বেড়ে বর্তমান আরব আফগানদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ উন্নীত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ।

১৯৯১-৯২ সনের মধ্যেই আল-কায়দার শাখা বিভিন্ন মুসলিম দেশে গড়ে উঠতে থাকে আর সে সাথে নতুন রিক্রুটদের আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে পাঠাতে থাকে। গড়ে উঠে সোভিয়েত রাশিয়া পরিত্যক্ত সেনা ছাউনী এবং ওসামা বিন লাদেনের নিজস্ব তৈরী কেন্দ্রেগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ। এসব নব সদস্যদের বেশীর ভাগকেই CIA এবং স্পেশাল ফোর্সের ম্যানুয়েল মোতাবেক নাশকতা মুলককর্ম কান্ডের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হলে এসব জেহাদীরা প্রশিক্ষণে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। এ ধাপটি হল বেশীরভাগ আল-কায়দা জেহাদীদের আত্মঘাতী হবার মানসিকতা অর্জনের প্রশিক্ষণ। আর এ কারণেই এসব জেহাদীরা খোদ CIA এবং আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। কারণ আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

৩। Unholy Wars : P. 193.

www.nagorikpathagar.org

আফগান ফেরত যোদ্ধারা মিশরে ফিরে আল-জিহাদ এবং আল জামিরার মত সংগঠনগুলোতে যোগ দেয়। এর মধ্যে প্রায় ২০০ আরব আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স দ্বারা ট্রেনিং প্রাপ্ত আফগান জেহাদ ফেরত সদস্যরা নিউইয়র্কের নিউজার্সি এরিয়াতে ফিরে আসে। ক্রমেই আল-কায়দা আর তালেবান একইসূত্রে সমগ্র মধ্যএশিয়ায় জেহাদের প্রতীকী রূপে গড়ে উঠে। এদের যোদ্ধারা আজারবাইজান থেকে শুরু করে চেচনিয়া, নগরনো-কারাবাগ, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, দাগিস্তান এবং উইগুড় সহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আফগান মুজাহিদরাও কোননা কোন পর্যায়ে কাশ্মীরে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়লে পাক-ভারত সম্পর্ক অবনতির নিম্নধাপে পৌঁছে।

এ পুস্তকে বহু জায়গায় উল্লেখিত ডা. আইমেন আল- জাওয়াহেরীর আফগান জেহাদের অংশগ্রহণ এবং এ জেহাদে কার্য পরিচালানার এক নিবেদিত প্রাণ হিসেবে প্রমাণিত। জাওয়াহেরী জেহাদ শেষে ১৯৯০ সনে আফগানিস্তান থেকে মিশরে গেলে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হবার আশংকায় আবার আফগানিস্তানে ফিরে আসে। জাওয়াহেরীর সাথে আরও কয়েকজন আফগান জেহাদী আল-কায়দায় যোগদেয়। তাদের নামও এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের তালিকায়। এরা হল মিশরীয় বংশদ্ভুত মোস্তফা হামজা (৪৩), রিফি আহমেদ তাহা (৪৭), এবং মোহাম্মদ ইস্তাম্বুলি (৪৬)। মোহাম্মদ ইস্তাম্বুলি সাদাতের হত্যার দায়ে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত লেফটেনেন্ট খালেদ ইস্তাম্বুলির ভাই। সে নিজেও ঐ একই কারণে তিন বছরের কারাভোগ করেছিল। খালেদ ইস্তাম্বুলিও জাওয়াহারীর সাথে আল-জিহাদের সদস্য। আল জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মিশরের বর্তমান ধারার সরকারকে উৎখাত করে ইসলামিক পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এদের তৎপরতা সমস্ত মিশরে ছড়িয়ে রয়েছে। আর বেশীর ভাগ মিশরীয় আফগান জেহাদী এ আল-জিহাদের সদস্য আবার অন্যদিকে আল-কায়দার সাথেও যুক্ত।

মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত আফগানিস্তানের জেহাদের ব্যাপারে অতি উৎসাহিত হয়ে CIA কে একপ্রকার Blank Cheque দিয়েছিল। সাদাত সর্বপ্রথম ডিসেম্বর ১৯৭৯ সনেই আমেরিকাকে মিশরে আফগানিস্তানের জন্যে সামরিক সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেছিল। এতে সাদাতের রাশিয়ার প্রতি ব্যক্তিগত ঘৃণারও কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। প্রথমেই আমেরিকা কায়রোর অদূরে 'কিনা' এয়ার বেস থেকে 'এওয়াকস' দিয়ে আফগানিস্তানে এবং ইরান

www.nagorikpathagar.org

সহ এতদঅঞ্চলের উপরে নজর রেখে চলেছিল। কাজেই সাদাতের সম্মতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ১৯৮০ সনের মাঝামাঝি এক স্কোরডন এফ-১৪ ফ্যানটম ফাইটার সহ ৩০০ মার্কিন সৈন্য, মিশরীয় সৈন্য ও বিমান বাহিনীর সাথে যৌথ মহড়ার নামে মিশরে মোতায়েন করে। এ মহড়ার পরে পরেই আমেরিকার নৌবাহিনীর এস ই এ এল এস (সীলস : SEALS-Sea-Air-Land Commandos) এবং স্পেশাল ফোর্সের প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয় আফগান জেহাদীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে। এসব প্রশিক্ষণের আওতায় ছিল গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে অপহরণ এবং গোপন হত্যার মত অপ্রচলিত যুদ্ধের সাথে পরিচিতি এবং এসব কাজে পারদর্শী করানো। প্রতিটি জেহাদীকে বিস্তারিতভাবে স্থানীয় উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক উপায়ে বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার শিখানো হয়। পরে এসব প্রশিক্ষণের জন্যে, বই পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জমা করা হয়। এই সব ম্যানুয়ালই পরে মিশরীয় প্রশিক্ষকদের হাত হয়ে এসব জেহাদীদের হাতে চলে আসে। চলে আসে আল-কায়দা আর আল-জিহাদের মত সংগঠনগুলোর কাছে।

ওসামা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আল-কায়দা গঠনের পূর্বে হামাসের আব্দুল্লাহ্ আজ্জমের (নিউইয়র্কের আল কিফা খ্যাত) সাথে মিলে ১৯৮৫ এর দিকে মক্তব আল-খিদমাত (এমএ কে) নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত অনুদানের সদ্ব্যবহার আর হিসেব রাখা। এছাড়াও এম এ কে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশ থেকে শুরু করে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ট দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবক জেহাদীদের ভর্তি কেন্দ্র খোলে। সে সাথে ওসামা বিন লাদেনের নিজস্ব তহবিল দিয়ে CIA -ISI এর আওতার বাইরে পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরেও বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছিল। ১৯৮৭ সনে আব্দুল্লাহ আজ্জমের মৃত্যুর পরে বিন লাদেন আজ্জমের এম এ কে (MAK) থেকে নিজেকে আলাদা করে আল-কায়দা গঠন করে। এ আল-কায়দাও পরে এম এ কে (MAK) এর সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করে আফগান যুদ্ধের শেষ এবং কাবুলে নজিবুল্লাহ সরকারের পতন পর্যন্ত বিভিন্ন মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে এবং যুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল।[৪]

৪। NIDAUL ISLAM - October 1996.

www.nagorikpathagar.org

বিন লাদেন ১৯৯১ সনের শুরুতেই আফগানিস্তান ত্যাগ করে সৌদী আরবে চলে আসে তবে তখনও আফগানিস্তানে বেশ কিছু আরব জেহাদী রয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদীন গ্রুপ; পেশাওয়ার-সেভেন এর সাথে সমান সম্পর্ক রেখে চলেছিল। তাছাড়া সমগ্র আফগান জেহাদে ওসামা বিন লাদেন আফগান জেহাদীদের মাঝে একজন সৎ ও ধর্মভীরু ব্যক্তি বলে অধিকতর পরিচিতি লাভ করে। তবে সে নিজে সুন্নী-ওয়াহাবী বিধায় আফগান শিয়া তথা ইরানে বা ইরান সমর্থিত গ্রুপের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। আফগান যুদ্ধ থেকে ফেরৎ এসে আল-কায়দা জেহাদ কমিটি তৈরী করে প্রথমে আফগান ফেরৎ জেহাদীদের এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরী করে। এ কমিটির সকল গ্রুপের সদস্যের সমন্বয়ে লন্ডনে 'ইসলামিক ইনফরমেশন অবজারভেটরী সেন্টার' নামক সংগঠন পরিচালনা করে আসছিল। এ কমিটিতে রয়েছে মিশরের আল-জিহাদ এবং অন্যরা; ইয়ামেনের জিহাদ অরগানাইজেশন, পাকিস্তানের আল-হাদিস গ্রুপ, লেবাননের পার্টিশানস লীগ, লিবিয়ার ইসলামিক গ্রুপ জর্দানের বাইত আল-ইমাম গ্রুপ এবং আলজেরিয়ার ইসলামিক সংগঠনগুলো।

১৯৯১ সনে বিন লাদেন সৌদী আরবে ফেরৎ আসার পর তার নির্মাণ কোম্পানীর কাজ তদারকে মনোনিবেশ করলেও তার জেহাদী মন অতৃপ্ত থাকে। অপরদিকে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ওসামার মন তেতে উঠে। কারণ ওসামা প্রত্যক্ষ করেছে যে, যুদ্ধের শেষের দিকে প্রতিটি মুজাহিদ নেতা ও কমান্ডারদের CIA প্রদত্ত টাকা পয়সার লেনদেন, অস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক দ্রব্যের চাষের মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে জেহাদের মুখে কালিমা লেপন করেছে। এসব মুজাহিদরা আফগানিস্তান তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নিজেদের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারে নি। তাছাড়া আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে আফগানিস্তানকে পরিত্যাগ করে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাতে ওসামা বুঝতে পারে যে, আমেরিকা নিছক আরব আর প্যালেস্টানিয়ানদের মত লক্ষ লক্ষ আফগানকে ব্যবহার করে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ওসামা আফগানিস্তানকে তার দ্বিতীয় দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

১৯৯০ সনের শেষের দিকে ইরাক, কুয়েত দখল করলে সৌদী সরকার নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করে। অন্যদিকে সাদ্দাম হোসেন সৌদী আরবকে

www.nagorikpathagar.org

আক্রমণের ভয় দেখালে সৌদী সরকার আমেরিকার সাহায্যের এবং কুয়েত পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব মেনে নেয়। সৌদী সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিপরীতে ওসামা বিন লাদেন সৌদী রাজকীয় সরকারকে আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি করতে না দিয়ে তার আল-কায়দা স্বেচ্ছাসেবক এবং সৌদী সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে সৌদী আরবকে রক্ষা করা এবং ইরাকের দখল থেকে কুয়েতকে মুক্ত করতে প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব সৌদী সরকার নাকচ করে দেয়। এর পরেই প্রায় ৭০০০ আমেরিকান সৈন্য সৌদী আরবের দাম্মামে ঘাঁটি করে ইরাকের যুদ্ধে অবতরণ করে। আমেরিকার ঘাঁটি এবং কয়েক হাজার সৈন্য সৌদী আরবে এখনও মোতায়েন রয়েছে। ওসামা বিন লাদেনের মতে সৌদী সরকারের নতজানু নীতি, আমেরিকার উপরে অধিক নির্ভরতা ইত্যাদি কারণে ইসলামের জন্মস্থান ও পবিত্র মসজিদের দেশে বিধর্মী সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানিয়ে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) জন্মভূমি তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে অবমাননা করেছে। ওসামা মনে করে আমেরিকার নারী পুরুষের সংমিশ্রণের সামরিক বাহিনী এবং এর বেস এরিয়ার কার্যকলাপ, প্রপাগাণ্ডা ইত্যাদি সৌদী আরবের ইসলামিক সমাজকে কলুষিত করবে। এ সৈনিকদের আচার আচরণ সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বিপরীত এবং ইসলামী সমাজের জন্যে অবমাননাকর। ইরাক থেকে কুয়েত মুক্ত করবার পরও বিভিন্ন অজুহাতে আমেরিকান বাহিনী সৌদী আরবে থেকে যায়। আমেরিকার সেনা ও বিমান বাহিনী সৌদী আরবের মাটি থেকেই আরেকটি মুসলিম দেশে আক্রমণ চালিয়ে, হাজার হাজার নিরীহ ইরাকি আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হত্যা করেছে এবং এ হত্যার জন্যে ওসামার মতে, সৌদী সরকার সমান ভাবে দায়ী। তার মতে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অনুপযুক্ত, ইসলাম বিরোধী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকদের পরিবর্তন করে প্রকৃত ইসলামিক শাসন কায়েম করার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে। আর এজন্যই তার জান এবং মাল দুটোই উৎসর্গিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমেরিকার দ্বি-মুখী নীতি, বিশেষ করে ইসরায়েল তোষণ, হাজার হাজার প্যালেসটিনিয়ানদের হত্যাযজ্ঞে ইসরায়েলকে মদদ যোগান, ইরাকে অনভিপ্রেত হামলা ইত্যাদির জন্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা জায়েজ বলে আল-কায়দা, আল জিহাদের মূলমন্ত্র হিসেবে ধরে সেখানে এর প্রচার করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৯৯১ সনে যখন আমেরিকার ৪১ তম রাষ্ট্রপতি জর্জবুশ (সিনিয়র) ইরাক আক্রমণ করে তখন লাদেন সুদানে চলে আসে তার ব্যবসা দেখাশোনা করবার জন্যে। সুদানে আসার পর লাদেনের আফগান জেহাদের সহযোগী এবং আল-কায়দার বহু সদস্যও তার সাথে সুদানে যোগ দেয়। সুদানে বিন লাদেনকে স্বাগত জানায় সে দেশের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, সুদানের ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (NIF) এর নেতা হাসান আল-তোরাবী। এই হাসান আল তোরাবী এবং তার এন আই এফ এর সহযোগিতা এবং গোপন সমর্থনে ১৯৮৯ সনে জেনারেল ওমর বশির সুদানের ক্ষমতা দখল করে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের উদ্যোগ অব্যাহত রাখে। স্মরণ করা যেতে পরে যে, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে খ্রীস্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানের সাথে মুসলিমগরিষ্ঠ উত্তর সুদানের মধ্যে ধর্মভিত্তিক গৃহযুদ্ধ চলছিল। আর যুদ্ধের ফলে সুদানের অবকাঠামোর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এগুলোর পুনঃনির্মাণই ওসামাকে সুদানে তার ব্যবসা প্রসারে সাহায্য করে। ১৯৯০ সনের গোড়ার দিকে ওসমার 'আল-হিজরা' কোম্পানী পুনঃনির্মাণের কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। ওসামা, হাসান তোরাবীর সহযোগিতায় শুধু ব্যবসাই প্রসার করে নি; বরং বহ জনহিতকর কাজে যোগদান করে সাধারণ সুদানী মুসলানদের মনে শ্রদ্ধার স্থানে আসীন হয়। সুদানে ওসামার কোম্পানীতে নিয়োগের মাধ্যমে হাজার হাজার আরব তরুণের কর্মসংস্থান করে। এদের মধ্যে স্থানীয় সুদানী আরব ছাড়াও প্রাক্তন আফগান জেহাদীরাও যোগ দেয়। এর মধ্যেই ওসামা সুদানেও তার আল-কায়দার একটি শাখা স্থাপনে সক্ষম হয়। সূত্রমতে এখানে ওসামা তার আল-কায়দা জেহাদীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে খার্তুমের অদূরে আল থেমার আল-মোরাকাহ্ নামক এগ্রো কোম্পানীর চৌহদ্দীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। সূত্রে আরও বলা হয়, এসবের সাথেও হাসান তোরাবী এবং এন আই এফ জড়িত ছিল।[৬] অবশ্য এসব তথ্য হাসান তোরাবী পরে অস্বীকার করে।

ওসামা সুদানে থাকলেও সৌদী আরবে ওসামার সমর্থকরা অন্যান্য সৌদী ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে মিলে সৌদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতি নিয়ে প্রচারণা অব্যাহত রাখে। এসব প্রচারণা বিশেষভাবে করা হয় হজ্বের সময়। ১৯৯৩ সনে মিশরের রাষ্ট্রপতি হুসনে মোবারক রিয়াদ

৬। Un holy Wars : P-120

www.nagorikpathagar.org

সফরকালে সৌদী বাদশাহের কাছে সরাসরি ওসামা বিন লাদেনকে মিশরের সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলমান উগ্রপন্থীদের সহযোগিতা করার অভিযোগ আনে। হুসনে মোবারক মিশরীয় গোয়েন্দা বাহিনীর একটি রিপোর্টের উল্লেখও করে যেখানে ওসামা বিন লাদেনকে সরাসরি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ চারণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মোবারকের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

মিশরের মুসলিম সংগঠনগুলো মোবারক সরকারের উৎখাতে প্রকাশ্যে হুমকি দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। এ সংস্থাগুলো মিশরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এমনকি পর্যটকদের উপরে হামলা করতে থাকলে মিশরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে সন্দেহভাজন ৮০০ জনের মত ইসলামী ভিন্নমতাবলম্বীদের ওসামার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতার এড়াতে নকল নথিপত্র ও পাসপোর্টের সাহায্যে সুদান এবং আফগানিস্তানে পাড়ি জমায়।

১৯৯৪ সনে আমেরিকার একটি গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায় যে, ওসামা বিন লাদেন কর্তৃক হাসান আল তোরাবীর সহযোগিতায় অন্তত তিনটি গেরিলা সংগঠনকে আর্থিক সাহায্য প্রদান আর প্যালেস্টাইন যোদ্ধাদের জন্যে সুদানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্য ওসামা বিন লাদেন উত্তর ইয়েমেনে তার অনুসারী পাঠাতে থাকলে যেখানে প্রাক্তন আফগান জেহাদীরা ইসলামপন্থীদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে সৌদী আরব আর দক্ষিণ ইয়েমেনের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতার খবরাখবর CIA প্রতিনিয়তই সৌদী সরকারকে দিয়ে সাবধান করতে থাকলে সৌদী সরকার ক্রমেই ওসামার বিরুদ্ধাচারণ করে। বিন লাদেনের বিশ্বব্যাপী তৎপরতা আমেরিকা সরকার প্রতিনিয়ত সৌদী সরকারকে দিয়ে আসছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ঐ একই বছরে সৌদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ্, সরকারী ভাবে ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে মিশর অথবা সুদানের গোপন ইসলামী সংস্থার কোন সদস্যকেই সৌদী আরবে কোন ভাবেই জায়গা দেয়া হবেনা।

অবশেষে এপ্রিল ৭, ১৯৯৪ সনে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মিশরের রাষ্ট্রপতি হুসনে মোবারকের রিপোর্ট সে সাথে দক্ষিণ ইয়েমেন কর্তৃক ১৯৯২ সনে এডেনে আমেরিকান সৈনিকদের উপর কথিত বোমা হালার হোতা সন্দেহে ইন্টারপোলের নিকট অভিযোগের প্রেক্ষিতও ওসামার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা

www.nagorikpathagar.org

জারি ইত্যাদি কারণে সৌদী রাজতন্ত্র জনগণের সামনে এসে ওসামার সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্তির কথা বলে। বাদশাহ ফাহাদ ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনের সৌদী নাগরিকত্ব নাকচ করার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়ে তার সৌদী পাসপোর্ট বাতিল বলে সরকারী প্রজ্ঞাপন জারি করে। উল্লেখ্য, বিষয়টি সৌদী সরকারের জন্যে এতই স্পর্শকাতর ছিল যার জন্যে বাদশাহকে ব্যক্তিগত ভাবে TV তে এ ঘোষণা দিতে হয়। সেদিন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম ধনী, আফগান যুদ্ধের প্রখ্যাত আরব লিজেনের নেতা, এককালের CIA এর মানসপুত্র, ওসামা বিন লাদেন দেশ হারা এক আর্ন্তজাতিক ভবঘুরে মানবে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। শুধু এখানেই শেষ হয় নি, ক্রমেই ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকার জন্য এক বিভীষিকায় রূপান্তরিত হয়।

এরপর থেকেই আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে সুদান থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে সুদানের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ঐ সময়েই আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান শুরু হয়। ১৯৯৪-৯৬ এর মধ্যে ওসামা বিন লাদেন কয়েকবার আফগানিস্তান সফর করে বলেও জানাযায়। অবশেষে আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের চাপের মুখে রাষ্ট্রহারা এক মানব সন্তান, পশ্চিমা বিশ্বের জন্যে একনম্বরের আতঙ্ক বলে চিহ্নত ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ সনে আফগানিস্তানের কান্দাহারে তালেবান তাত্ত্বিক গুরু মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের হাতে নিজেকে এবং তার আল-কায়দার কান্দাহারের শাখার সমস্ত সদস্যকে সঁপে দেয়।

আগস্ট ৭, ১৯৯৮ সনে পূর্ব আফ্রিকা যুগপৎ দুটি মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এর একটি নাইরোবী কেনিয়ার আমেরিকান দূতাবাসের পেছনে একটি গাড়ী বোমা হামলায় ১২ জন আমেরিকান নাগরিক সহ ২৯১ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৫০০০ জন আহত হয়। ঠিক তার এক ঘন্টার মধ্যেই তানজানিয়ার রাজধানী দার -এস-সালামে অনুরূপ বোমা হামলায় অনেক আহত হলে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ সন্ত্রাসী হামলার দায় দায়িত্ব একটি অপরিচিত ইসলামী গোপন সংস্থা স্বীয় স্কন্ধে নিলেও আমেরিকা ঘটনাস্থল থেকে ৩,০০০ মাইল পূর্বে বসবাসরত ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল- কায়দাকেই দায়ী করে। আমেরিকান দূতাবাসে বোমা আক্রমণের ফলশ্রুতিতে সে দেশের নাগরিকের মৃত্যুসহ সম্পত্তির ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ওসামা বিন লাদেন,

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ আতেফ এবং আইমান আল জাওয়াহিরি সহ ১১ জনকে দায়ী করে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে যে চারজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় তারা হল ওয়াদি আল হাজে, মোহাম্মদ রাসেদ, দাউদ আল ওহালি, মামদু মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ সাদিক ওদিহ। অভিযুক্তের আরেকজন খালিদ আল ফওয়াজ বৃটেনে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় এক্সট্রাডাইটের অপেক্ষায় রয়েছে।

আগস্ট ২০, ১৯৯৮ সনে আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন 'অপারেশন ইনফিনিট রিচ' এর আওতায় ক্রুজ মিসাইল দ্বারা খার্তুম, সুদানে বিন লাদেনের কথিত আস্তানা বলে সনাক্ত এক ঔষধের কারখানায় আঘাত হানে। এ মিসাইল আক্রমণ এবং এর ফলাফল টেলিভিশনে প্রচার করলে ক্লিনটন প্রশাসন বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। ঐ একই সময়ে আরব সাগর থেকে আরও বিশটি ক্রুজ মিসাইল কান্দাহারের খোস্ত এলাকায় ওসামা বিন লাদেনের আস্তানায় হামলা চালালে ওসামার কয়েকজন দেহরক্ষী সহ আল কায়দার প্রায় ২০ জন সদস্য নিহত হলেও ওসামা বিন লাদেন সে যাত্রায় রক্ষা পায়।

এ হামালার পর পরই জানা যায় যে, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সনে ওসামা বিন লাদেন বিভিন্ন দেশের ইসলামী গোপন সংস্থার উচ্চস্তরের চারজন নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে 'ইসলামিক স্ট্রাগল ফ্রন্ট' নামক একটি শক্তিশালী সংস্থা স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেয়। যার অন্যতম কাজ হবে ইহুদিদের উপর হামলা অব্যাহত রাখা এবং আমেরিকান সিভিল অথবা সামরিক সদস্যদের হত্যা করা। এসব কর্মকাণ্ড ইসলামের অনুকূলে যাবে বলে এক ফতোয়া প্রচারে করা হয়। এ সংস্থা স্থাপনের জন্যে যারা সম্মতি প্রদান করে তাদের মধ্যে হল মিশর ভিত্তিক আল-জিহাদের নেতা আইমেন আল জাওয়াহিরি; আবু সালেম মোহাম্মদ, পাকিস্তানের আনসার মুভমেন্টের আমীর এবং মিশরের আবু ইয়ামের আহ্মেদ তাহা এবং এদের সাথে আরও অনেকে এ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল।[৭] 'এ মিটিংয়ে সাব্যস্ত এ ফতোয়ার ব্যাপারটি ওয়াশিংটন এবং মিডিয়ার গোচরীভূত হয়। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাবদ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে কারণ এর মধ্যদিয়ে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে জেহাদের ঘোষণা দিয়েছিল কাজেই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিতে পারে নি CIA, FBI এবং

৭। Un holy Wars : P-224

www.nagorikpathagar.org

পেন্টাগনের কর্তাব্যক্তিরা। বিল ক্লিনটন বিন লাদেনের পূর্বতন কার্যকলাপ জেহাদের ফতোয়া ইত্যাদির নিরিখে গ্রেফতারীর পরওয়ানা জারি করে।

এখানে ওসামার সাথে যুবরাজ তুরকি বিন ফয়সালের ঘনিষ্টতার কথা সংক্ষেপে বললে অপ্রাসাঙ্গিক হবে বলে মনে হয়না। ওসামার বয়স যখন বিশের কোঠায়, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ তখন থেকে যুবরাজ তুরকির সাথে ওসামার সখ্যতা। ওসামা যুবরাজ তুরকির মধ্যে প্রচুর আদর্শগত মিল খুঁজে পেয়েছিল। ওসামার মত তুরকিও ইসলামীক বিশ্বের সামাজিক অবক্ষয়, নেতৃবৃন্দের নৈতিক স্খলন এবং ইসামীক বিশ্বের ঐতিহ্য আর অতীত গৌরবের বিলুপ্তি, এসব বিষয় নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করত। যুবরাজ তুরকি ইসলামীক বিশ্বের অতীত গৌরবময় ইতিহাসকে পুঃনপ্রতিষ্ঠা কবরার স্বপ্ন দেখত। ওসামার কাছে যুবরাজ তুরকিকে, সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য এবং রাজ পরিবারের মধ্যে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব মনে হতো তাই শ্রদ্ধাও করত প্রচুর। যুবরাজ তুরকিই ওসামাকে আফগান জেহাদে যোগ দিতে শুধু উৎসাহিতই করে নি; বরং ওসামাকে জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে আরব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়তে সাহায্য এবং পরামর্শও দিয়েছিল। তুরকি তখন সৌদী আরবের রাজকীয় গুপ্ত সংস্থার প্রধান।

ওসামার সৌদী রাজ বংশের সাথে অত্যন্ত সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠতার জন্যেই CIA এবং ISI এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রচুর সমিহ করত বলে প্রকাশ। ওসামা সমগ্র আফগান যুদ্ধে একাধারে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও অতি সাহসিকতার সাথে সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নেয়। জালালাবাদের এক যুদ্ধে পায়ে গুলীর আঘাত লাগলে অনেকদিন হাঁটতে কষ্ট হয়েছে। আজও তাকে লাঠি হাতে দেখা যায়।[৮] সমগ্র আফগান যুদ্ধের সময় ওসামা যে দুজন দুপ্রান্তের কমাণ্ডারদের সন্নিকটে আসে তারা হল পশতুন নেতা গুলবদিন হেকমতইয়ার আর তাজিক নেতা আহ্মেদ শাহ্ মাসুদ। ওসামার জেহাদের ডাকে সঙ্গত কারণে বসতঃ সৌদীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। সৌদী যুবরাজ তুরকি স্বউদ্যোগে কান্দাহারে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের সাথে দেখা করতে চলে আসে। সৌদী যুবরাজ আর ওসামার সাথে খোস্ত এর যে কোন জায়গায় সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্যে অনুরোধ জানালে ওমর এ সাক্ষাৎকারে ওসামাকে রাজী করায়। এ বিরল সাক্ষাৎকারে যুবরাজ তুরকি তার পুরাতন বন্ধু ওসামাকে জানায় যে, তার

৮। Un holy Wars : P-222

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের কারও উপরেই কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি বরং তাদের নিরাপত্তার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। একই সাথে যুবরাজ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভুল; বুঝাবুঝির অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব রাখে। সেদিন ওসামা তার অনেকদিনের পুরাতন বন্ধু যুবরাজ তুরকিকে খুশী করবার মত কোন কথাই দিতে পারে নি।

সেদিন যুবরাজ তুরকি খালী হাতে রিয়াদে ফিরে এসেছিল। এ বৈঠকের কোন সুফল পাওয়া না গেলেও মোল্লা ওমর যুবরাজকে কথা দিয়েছিল যে, সে নিজে ওসামাকে শান্ত করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু মোল্লা ওমরও ওসামাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। পারে নি তাকে শান্ত করতে। বিপরীতে ওসামা তার উপস্থিতিতে তালেবানদের সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে মনে করে আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। 'কোন ক্রমেই নয়' আবেগে আপ্লুত মোল্লা ওমর উত্তর দেয়। মোল্লা ওমর সেদিন তার আরব অতিথি আফগানিস্তানের প্রায় বিশ বছরের হিতাকাঙ্খী ওসামা বিন লাদেনকে বলেছিল, 'আপনি আমাদেরই একজন। তাই আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন।' সেই থেকে লাদেনের আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়া হলনা। মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সাথে ওসামা বিন লাদেনের প্রথম সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঘটে পাকিস্তানের করাচী শহরের বিনুরী মসজিদে ১৯৮৫/৮৬ এর দিকে। ঐ মসজিদে সেদিন ইমামতি করছিল একজন অখ্যাত তরুণ ইমাম। ১৯৯৮ সনের মধ্যে ঐঅখ্যাত ইমাম আফগানিস্তানে তালেবানদের ধর্মগুরুতে আর তারও তিন বছর পর, ২০০১ সনে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত হয়ে পড়ে।

বিন লাদেন যখন সুদান থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৯৯৬ সনে আফগানিস্তানে পৌঁছে তখন আফগান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তার দুই পুরাতন পরিচিত ঘনিষ্ট বন্ধু হেকমতইয়ার আর আহমেদ শাহ্ মাসুদ কাবুল থেকে বিতাড়িত। আহমেদ শাহ্ মাসুদ উত্তর জোটে কাবুলে তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আর হেকমতইয়ার তখন ইউরোপে। কাবুলে তখন তালেবান সরকার। বিন লাদেন কান্দাহারে চলে আসে এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের পূর্ব পরিচিতির সুবাদে অতি সহজে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, ওসামা বিন লাদেনের জেহাদী মনোভাব আর সাহসিকতার সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিল। ঐ সময় থেকেই ওসামা মোল্লার অত্যন্ত নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে একজন হয়ে

www.nagorikpathagar.org

উঠে। ওসামা এবং মোল্লা উভয়ে উভয়ের মেয়েদের বিয়ে করেছে বলে যে সংবাদ পশ্চিমা বিশ্বে পাওয়া গিয়েছিল তার সত্যতা নিরপেক্ষ ভাবে প্রমাণিত হয় নি। এমনকি এ বিষয়টিও ওসামা সরাসরি নাকচ করে দেয়।

এর পর আগস্ট ২০, ১৯৯৮ সনে ওসামার আস্তানায় অতর্কিত ক্রুজ মিসাইল হামলার পর তালেবান সরকার আমেরিকার সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। তালেবানরা পূর্ব অফ্রিকায় সন্ত্রাসী হামলার সাথে ওসামার জড়িত থাকার আমেরিকান অভিযোগকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে আমেরিকার তরফ থেকে তালেবানদের হাতে প্রমাণ না দেয়ায় তাকে নির্দোষ বলে আখ্যায়িত করে।[৯] অতপর ১৯৯৯ সনে জাতিসংঘ তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে খাদ্যদ্রব্য আমদানী ছাড়া সকল প্রকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে এমনকি সমস্ত আন্তর্জাতিক যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েও তালেবানদের ভাঙ্গতে সক্ষম হয় নি।

তালেবানরা ওসামার বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনে নিউইয়র্কে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ শ্বাসরুদ্ধকর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগের প্রমাণ তালেবানদের হাতে না দেয়ায় প্রাণের বিনিময়েও ওসামা বিন লাদেনকে রক্ষা করছে। এ যুদ্ধে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি ও তার মিত্র সমবিহারে আধুনিক ইতিহাসে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্মিলিত মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশের বিরুদ্ধে নেমেছিল। এটি একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের সূচনা লগ্নে এ অসমযুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

নভেম্বর ১১, ২০০১: নর্দান এলায়েন্স প্রায় একমাস আমেরিকার উপর্যুপরি বোমা হামলার পর মাজার-ই-শরিফ দখল করে নিয়ে উজবেক সীমান্ত খুলেছে। কাবুলে পুনরায় ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকায় আমেরিকা নর্দান এলায়েন্সকে কাবুল মুখে অগ্রসর না হয়ে হেরাতের দিকে অগ্রসর হতে বলছে। অন্যদিকে তালেবান সৈন্যরা একমাস আমেরিকার একটানা বোমাবর্ষণের মধ্যেও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মাজার-ই-শরিফ হতে পশ্চাদাপসারণ করেছে বলে জানায়। প্রয়োজনে গেরিলা যুদ্ধের হুমকিও দেয়। অপর প্রান্তে ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রতিনিয়তই নানা ধরনের বিবৃতি পাওয়া গেলেও তার শেষ কথা হচ্ছে, 'আমাকে জীবিত ধরতে পারবেনা।' তার মতে তার মৃত্যু হলেও তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে বলে জানায়।

নভেম্বর ১২, ২০০১: নর্দান এলায়েন্স কাবুলের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে কাবুলে

৯। Ibid : P-225

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশের অপেক্ষায়। আমেরিকা নর্দান এলায়েন্সকে কাবুলে দখলে যেতে নিরুৎসাহিত করছে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণেই এরূপ ব্যবস্থার কথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোশারফও ব্যক্ত করেছে। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে হয় যে, নর্দান এলায়েন্স কাবুলকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবেই তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে পদ্ধতিতেই হোকনা কেন। আমরা বিগত যুদ্ধেও দেখেছি সরকার গঠন বা কাবুলে প্রবেশের পূর্বেই সামরিক মিলিশিয়া নেতৃবৃন্দ কাবুল দখলের প্রচেষ্টায় আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যদিও এবার ততগুলো দল বিবাদে নেই তবুও এলায়েন্স আফগানিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে তদুপরি রয়েছে আব্দুর রশিদ দোস্তামের উজবেক বাহিনী। পালা বদলে পাটিয়শি দোস্তাম মাসুদের অবর্তমানে চাইবে বড় ধরনের ছাড়।

আমেরিকা সরাসরি কাবুলে তথা আফগানিস্তানে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় না জড়ালেও তাদের পরামর্শ দাতার উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার জন্যে সমস্যা হল এক্ষণি একজন পশতুন নেতার অনুসন্ধান যার খুব বেশী না হলে ও যথেষ্ট প্রভাব থাকবে দেশের বৃহত্তর গোষ্ঠী পশতুনদের উপর।

তালেবানরা সামরিক কূটকৌশলের খেলায় আপাতত শহরগুলো থেকে সরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করছে আমেরিকার বিমান হামলা থেকে যোদ্ধাদের অক্ষত রাখার জন্যে। শহর থেকে সরে মধ্য আফগানিস্তানে হিন্দুকুশ পাহাড়ে পুনঃজমায়েত হবে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে কিন্তু সামনেই আসছে আফগান শীতের মৌসুম। হয়ত এর মধ্যেই তালেবানদের অনেক সদস্যই দলত্যাগী হবে। এরূপ অবস্থায় তালেবান আর আরব যোদ্ধাদের শক্তি কমলেও গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকবে আত্মসমর্পণ। এ দুটোর যে কোন একটাই হোকনা কেন আফগান সমস্যা এত সহজে সমাধান হবার নয় আর কাবুলে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা হবে দুঃস্বপ্ন। আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল যুদ্ধবাজ নেতাদের দখলে থেকে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে কাবুল সরকারকে এসব যুদ্ধবাজ নেতাদের তোষামোদ করেই সরকার পরিচালনা করতে হবে।

আব্দুল হানান এর মত যারা কাবুলে থেকে গেছে তারা অপেক্ষা করছে শীতের শেষে একটি সুন্দর গ্রীষ্মের যখন কাবুল নদী দুকূল ছাপিয়ে বইবে। কাবুলে বাজারগুলো সুগন্ধীতে ভরে যাবে আর মুক্ত বিহঙ্গের মত কাবুলের প্রিয়দর্শীনীরা বাজারে ভিড় জমাবে।

www.nagorikpathagar.org

তালেবানদের আত্মকথা

‘এ সংঘাত বন্ধ হোক। সূচিত হোক নতুন দিগন্তের।’

নভেম্বর, ২০০১ আফগানিস্তান। গত একমাস ধরে আমেরিকা তার বিমান বাহিনীর সর্বাধুনিক জঙ্গী বিমানগুলো দিয়ে আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে তালেবান বাহিনীর ব্যারাক এবং উত্তর জোটের সাথে যুদ্ধের প্রতিরক্ষা ব্যূহে উপর্যুপরি বোমা হামলা অব্যাহত রাখে। এসব জঙ্গী বিমানগুলোর মধ্যে বি-৫২ দিনরাত বোমা বর্ষণ করতে থাকে। এসব বিমান ভিয়েতনাম এবং ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত কার্পেট বমবিং শুরু করলে প্রচুর বেসামরিক জনগোষ্ঠীর হতাহতের সাথে তালেবান যোদ্ধাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানগুলো ‘ডেইজি কাটার’ নামক ১,৫০০০ পাউন্ডের বোমার ব্যবহার শুরু করলে উত্তর আফগানিস্তানের তালেবান প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত যোদ্ধাদের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হয়। হতাহত হতে থাকে প্রচুর যোদ্ধা। একই সাথে উত্তর জোটকে রাশিয়া সামরিক সাহায্য আর আমেরিকা স্পেশাল ফোর্স দিয়ে সহায়তা শুরু করলে তালেবানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। তালেবানরা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধে মোটেও পারদর্শী হয়ে উঠে নি তার উপরে এতগুলো বছর পর পাকিস্তানের সক্রিয় সামরিক পরামর্শদাতা, আই এস আই এর সহায়তা সবই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তালেবানদের সামরিক কূটকৌশলেও ভাটা পড়তে থাকে।

এ এক মাসের মধ্যে আমেরিকা দক্ষিণ আফগানিস্তানে পশতুন এলাকায় তালেবান বিরোধী পুরাতন যুদ্ধবাজ নেতা, বিভিন্ন গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পুরাতন জেহাদী নেতাদের সংগঠিত করতে থাকে। এদের অনুসারীদের মধ্যে অস্ত্র আর প্রচুর অর্থের যোগান দিয়ে এদেরকে তালেবানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় করে

www.nagorikpathagar.org

তোলে। সি আই এ দক্ষিণ আফগানিস্তানে ১৯৯৭ সন থেকেই তালেবান বিরোধী তৎপরতায় সক্রিয় ছিল। আই এস আই , সি আই এ'র স্বপক্ষে পুনরায় সাহায্য সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল মোশারফ আই এস আই এর শীর্ষে বদল করার পর থেকেই আফগানিস্তানের সাথে জড়িত বেশীর ভাগ কর্মকর্তাদের অপসারণের মধ্য দিয়ে এ সংস্থাকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। আর এ সুবাদেই মোশারফ তালেবানদের উৎখাতে সোচ্চার হয়ে উঠে। সে সাথে মোশারফ পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও কট্টরপন্থীদের সংযত করতে সক্ষম হয়।

সমস্ত অক্টোবর মাসের বোমা বর্ষণের মধ্য দিয়ে নর্দান এলায়েন্স বা উত্তর জোট আমেরিকার সামরিক উপদেষ্টার সমন্বয়ে প্রথমে মাজার-ই-শরিফের উপর হামলা শুরু করে। এ হামলায় উজবেক যুদ্ধবাজ নেতা আব্দুর রশিদ দোস্তাম পুনরায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয় প্রায় চার হাজার মিলিশিয়া নিয়ে। প্রায় এক সপ্তাহ যুদ্ধের পর তালেবানদের মাজার-ই-শরিফের প্রতিরক্ষা ছেড়ে দিতে হয়। নভেম্বর ৯, ২০০১ সনে দোস্তাম তার বাহিনী নিয়ে মাজার-ই-শরিফ দখল করে। ততক্ষণে তালেবানদের বেশীর ভাগ যোদ্ধা পশ্চাদাপসারণ করে মাজার-ই-শরিফ আর কাবুলের মাঝের যোগাযোগ স্থলের গুরুত্বপূর্ণ ছোট শহর কুন্দুজের প্রতিরক্ষায় যোগ দেয়।

মাজার-ই-শরিফের মত রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং আফগানিস্তানের তথা তুর্কমেনিস্তান সমগ্র মধ্য এশিয়া অঞ্চলের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পূল 'ফ্রেণ্ড শীপ' ব্রিজের অবস্থান। এশহর দখলের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক কারণ উত্তর জোটের জন্যে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্যের একমাত্র সংক্ষিপ্ত সরবরাহ পথই ছিল এটি। সে সাথে আমেরিকা, ব্রিটেন আর ফ্রান্সের স্পেশাল ফোর্সের সরবরাহের পথ খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই মাজার-ই-শরিফের পতন, তালেবান সৈন্যদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে অতিদ্রুত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং যোগাযোগ কেন্দ্রগুলো থেকে পশ্চাদাপসারণ শুরু করলে ক্রমেই তালেবানরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তালেবানদের উত্থানও ছিল যেমন রোমাঞ্চকর পতন হয়েছে তেমনি বিস্ময়করভাবে। তালেবানদের উপর একটি সমীক্ষা আমি পরের দিকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে রাখব।

www.nagorikpathagar.org

উল্লখ্য যে ১৯৯৮ তালেবানরা এশহর দখল করার পর থেকে উত্তর জোট এ বছর গুলোতে উপযুপরি হামলা চালিয়ে ও দখল করতে পারে নি। এ শহর দখলকে কেন্দ্র করে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞ। মাজার-ই-শরিফের পর দোস্তাম বাহিনী নভেম্বর ১১, ২০০১ এর মধ্যেই আফগানিস্তানের তালাখান্দ, বাগলান, সামানগান প্রদেশগুলো সহ পুল-ই- খুমারির মত জায়গাগুলো দখলে নিয়ে নিলে কাবুলের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে থাকে। অন্যদিকে উত্তর জোটের জেনারেল ফাহিমের নেতৃত্বাধীন ট্যাংক বহর নভেম্বর ১১, ২০০১ সনে বামিয়ান গিরিপথসহ প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নিলে কাবুলের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। পরের দিন অর্থাৎ নভেম্বর ১২, ২০০১ এ জেনারেল ফাহিমের কাছে খবর পৌঁছে যে, উপর্যুপরি আমেরিকান বিমান হামলার মুখে তার আগের রাতেই তালেবান সৈন্যরা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ছেড়ে পশ্চাদাপসারণ করেছে। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, সে সমস্ত এলাকা থেকে তালেবানরা পশ্চাদাপসারণ করেছে তাদের মধ্যে আফগান তালেবান সৈনিকদের সংখ্যাই ছিল বেশী। বেশ কিছু কারণে অ-আফগান সৈনিকরা যেমন আরব, পাকিস্তানী আর চেচেন স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকগণ যারা 'জেহাদে' শরিক হতে আফগানিস্তানে এসেছিল তাদের বেশীর ভাগই পেছনে রয়ে যায় আর তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে বর্বরোচিত পরিসমাপ্তি। এর প্রথম কারণ হল যোগাযোগের অপ্রতুলতা, আমেরিকার গুপ্ত সংস্থাগুলোর দক্ষতার সাথে বিভেদ সৃষ্টি এবং প্রচুর অর্থে আদান প্রদান।

তালেবানদের কাবুল ত্যাগের পর রাজধানী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবসিদ্ধভাবে দোস্তামও কাবুলের দিকে অগ্রসর হয় তবে বাগরাম বিমানবন্দর পর্যন্ত আসার পর তাকে পশ্চিমা সামরিক বিশেষজ্ঞরা বাধা দিলে রাজধানী শহরে প্রবেশ না করে তার বাহিনীকে মাজার-ই-শরিফের দিকে সরিয়ে নেয়। মাজার-ই-শরিফে দোস্তাম ছাড়াও তালেবানপূর্ব আরও দুই যুদ্ধবাজ নেতা বর্তমানে ক্ষমতার দাবীদার এদের একজন তাজিক নেতা উস্তাদ আতা মোহাম্মদ এবং ইরান সমর্থিত হাজারা শিয়া নেতা উস্তাদ মোয়াক্কি। এ দুই নেতার সরব উপস্থিতিতে একটি স্কুলের মধ্যে অ-আফগান তালেবান বন্দীদের হত্যা করা হয়। বলা হয় এদের প্রায় দেড়শ' সৈন্য একটি স্কুলের ভেতর থেকে গোলাগুলী অব্যাহত রাখলে অপর পক্ষ আর্টিলারী আর আমেরিকান বিমান থেকে রকেট ক্ষেপণের মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করে। বলাবাহুল্য এসব বন্দীদের কাউকেই

www.nagorikpathagar.org

জীবিত পাওয়া যায় নি বা রাখা হয় নি। এসব অ-আফগান যোদ্ধাদের ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক বলে পাইকারিহারে নিধন করা হয়। এতে মাজার-ই-শরিফের তিন যুদ্ধবাজ নেতাই সম্পৃক্ত ছিল।

মাজার-ই-শরিফ ১৯৯৮ সনে তালেবানরা উত্তর জোটের রশিদ দোস্তামের বাহিনীকে পরাজিত করে যখন প্রথমবারের মত দখল করে তখনও প্রায় অনুরূপভাবে অ-পশতুন আফগান, যাদের মধ্যে উজবেক, তাজিক আর হাজারা যোদ্ধা এবং সমর্থক বেসামরিক ব্যক্তিদের পাইকারিভাবে হত্যা করে। তাই এবারের তালেবান নিধন দোস্তাম এবং তার অনুসারীদের কর্তৃক প্রতিশোধ মূলক হত্যাযজ্ঞ ধরে নেয়া হয়। শুধুমাত্র তফাৎ এই যে, এ নিধনের সাথে আমেরিকার নামও জড়িত হয়ে পড়েছে।

আগস্ট ৮, ১৯৯৮ সনে প্রায় দু'বছরের চেষ্টার পর তালেবান যোদ্ধারা মাজার-ই-শরিফ দখল করে। এ শহর দখল করবার জন্যে বিন্যাস্ত সামরিক পরিকল্পনার সাথে পাকিস্তানের ISI সরাসরি জড়িত ছিল। তালেবানদের সহযোগিতায় আরও ছিল সীমান্ত পাড় হতে আগত পাকিস্তানী পশতুন যোদ্ধারা। এসব পশতুনরা প্রথমবারের মত উত্তরের অ-পশতুন অধ্যুষিত শহরে প্রবেশ করে।

১৯৯৮ সনে মাজার দখলের সাথে সাথেই তালেবান যোদ্ধারা এক উম্মত্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রায় পুনরাবৃত্তি করে চেঙ্গিস খাঁর হেরাত দখলের ঘটনা। বিনা উস্কানীতে তালেবান যোদ্ধারা মাজারের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হত্যা করা শুরু করে। এর কারণ প্রায় একবছর পূর্বে তালেবানদের স্বল্পকালীন বিজয়কে এ শহর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নস্যাৎ করেছিল এবং এ অভ্যুত্থানে প্রচুর তালেবান যোদ্ধাদেরও হত্যা করা হয়।

তালেবান যোদ্ধারা শেষবারের মত মাজার-ই-শরিফ দখলের পর প্রতিশোধের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে হাজারা শিয়াদেব উপরে চড়াও হয়ে নির্বিচারে হাজারা গোত্রের হাজার হাজার মানব সন্তানকে নিধন করে। হাজার হাজার হাজারাদের মাজারের জেলে নিয়ে গেলে সেখানে জায়গার সঙ্কুলান না হলে মালবাহী কন্টেইনারে গাদাগাদি করে রেখে বাইরে কড়া রোদের নীচে রেখে দমবন্ধ করে হত্যা করে।[১] শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় 'সমস্ত

১। Ahmed Rashid : Taleban Islam Oil and the New great sam in Central Asia. P. 93

www.nagorikpathagar.org

শিয়াদের সুন্নী হতে হবে অন্যথায় ইরানে চলে যেতে হবে। আর এদুটোর একটাও যারা না করবে তারা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকবে।' অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ইরানের দিকে পাড়ি জমায়। এক পরিসংখ্যানে বলা হয় প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোককে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।[২] এসব সংবাদ মোল্লা ওমরের কাছে পৌছলে সে গণহারে নিধন না করে নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে হত্যার হুকুম জারি করে। মোল্লা দোস্ত মোহাম্মদকে একদল তালেবান যোদ্ধার সাথে পাকিস্তানের উগ্রবাদী সুন্নী সন্ত্রাসী সংগঠন 'সিপাহী সাহেবা' নামক গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে মাজার-ই-শরিফে প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে তালেবানরা ইরানী কনস্যুলেট দখল করে রাখলে কনস্যুলেটের ভেতরে আটকে পড়া কূটনীতিকদের জীবন বিপন্ন হলে ইরান সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এদের সাথে ইরানের পত্রপত্রিকার সংবাদদাতারাও ছিল। এ যেন ১৯৭৯ সনের তেহরানে ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানের পর আমেরিকান দূতাবাস দখলের মতই। মোল্লা দোস্ত মোহাম্মদের আগমনে ইরানী কনস্যুলেটে বন্দীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হলেও পরে তাদের কপালে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। এসব কূটনতিকদের স্থানান্তর করে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরই মধ্যে প্রায় ৪৫ জন ইরানী ট্রাক ড্রাইভারক হাজারাদের জন্যে অস্ত্র চালানের অভিযোগে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।[৩]

এ হতভাগ্যদের হদিস না পেয়ে ইরান তালেবানদের উপরে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করলে কূটনীতিকসহ কনস্যুলেটে বন্দীকৃত ১১ জনকে হত্যা করবার কথা স্বীকার করলে ট্রাক ড্রাইভারদের পরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ছেড়ে দেয়া হয়। এক তথ্যে প্রকাশ কূটনীতিকদের হত্যার পূর্বে মোল্লা দোস্ত মোহাম্মদ মোল্লা ওমরের সাথে যোগাযোগ করে কূটনীতিকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাদের হত্যা করবার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় চারশত হাজারা মহিলাদের অপহরণ করা হয়।[৪] এক কথায় তালেবানরা মাজার-ই-শরিফে এবং আরও পরে বামিয়ান প্রদেশেও একই ভাবে 'এথনিক ক্লিনসিং' এ মত্ত হয়ে উঠে।

মাজার-ই- শরিফের কূটনীতিকদের হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের সাথে

২। Winchester Mechel : Ethnic cleansing in Afghanistan Asia week, November 6, 1998.
৩। Ahmed Rashid : Opcit : P-74
৪। Ahmed Rashid : ibid P-75

www.nagorikpathagar.org

তালেবানদের যুদ্ধের উপক্রম হয়েছিল। সেই থেকে ইরান তালেবানদের উৎখাতের জন্যে উত্তর জোটকে সাহায্য আরও বাড়ায়।

ফিরে আসি কাবুলের সন্নিকটে। এত তাড়াতাড়ি তালেবানরা কাবুল ছাড়বে এটা কেউই ভাবতেও পারে নি। এমনকি পেন্টাগনের বিশেষজ্ঞদের জন্যেও এটা ছিল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। যেদিন কাবুল উত্তর জোটের হাতে পড়ে সেদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নিউইয়র্কে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশের সাথে দাঁড়িয়ে উভয়ে উত্তর জোটের সৈন্যদের কাবুলে প্রবেশের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানালেও তেমনটা হয় নি। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিজয়ীর বেশে উত্তর জোটের আইন মন্ত্রী ইউনুস কামুনী জেনালেল ফাহিমের সৈন্য সন্নিবিষ্ট হয়ে কাবুলে প্রবেশ করে। ১৯৯৬ সনে কাবুল থেকে তালেবান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্রায় পাঁচবছর পর উত্তর জোটের সৈন্যদের কাবুলে উপস্থিতি কাবুলবাসীদের তালেবান পূর্ব গৃহযুদ্ধের সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করা যেতে পারে, ঐ সময় দোস্তাম মাসুদ-হিকমতইয়ার আর হিজবে ওয়াদাত এর মধ্যে গৃহযুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। মাসুদ এবং দোস্তামের সৈন্যদের হাতে প্রচুর নারীর সম্ভ্রমহানী হয় আর কাবুল শহরের অর্ধেক ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। তাই সে দিন নিউইয়র্কে বুশ এবং মোশারফ উভয়েই একই ধরনের পরিস্থিতির আশংকা করেছিল তবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি। আর এর প্রধান কারণ ছিল যে, উত্তর জোটের বর্তমান নেতৃত্বে রয়েছে অনেক তরুণ নেতৃবৃন্দ যারা তাদের অতীত নিয়ে বিব্রত। আর এর চেয়ে বড় বিষয় ছিল আমেরিকা তথা জাতিসংঘের চাপ ও বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রলোভন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোশারফের উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল আরও একটু ভিন্ন ধরনের আর তা হল কাবুলে সংখ্যালঘিষ্ঠ গোত্রের উপস্থিতি। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বর্তমান উত্তর জোটের প্রধান শরিকদল রাব্বানীর হিজব-ই-ইসলামী আর আহমেদ মাসুদকে খুব বেশী গুরুত্ব না দিয়ে পশতুন নেতা হিকমতইয়ারের পক্ষপাত্বিত করেছিল এবং পরে তালেবানদের সহযোগিতায় রাব্বানীর উৎখাতের ইসলামাবাদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এসব কারণেই স্বভাবত উত্তরজোট পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। তার উপরে রয়েছে উত্তর জোটের সাথে ভারতের নৈকট্য। এসব মিলিয়েই পাকিস্তান প্রথমে 'ভাল তালেবানদের' অন্তর্ভুক্তির কথা বললেও পরে যে কোন পশতুন

www.nagorikpathagar.org

নেতাকে গ্রহণের ব্যাপারে রাজী হয়। আপাতঃ দৃষ্টে মনে হয় সাময়িকভাবে হলেও বুশ মোশারফের সাথে এসব ব্যাপার আলোচনার পরই ভবিষ্যৎ সরকারে পশতুন নেতার মুখ্য ভূমিকার ব্যাপারটি গ্রহণ করে।

কাবুলে এবার ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটলেও তালেবান সমর্থকদের নাজেহাল করা থেকে শুরু করে অ-আফগান তালেবানদের নিধনও কম হয় নি। তবে কেবলমাত্র পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়া উপস্থিত থাকায় এধরনে ঘটনাগুলো এ পর্যন্ত ফলাও করে প্রকাশ হয় নি অবশ্য কেবলমাত্র কিলা জঙ্গীর ঘটনা ছাড়া। স্বভাবতঃই কাবুলের পতনের পর থেকে তালেবানরা ক্রমেই দক্ষিণ পূর্বে জালালাবাদ, রুগজান, কান্দাহার, নানগাহার ইত্যাদি পশতুন অধ্যুষিত প্রদেশের দিকে পিছু হটতে থাকে। উল্লেখ্য, গত একদশকে কাবুল তিনবার হাত বদল হয়েছে।

অপরদিরকে নভেম্বর ২০০১ আমেরিকার বিমান হামলার সাহায্যে পশ্চিমে ইরান সন্নিকট হেরাত শহর ও প্রদেশ তালেবান পূর্ব প্রাদেশিক গভর্নর এবং সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের নেতা ইসমাইল খান পুনঃদখল করে। ইসমাইল খানের আকস্মিক পুনার্বিভাব কিছুটা নাটকীয় এবং অনেকেরই ইসমাইল খাঁন সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিলনা বললেই চলে। এ কারণ ইসমাইল খাঁন সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে ইরান সংলগ্ন হেরাত অঞ্চলে যুদ্ধরত ছিল এবং তার যোগাযোগও ছিল ইরানের সাথে।

হেরাত নগরী কান্দাহারের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে একাধারে ইরান আর তৎকালীন ভারতবর্ষের সাথে যোগাযোগের পথে একটি বর্ধিষ্ণু শহরের মধ্য গণ্য করা হতো। আজও ভারত হতে পাকিস্তানের কোয়েটা হয়ে ইরান এবং মধ্যএশিয়ার সাথে যোগাযোগের এক প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী এ শহর প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হেরাতের আশেপাশে প্রায় দু'শত বর্গমাইল ক্ষেত্র প্রাচীনকাল থেকে কৃষির জন্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং সে সুবাদে মধ্যএশিয়ার অন্যতম ধনী অঞ্চল বলে বিবেচিত হত। শত শত বছর ধরে এ অঞ্চল তুর্কি আর ফারসী শাসকদের মধ্যে হাত বদল হলেও এ শহরের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে। ইসলামের জন্মের পরেপরেই হেরাত অঞ্চলের প্রায় একশত ভাগ জনতা ভাগ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ শহরের প্রধান মসজিদটিও প্রায় সাত শতাব্দীতে নির্মিত যা

www.nagorikpathagar.org

বাবা আহমেদ শাহ্ আবদালীর মাজার।

ইসলামাবাদে ফয়সল মসজিদের সামনে লেখক (বাঁ দিক থেকে প্রথম)।

www.nagorikpathagar.org

তোড়াবোড়া পাহাড়।

মার্কিন বোমা হামলায় ধ্বংসযজ্ঞের খণ্ডিত চিত্র।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের সাথে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক আফগান শরণার্থী শিবিরে -১৯৮২

খোলা আকাশের নীচে আফগান শিশুরা অধ্যয়নরত।

www.nagorikpathagar.org

বাম থেকে ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল জওহারী, আতেফ (মৃত)।

www.nagorikpathagar.org

আজও হেরাতের ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ। এখানে ইসলামের রহস্যময় সুফিবাদের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। আফগানিস্তানের অন্যতম আধ্যাত্মিক সুফি কবি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি হেরাতের বাসিন্দা ছিল। তার মৃত্যু হয় ১০৮৮ সনে কিন্তু আজও সমগ্র আফগানিস্তানে তার অসংখ্য ভক্তরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলে প্রথম যে ধ্বংসযজ্ঞ হয় তা সংঘঠিত হয়েছিল ১২২২ সনে যখন চেঙ্গিস খাঁ হেরাত দখল করে। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে চেঙ্গিস খানের সেনা দল হত্যাযজ্ঞের ২২২২ উম্মাদনায় মাত্র চল্লিশ জন নাগরিককে বাদ দিয়ে একলক্ষ ষাট হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিধন করে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছ। এ হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের দু'শতকের কম সময়ের মধ্যেই হেরাত তার পুরাতন গৌরবে ফিরে আসে। এ শহরে শায়িত আছে বিশ্ববিখ্যাত ফারসী কবি জামী। অতি ভদ্র, বিনয়ী আর উচ্চ সংস্কৃতিতে লালিত হেরাত নগরী বাসিন্দারা আফগানিস্তানের গর্বের বিষয় হয়ে আছে। সাধারণত শিয়া ফারসী ভাষাভাষী হেরাতীরা তাই পশতুনদের থেকে অনেকটা আলাদা সত্বার।

হেরাতের সোভিয়েতের দখল উত্তর গভর্ণর ইসমাইল খান অধিক পরিচিত না হলেও আফগান মুজাহিদদের তেহরান-৮ এর অন্যতম সফল নেতা হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ইসমাইল খান নিজেও একজন তাজিক বংশদ্ভূত জামাত-ই-ইসলামী ভক্ত তাই স্বভাবতঃই রাব্বানী আর মাসুদের সাথেই তার নৈকট্য ছিল বেশী। তবে সমগ্র আফগান যুদ্ধে ইসমাইল খান অন্যদের তুলনায় সি আই এ আর আই এস আই এর যৎসামান্য আনুকুল্য লাভ করে।

এ প্রাক্তন আফগান সেনাবাহিনীর ছোটখাট ফারসী ভাষাভাষী কর্মকর্তা ১৯৭৯ সনের মার্চ মাসে হেরাতে সোভিয়েত সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে হেরাত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের দল এবং সোসালিস্ট সরকারের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। প্রায় একশতের কাছাকাছি সোভিয়েত সামরিক বিশেষজ্ঞদের হত্যার মাধ্যমে সরকারী বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করে ইসমাইল খান সোভিয়েত এবং কাবুল বিরোধী তৎপরতা শুরু করে। জেহাদ শেষে রাব্বানী সরকারের সময় হেরাত সহ আরও চারটি প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হলে সমগ্র এলাকার অধিবাসীদের নিকট থেকে অস্ত্র জমা নিয়ে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনী দাঁড় করাবার প্রয়াস নেয়। ১৯৯৫ এর দিকে কান্দাহারে তালেবানদের উথানের পরপর হেরাতে

www.nagorikpathagar.org

তালেবান আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে চললে বাধ্যতামূলক সেনা বাহিনীতে সার্ভিস প্রবতর্নের জন্যে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ইসমাইল খানের সেনাবাহিনীতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে সাথে যোগ দেয় সরকারী কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতি। সব মিলিয়ে ইসমাইল খান দুর্বল হয়ে পড়লে তালেবানদের আক্রমণের মুখে পড়ে।

তালেবানদের অগ্রসরকে প্রতিহত করবার জন্যে ইসমাইল খান কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তালেবানরা ইতিপূর্বে হেরাত আক্রমণ করে পর্যুদস্ত হয় এবং ইসমাইল খানের হাতে প্রায় তিন শত তালেবান নিহত হলে পুনর্গঠিত হবার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এ পর্যায়ে আই এস আই সৌদী সরকার তালেবানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। আই এস আই মাজার-ই-শরিফে দোস্তামের সাথে যোগাযোগ করে বিমানবাহিনীর জন্যে কিছু উজবেক টেকনিশিয়ান যোগাড় করে। এ সব টেকনিশিয়ানরা কান্দাহারে পরিত্যক্ত কয়েকটি রাশিয়ান হেলিকপ্টার এবং জঙ্গী মিগ-বিমান মেরামত করে দিলে তালেবানদের শক্তি আগের থেকে বেড়ে যায়। অন্যদিকে দোস্তামের সাথে তালেবানদের এক অলিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে এবং আই এস আই এর পৃষ্ঠপোষকতায় দোস্তামের জঙ্গী বিমানগুলো হেরাতে আঘাত হানতে থাকে। অপর দিকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা যোগ দিলে তালেবানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। অবশেষে তালেবানরা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তে হেরাত দখল করলে ইসমাইল খান তার কয়েকশত অনুগামী নিয়ে হেরাত ত্যাগ করে ইরানে আশ্রয় নেয়।

হেরাতে ইসমাইলের পরাজয় আর তালেবানদের দখল, কাবুলে রাব্বানী সরকারের ভিতে নাড়া দেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কাবুলে রাব্বানী সমর্থকরা পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্বের জন্যে দূতাবাসে হামলা করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে আহত করে। বোরহানউদ্দিন রাব্বানী তার সরকারকে উৎখাত করার পাকিস্তানী প্রচেষ্টা তীব্র নিন্দা করে। সেই থেকে রাব্বানীর উত্তর জোটের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কে অবনতি হতে থাকে যার জের আজও প্রতীয়মান।

নভেম্বর ১২, ২০০১ সনে ইসমাইল খান তার বাহিনী নিয়ে প্রায় দু'বছর পর হেরাতে পুনঃ প্রবেশের সাথেই হেরাতের জনগণের উপরে চাপানো তালেবান নামক বিভীষিকাময় অধ্যায়ের অবসান হয়।

www.nagorikpathagar.org

সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৯৫ তালেবান কর্তৃক হেরাত দখলের পূর্বে ইসমাইল খান হেরাতসহ তার আওতার প্রদেশগুলোতে প্রচুর স্কুল খুলে ছিল। এসব স্কুলে প্রায় ৭৫০০০ ছাত্র ছাত্রী অধ্যায়নরত ছিল। কেবলমাত্র হেরাত নগরীসহ এ প্রদেশেই ৪৫টি স্কুল ছিল যার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০,০০০, এর মধ্যে অর্ধেকই ছিল ছাত্রী। এর বিপরীতে তালেবানদের হেরাত অঞ্চল দখলের সাথে সাথেই বালকদের জন্যে তিন বিদ্যালয় ছাড়া সবগুলোই বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রীদের লেখাপড়ার উপরে সম্পূর্ণভাবে অবরোধ আরোপ করা হয়। এখানেই থেমে থাকে নি। হুকুম দেয়া হয় সমস্ত দরজা জালানার কাঁচে কালো রং লাগাবার যেন ভেতর থেকে কোন মহিলার অবয়বও দেখা না যায়। আরও পরে এ ধরনের ব্যবস্থা সমগ্র আফগানিস্তানের জন্যে প্রযোজ্য করে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, তালেবানদের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মোল্লা সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন নিজে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে নবী মোহাম্মদের হরকাত-উল-ইসলামের এক অশিক্ষিত জেহাদী ছিল। কাজেই তার নিকট থেকে শিক্ষা বিস্তার আশা করা ছিল অবান্তর মাত্র। আর তা ছাড়া আফগানিস্তানের এহেন পরিস্থিতিতে তালেবানদের কাছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কোন গুরুত্বই ছিলনা। সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীতে হয়ত এমন দেশ খুঁজে পাওয়া খুব দুস্করই হবে, যে দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী অশিক্ষিত। তালেবান সরকারের, বাণিজ্যমন্ত্রী মোল্লা সাদেক আখন্দ ছিল এক প্রাক্তন কার্পেট ফেরীওয়ালা, যে হাতের কড়ার গণণাও সঠিক ভাবে রাখতে পারতনা। এধরনের বহু তথ্য রয়েছে যা দিতে গেলে এ পুস্তকের কলেবর আরও বৃদ্ধি পাবে।

এখানে আরও একটি জরুরী তথ্যের অবতারণা করতে চাই। পাকিস্তানের সাথে মধ্য এশিয়া অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ আফগান গৃহযুদ্ধের জটিলতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হবার প্রেক্ষিতেই পাকিস্তান সরকার তালেবানদের ক্ষমতা দখলে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছিল। পাকিস্তানের কোয়েটা-চমন-হেরাত-মাজার-ই-শরিফের এ পথকে ব্যবহারের জন্যে হেরাতের দখল প্রাধিকার পায়। উত্তরে মাজার-ই-শরিফে দোস্তামের সাথে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো অক্টোবর ২৮, ১৯৯৪ সনে আসখাবাদে এক বৈঠকের প্রেক্ষিতে দোস্তামের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এ বৈঠকে দোস্তাম ছাড়াও ইসমাইল খানও উপস্থিত ছিল তবে ইসমাইল খান এ সহযোগিতার আশ্বাস ভঙ্গ করে বলে তালেবান কর্তৃক হেরাত দখল প্রাধিকারে রাখা হয়। ঐ বৈঠকে দোস্তামের

www.nagorikpathagar.org

সাথে অলিখিত চুক্তিতে প্রতিটি ট্রাক মাজার-ই-শরিফে প্রবেশের মুখে বার হাজার রুপী ধার্য করা হয়েছিল।

দোস্তাম তখন রাব্বানী-মাসুদের কাছে উল্লেখযোগ্য স্থান না পাওয়ার কারণে মাজার-ই-শরিফ, কুন্দুজ, তালাখান্ড এবং সিবারগাহান এলাকায় সমান্তরাল সরকার গঠন করে আলাদা প্রশাসন চালাচ্ছিল। আরও পরে এর বিবরণ দেব। কাজেই বেনজীর ভুট্টোর জন্যে দোস্তামের সহযোগিতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। আসকাবাদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নভেম্বর ৪, ১৯৯৪ সনে পাকিস্তানের বিরাট এক ট্রাক বহর মধ্য এশীয় দেশ তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান প্রবেশ করে। কিন্তু কান্দাহার অতিক্রমকালে এ বহরের উপর বিবাদমান উপজাতীয়দের অতর্কিত হামলা হলে প্রায় বিশ জনের মৃত্যু হয়। এখান থেকেই সূত্রপাত হয় তালেবানদের অগ্রযাত্রা। এপরের দিন অর্থাৎ নভেম্বর ৫, ১৯৯৪ সনে চারদিনের সংঘর্ষের পর তালেবানরা কান্দাহার দখল করে সে সাথে পাকিস্তানের ট্রাক বহরকে মুক্ত করে। এ সংঘর্ষে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তৎকালীন কান্দাহারের গভর্ণর নগরীর দায়িত্ব তালেবানদের হাতে ছেড়ে দেয়। এ শহর দখলের মধ্য দিয়ে তালেবানদের আশ্চর্যজনক উত্থানের সূচনা হয়।

নভেম্বর ১২, ২০০১ কাবুলে উত্তেজনা বাড়তে থাকলেও সাধারণ নাগরিক ক্রমেই প্রায় ৪ বছর পর তালেবান বিহীন কাবুলের রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৯৬ সনে তালেবানরা কাবুল দখল করার পর থেকে কাবুলের জনগণ প্রথমে গৃহযুদ্ধের অবসানের এবং শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনায় তালেবান সৈন্যদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু তখনও তারা বুঝতে পারে নি যে, বোরাহানউদ্দিন-মাসুদ-হেকমতইয়ারের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হলেও কাবুলের জনগণের উপরে নেমে আসবে অন্য ধরনের অপ্রতিরোধ্য বাধ্যবাধকতা। এসব ধর্মীয় আঙ্গিকের বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করবার জন্যে মোল্লা ওমর ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তানের আধ্যাত্মিক নেতা আমীরুল মোমেনীনের তরফ থেকে ইসলামী ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। এসব নবনিত্য তালেবানী ফতোয়ার আওতায় সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন আসে সমাজে নারীর স্থান নিয়ে। তালেবানদের ইসলামিক বিধি নিষেধের তোড়ে মেয়েদের সমস্ত স্কুল বন্ধ করা থেকে শুরু করে চাকুরী করা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়, আপদমস্তক বোরকা দ্বারা ঢাকার নির্দেশের সাথে সাথে প্রসাধনী ব্যবহার এবং হাই হিল পরে হাঁটাচলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। একই সাথে কোন নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গ ছাড়া একা চলাফেরার উপরেও নিষোধাজ্ঞা জারি করা হয়। মহিলাদের দৃঢ়পদে শব্দ করে হাঁটাও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এসব কারণে তালেবানদের সময়ে মহিলাদের উপর মানসিক এমনকি দৈহিক অত্যাচারও বাড়ে বলে প্রকাশ। এসব নিষেধাজ্ঞার কারণে বহু পরিবারকে ভিক্ষায় নামতে হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আফগান জেহাদে প্রায় পনের লক্ষ এবং গৃহযুদ্ধের কারণে কেবলমাত্র কাবুলেই পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল আর এদের সিংহভাগ ছিল উপার্জনক্ষম পুরুষ। কাজেই মহিলাদের এক বৃহদাংশ স্বামীহীন বিধবা হয়ে পড়ায় সংসার চালাবার দায়িত্ব এদের ঘাড়ে চাপলেও বস্তুতপক্ষে এসব বাধ্যবাধকতার জন্যে এসব মহিলাদের কাজের অভাবে ভিক্ষা করা ছাড়া উপায়ও ছিলনা। এদের অনেকেই সন্তানাদি নিয়ে পাকিস্তান এবং ইরানে অবৈধভাবে ভিড় করতে থাকে। উল্লেখ এসময়ে আফগানিস্তানে কোন বিদেশী TV চ্যানেল ছিলনা। অন্যদিকে সিনেমা, গান বাজনা, খেলাধুলা থেকে ছবি তোলা বা ছবি সম্বলিত যে কোন বই পুস্তক অথবা সংবাদপত্র প্রকাশনা অথবা বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ফতোয়া দেয়া হয়েছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের মুখে নির্ধারিত মাপের দাড়ি রাখার বাধ্যবাধকতার। এসব কেন করা হয়েছিল তার জবাব দিতে গেলে তালেবান নেতা এবং এদের অনুসারীদের বেড়ে উঠার পরিবেশ, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিকের বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। আরও পরে অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনায় আসব।

এসব বাধ্যবাধকতা শুধু কাবুলেই সীমিত থাকে নি; বরং তালেবান শাসিত সমস্ত অঞ্চলে এসব ফতোয়া প্রয়োগ করা হয়। এসব তথাকথিত ইসলামিক নিয়মাদি প্রয়োগের জন্যে তালেবানরা স্থাপন করেছিল এক বিশেষ পুলিশ সংস্থা আর সংস্থার প্রধান ছিল ক্বারী দীন মোহাম্মদ মৌলভী কামালউদ্দিন। এ দীর্ঘদেহী আজানুলম্বিত হাত, অস্বাভাবিক ও বৃহৎ পদযুগল, মোটা দাগের নাসিকা, পুরু ভ্রু দ্বারা আচ্ছাদিত দুটি গভীর কালো চোখ আর ঘন কালো লম্বা দাড়ির অধিকারী এ ঘিজলানী পশতুনকে নিয়োগ করা হয়েছিল ধর্মীয় আচার আচরণ নিয়োগকারী সংস্থার প্রধান হিসেবে। কাবুল শহরের মাঝখানে মৌলভী

www.nagorikpathagar.org

কামালউদ্দিনের অফিসের চৌহদ্দীতে মহিলাদের প্রবেশ 'হারাম' বলে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ক্বারী দীন মোহাম্মদ প্রাক্তন রাব্বানী সমর্থক আফগান জেহাদের মুজাহিদ, জাবুল প্রদেশের যুদ্ধবাজনেতা হিসেবে রাব্বানীর দল ত্যাগ করে তালেবানদের দলে যোগ দিয়েছিল। যেমনি ছিল মৌলভী দীন মোহাম্মদের মহিলাদের প্রতি অবজ্ঞা তেমনি অজ্ঞতায় ভরা ছিল তার বাহিনী সদস্যরাও। এরা কাবুল তথা দেশের অন্যান্য শহরের রাস্তায় রাস্তায় পিঠে ক্লাশনিকভ রাইফেল আর হাতে চাবুক নিয়ে টহল দিয়ে 'শরিয়তের বিধান' কঠোরভাবে প্রয়োগ করত। যদিও এরা মূলতঃ চারিত্রিকভাবে সৎ ছিল তবে এদের এ মধ্যযুগীয় পন্থা ক্রমেই একদা আধুনিক কাবুল এবং অন্যান্য শহরের জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তালেবান শাসনের পাঁচ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক খাদ্য সাহায্য ছাড়া কাবুলের ধ্বংসস্তূপের কোন উন্নতিই হয় নি। ক্রমেই তালেবানরা বিশ্ব থেকে বিছিন্ন হতে থাকলে জনগণের সহযোগিতা হারাতে থাকে। অর্থনৈতিক দৈন্য অবস্থা ছাড়াও গত তিন বছরের খড়া এ অবস্থাকে আরও দুর্বিসহ করে তুলতে থাকলে তালেবানদের বিরোধীরা ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ বিদেশী তালেবান যোদ্ধাসেবকের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে।

নভেম্বর ১৪, ২০০১ সনের মধ্যে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল, কাবুল সহ, উত্তর জোটের হস্তগত হলেও মাজার-ই-শরিফ কাবুলের রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান কুন্দুজে তখনও তালেবান সৈন্যরা মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কুন্দুজ দখল না করা পর্যন্ত কাবুলের সরবরাহ রাস্তা বন্ধ থাকে বিধায় উত্তর জোটের সৈন্যরা কুন্দুজকে ঘিরে ফেলে। আফগান ছাড়াও প্রায় একহাজারের উপরে অ-আফগান তালেবান সৈনিক তখনও কুন্দুজে মরণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। ক্রমেই উত্তরজোট তালাখান্দ দখল করে কুন্দুজকে ঘিরে ফেলে।

নভেম্বর ২০, ২০০১ সনে প্রথমবারের মত মাজার-ই-শরিফে আফগান তালেবান নেতা রশিদ দোস্তামের নিকট তার বাহিনীর আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে শর্তারোপ করে যে, তাদেরকে তালেবান যোদ্ধাদের হাতিয়ার জমা দেবার পর নির্বিঘ্নে কুন্দুজ ছেড়ে চলে যাবার পথ করে দিতে হবে। এসব আফগান যোদ্ধারা প্রায় সবাই পশতুন তবে এদের সাথে প্রায় ৭০০/৮০০ অ-আফগান তালেবানদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সেখানে উপস্থিত আমেরিকান এবং বৃটিশ সমর বিশেষজ্ঞ এবং সি আই এ'র কর্মকর্তারা দ্বিমত পোষণ করে।

www.nagorikpathagar.org

তাদের মতে এসব অ-আফগানদের প্রথমে সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়দার সদস্যদের সনাক্ত করণের পর এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে আফগানদের বিষয়ে উত্তরজোটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। এসব সাব্যস্ত করবার পেছনে আমেরিকা ও সি আই এ'র প্রধান অন্তর্নিহিত কারণটি ছিল আফগানিস্তারে অন্যান্য জায়গায় আফগান এবং অ-আফগান যোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ ও দূরত্ব বাড়ানো এবং আফগান তালেবানদের দল ত্যাগ করে উত্তরজোটে দলভুক্ত হওয়া প্ররোচণা হিসেবে অন্ততঃ কুন্দুজে এ পরিকল্পনা কার্যকর হয় তবে এর পরিণতিতে যা হয় তা হয়ত ভবিষ্যতে আমেরিকার সমর ইতিহাসে ভিয়েতনামের 'মিলাই' হত্যাযজ্ঞের মত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। যদিও কুন্দুজের অ-আফগান তালেবান যুদ্ধ বন্দীদের নৃশংস হত্যার দায়দায়িত্ব কার ছিল তা এখনও স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় নি বা ভবিষ্যতে না হলেও এর নৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে উপস্থিত আমেরিকা ও বৃটেনের সমর বিশেষজ্ঞ এবং সি আই এ কর্মকর্তারা অব্যাহতি পাবেনা। আফগান ইতিহাসের পাতায় এরূপ অনেক হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসের মধ্যে এটি অন্যতম হয়ে থাকবে। এ ঘটনায় আমেরিকার সি আই এ'র একজন কর্মকর্তা নিহত হয়। কুন্দুজের অ-আফগান যোদ্ধাদের আত্মসমর্পণের এবং পরে এদের উদ্ধারের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল এক আমেরিকান তালেবানের অস্তিত্বের আত্মপ্রকাশ। এ বিশ বছরের আমেরিকান নাগরিক জন ওয়াকার লিনদ্ ওরফে সোলেমান ওরফে আব্দুল হামিদ আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বকে হতবাক করে তালেবানদের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালে আমেরিকার সরকার প্রচণ্ড বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। বেশ কিছুদিন এ যুবককে নিয়ে বিশ্বে প্রচুর আলোচনা চলতে থাকে।

মাজার-ই-শরিফ পতনের পর নভেম্বর ২৫,২০০১ সনে দু সপ্তাহের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে কুন্দুজের পতন ঘটলে সমগ্র উত্তরাঞ্চল তালেবানদের হাত থেকে উত্তর জোটের দখলে চলে আসে। আগস্ট ১, ১৯৯৮ সনে তালেবানদের আক্রমণ আর মাজার-ই-শরিফের পতনের পর যুদ্ধবাজ নেতা রশিদ দোস্তাম তুরস্কে আশ্রয় নিয়ে প্রায় পাঁচবছর নির্বাসনে কাটায়। ২০০১ সনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে সেপ্টেম্বর ২০০১ আগেই উত্তর জোট দোস্তামের উপস্থিতি অনেকটা কাকতালীয় হলেও প্রচুর সন্দেহের উদ্রেক করে। ১৯৯৬ সনের শেষের দিক থেকেই দোস্তামের সাথে তালেবানদের

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কের অবনতি হয়। এ সম্পর্কের অবনতির নেপথ্যের কথা জানতে গেলে আমাদের অক্টোবর ১৯৯৬ এ ফিরে যেতে হবে।

সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৯৬ সনে তালেবান যোদ্ধারা কাবুল দখল করে রাব্বানী-মাসুদ বাহিনীকে সালাং গিরিপথ উত্তরে পাঞ্জশীর উপত্যকায় ঠেলে দেয়। কাবুলের অবস্থান দৃঢ় করবার সাথে সাথেই তালেবানরা মাসুদের বাহিনীকে ধাওয়া করে সালাং গিরিপথের সন্নিকটে রশিদ দোস্তামের উজবেক বাহিনীর অবস্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দোস্তামের আকস্মিক উপস্থিতি তালেবান সামরিক কমাণ্ডারদের বিস্মিত করে কারণ দোস্তামের তখন মাজার-ই-শরিফে থাকবার কথা। তালেবান কমাণ্ডারা দল বদলে পটিয়শী রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী দোস্তামের সদলবলে উপস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে অপারগ হলেও এসময়ে দোস্তাম বাহিনীর সহযোগিতার গুরুত্ব বুঝতে পারে ঠিকই। তালেবানদের তরফ থেকে কাবুলের সুরার প্রধান হিজব-ই-ইসলাম (খালিস) গ্রুপের প্রাক্তন মুজাহিদ মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানীকে দোস্তামের সাথে সমঝোতা করার বৈঠকে নেতৃত্বের জন্যে নিয়োগ করা হয়। অক্টোবর ৮, ১৯৯৬ তে মোল্লা রাব্বানী আর দোস্তামের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। দোস্তামের সম্ভাব্য সহযোগিতার কথা উঠলে দোস্তাম শর্ত সাপেক্ষে রাজী আছে বলে জানায়। দোস্তাম শর্ত দেয় যে, রাব্বানী মাসুদের বাহিনী পরাজিত হলে মাজার-ই-শরিফ সহ উত্তরাঞ্চলকে তার অধীনে সায়ত্বশাসন দিতে হবে। এ পর্যায়ে মোল্লা ওমরের মতামত চাইলে এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ হয়ে যায়। এ সময়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ দু'পক্ষে একদিকে যেমন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তেমনি অপরদিকে আহমেদ শাহ মাসুদ তার একালের বন্ধু দোস্তামকে দলে টানবার সর্বত প্রয়াস চালিয়ে যায়।

পরিস্থিতি ক্রমেই তালেবান বিরোধীদের অনুকূলে যেতে শুরু করলে উপস্থিত পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ এবং আই এস আই এর তালেবান আর দোস্তামের মধ্যকার মধস্থতাও অসফল হয়। পাকিস্তানীরা দোস্তামকে যেমন তার দাবী থেকে সরাতে পারে নি তেমনি পারে নি মোল্লা ওমর তথা তালেবানদের নমনীয় করতে। হতাশ দোস্তাম বুঝতে পারে যে, পশতুন নেতৃত্বে তার অভিপ্রায় ফলপ্রসূ হবার নয়। দোস্তাম হতাশাগ্রস্ত হয়ে রাব্বানী-মাসুদ বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। উত্তর আফগানিস্তানের স্বার্থ রক্ষার্থে তালেবান উৎখাতের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে অক্টোবর ১০, ১৯৯৬ সনে বোরহান উদ্দিন রাব্বানীর নেতৃত্বে খিলজান নামক এক

www.nagorikpathagar.org

অখ্যাত গ্রামে 'উত্তরজোট বা নর্দান এলায়েন্স' গঠন করে 'সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ডিফেন্স অব দি মাদারল্যাণ্ড' (Supreme Council for the Defence of the Motherland)। এ কাউন্সিল সমান অধিকারের ভিত্তিতে উজবেক নেতা দোস্তাম, হাজারা নেতা করিম খলিলি আর আহমেদ শাহ মাসুদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাউন্সিল আরও পরে ইরানে ইসমাইল খানের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এ কাউন্সিলের প্রথম লক্ষ্যই ছিল কাবুল সহ উত্তর অঞ্চলকে তালেবান মুক্ত করে সমগ্র আফগানিস্তানকে তালেবান দুঃশাসন থেকে মুক্ত করানো। এ একই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন দক্ষিণের তালেবান বিরোধী পশতুন নেতাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করছিল তেমনি রাশিয়া, ইরান আর ভারতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলছিল। পরে ওসামা বিরোধী তৎপরতায় সি আই এ তথা আমেরিকা যোগ দিলে এদের সাথে সি আই এর যোগাযোগও বাড়তে থাকে। এ এলায়ন্সই গত পাঁচ বছর তালেবান বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে গেলে তালেবানদের সমগ্র আফগানিস্তান দখল স্বপ্নেই থেকে যায়।

আব্দুর রশিদ দোস্তাম, গোত্রের দিক থেকে উজবেক আফগান। উত্তরে সিবারগাহানের এক গ্রামের গরীব কৃষক পরিবারে ১৯৫৫ সনে জন্ম গ্রহণ করে সে সেনাবাহীনিতে যোগদান করে এবং ১৯৭৮ সনে আফগান সেনাবাহিনীতে ট্যাংক রেজিমেন্টের কমাণ্ডারে উন্নীত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার আফগান দখলের পর মাজার-ই-শরিফ এলাকায় সোভিয়েত বাহিনীর সরবরাহ পথ খোলা রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। ১৯৮৯ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার আফগান ত্যাগের পর দোস্তাম 'জ্ওয়াজান' নামে উজবেকদের নিয়ে নিজস্ব মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলে ডা. নজিবুল্লাহ সরকারের ঝটিকা বাহিনীতে পরিণত হয়। সমগ্র আফগান জেহাদ এবং পরবর্তীতেও মুজাহিদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ১৯৯২ তে দল বদল করে। অত্যন্ত বিলাশবহুল জীবন যাপনকারী মদ্যপ এ নেতা প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় কাবুলের যে কোন সরকারের সাথে সহযোগিতা করে আসছে তবে তার নিজের স্বার্থে। বর্তমানেও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হামিদ কারজাইয়ের সরকারে সাথেও থাকছে। তবে মাজার-ই-শরিফ নিজের ইচ্ছে মতই চালাচ্ছে যেমনটা আগেও করেছিল।

আফগান গৃহযুদ্ধের সময় হতে বহুবার চেষ্টার পর তালেবান কর্তৃক আগস্ট ৮, ১৯৯৮ তে মাজার দখল করার পূর্ব পর্যন্ত মাজার-ই-শরিফ দোস্তামের নিজস্ব গতিতে চলেছে। তার শাসন ছিল কাবুল থেকে বিছিন্ন। রাশিয়ার সাথে

www.nagorikpathagar.org

বরাবর যোগাযোগ রেখে দোস্তাম তার প্রদেশগুলোকে চালিয়েছে। পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রেখে সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যএশিয়ার সাথে যোগাযোগের পথের পরিস্থিতির নিশ্চয়তা বাবদ প্রচুর অর্থ নিয়ে থাকত। দোস্তাম নিজে 'বলকান এয়ারলাইন্স' নামে দুটি যাত্রীবাহী বিমানও পরিচালনা করত। তাছাড়া দুবাই এর সাথে বিরাট চোরাচালানীর রাস্তাও পাহাড়া দিত। মাজার-ই-শরিফে তালেবানদের আগমন পর্যন্ত দোস্তাম দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় 'বলকান ইউনিভারসিটি' খোলা রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া ও পরিধেয় সম্বন্ধে উদার এ উজবেক নেতা মদ ব্যবসা সরকারী ভাবে বৈধতা দিয়েছিল। ঐ সময়ে একমাত্র মাজার-ই-শরিফের রাস্তাঘাটে আফগান মেয়েদের পশ্চিমা বস্ত্র পরিধান অবস্থায় দেখা যেত। দোস্তাম মাজার-ই-শরিফকে নিজের সম্পত্তির মত গণ্য করে ঐ অঞ্চলে আজও একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবেই অধিষ্ঠিত যদিও তার সহগামী এক কমাণ্ডার তাজিক নেতা উস্তাদ আতা মাজার-ই-শরিফের মেয়র পদের আগ্রহী। আজও দোস্তাম উত্তর আফগানিস্তানের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব।

১৯৯৭ সনে তালেবান কর্তৃক মাজার-ই-শরিফ দখল ও দোস্তামের পরাজয় এবং অতপর পলায়ন অনেকটা পলাশীর প্রান্তরে মীর জাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার মত ঘটনার মধ্য দিয়েই হয়েছিল। দোস্তামের প্রতিপক্ষ আরেক জেনারেল মালিক পেহলোয়ান তার ভ্রাতা জেনারেল মালিক রসুল পেহলোয়ানের হত্যার জন্যে দায়ী দোস্তামের সাথে সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন করে প্রতিশোধের জন্যে তালেবানদের সাথে সহযোগিতা করে। তালেবানরা মালিকের সহযোগিতায় আর প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মাজার-ই-শরিফের দখল নেয়। মালিক পেহলোয়ান শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকে নি হেরাতের নেতা ইসমাইল খানকেও তালেবানদের হাতে তুলে দেয় তবে পরে ইসমাইল খান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এদিকে তালেবানরা মাজার দখল করার পরপরই মালিক পেহলোয়ান বুঝতে পারে এ পশতুন সমর্থিত বাহিনী তাকে কোনরূপ রাজনৈতিক ছাড় দিতে রাজি নয়; বরং তাকে কাবুলে পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর পদ দিলে মালিক তার ভুল বুঝতে পারে। তবে ততক্ষণে প্রচণ্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবারের মত দক্ষিণের পশতুনরা উত্তরে মাজার-ই-শরিফের পুরোপুরি দখল নিলে সময়ক্ষেপণ না করেই 'শরিয়া' আইন জারি করে মহিলাদের অন্তপুরে নিক্ষেপ করে শহরের চেহারা পাল্টে দেয়। সে সাথে মাজার সহ অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধ করে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান সীমান্ত বন্ধ করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মাজার-ই-শরিফ দখলের পরপরই তরিঘড়ি করে নওয়াজ শরিফ সরকার কাবুলে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিলে সে সাথে সৌদী আরব আর ইউ এ ই ও স্বীকৃতি দেয়। এরই মধ্যে হাজারা সম্প্রদায় এবং শহরের অন্যান্য উজবেক বাসিন্দারা তালেবানদের শাসন এবং ইসলামী শরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রায় তিনশত তালেবান হত্যা করে এবং প্রায় শতাধিক বন্দী করে ফেলে। এ বিদ্রোহে মালিক পেহলোয়ানও যোগ দেয় এবং বাকী প্রদেশ তিনটি কুন্দুজ সহ তালেবান বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কুন্দুজ দখল করতে অনেক সময় লেগে যায়। কুন্দুজ, তালাখান সংলগ্ন এলাকা এবং মাজার-ই-শরিফের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রাথমিক বিপর্যয়ে একমাত্র কুন্দুজেই ৩০০০ তালেবান সৈন্য নিহত ৩৬০০ বন্দী হয়। বেসামরিক নাগরিক সহ সাত হাজার সৈনিক আহত হয়। এর মধ্যে প্রায় ২৫০ পাকিস্তানী নিহত আর ৫৫০ বন্দী হলে ইসলামাবাদ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। তবুও মোল্লা ওমরের ডাকে পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যায়নরত প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র (তালিব) কুন্দুজে যোগ দেয়। সে সাথে ওসামা বিন লাদেনের আরব বাহিনীর সদস্যরাও কুন্দুজ সহ উত্তরাঞ্চল পুনঃদখলের যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি আর হতাহতের মধ্যে তালেবানদের হাত শক্ত হলেও এসব স্থান থেকে বিশেষ করে মাজার-ই-শরিফে তালেবানদের হত্যাযজ্ঞ আর কঠোর নিয়মনীতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে হাজার হাজার উজবেক, তাজিক, হাজারা অধিবাসীরা পার্শ্ববর্তী দেশ তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান আর ইরানে আশ্রয় নেয়। এসব দেশের সাথে বিশেষ করে ইরানের সাথে তালেবানদের সম্পর্ক নিম্ন স্তরে পৌঁছে।[৪] অপর দিকে উত্তর জোট মাজার-ই-শরিফকে তাদের রাজধানী ঘোষণা করে এ শহর তথা এতদঅঞ্চল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে অবশেষে নভেম্বর ২৫, ২০০১ এ কুন্দুজের পতনের মধ্য দিয়ে সমগ্র উত্তরাঞ্চল পুনঃদখল করে। তবে তা অবশ্যই আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়।

কুন্দুজে নভেম্বর ২৪, ২০০১ এ প্রায় ৪০০ থেকে ৮০০ জন অ-আফগান (সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায় নি) তালেবান যোদ্ধাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর দোস্তাম আমেরিকা আর ব্রিটেনের স্পেশাল ফোর্সের তত্ত্বাবধানে মাজার-ই-শরিফ শহরের অদূরে ১৯ শতকের নির্মিত দূর্গ 'কিলা জঙ্গীতে' স্থানান্তর করা। পরের দিন ঘটে বর্তমানে আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিমা দেশের

৪। Afghanistan Wars 1839-1992: P 232

www.nagorikpathagar.org

সম্যবিহারে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধের সবচেয়ে বিভিষীকাময় এবং বিব্রতকর ঘটনা। আর তাহল যুদ্ধবন্দীদের তথাকথিত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে নৃশংস হত্যা। এ 'অভ্যুত্থান' সামাল দিতে অন্যান্য অস্ত্র ছাড়াও ব্যবহার করা হয় বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির জঙ্গী বিমান। পরে মাত্র ৮৬ জন যুদ্ধবন্দীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হত্যা করা হয় বাকী সব যুদ্ধবন্দীদের। এসব হতভাগা যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তানী, চেচেন এমনকি কয়েকজন বাংলাদেশীও ছিল বলে শোনা যায়। এ ধরনের অভূতপূর্ব বন্দী অবস্থায় বিদ্রোহ দমন সামরিক ইতিহাসে বিরল। একে অনেকে পশ্চিমের পত্র পত্রিকাতে, ষাটের দশকে ভিয়েতনামের মিলাই এর নৃশংসতার সাথে তুলনা করেছে। জাতিসংঘের হাইকমিশন ফর হিউম্যান রাইটস্, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি সংগঠন আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী জানিয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, এ হত্যাযজ্ঞের সময়ে আমেরিকা ও ব্রিটিশ সেনাদের উপস্থিতি এবং জঙ্গী বিমানের ব্যবহার এ দু'দেশকেও জড়িয়ে ফেলেছে। দোস্তামের ঘাড়ে এ দোষ চাপালেও এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিদ্রোহের সূত্রপাত সি আই এ'র বিদ্রোহীদের হাতে নিহত কর্মকর্তা মাইক স্প্যান আর তার অন্য একজন সঙ্গী ডেভ কর্তৃক ছবি গ্রহণ এবং বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময়। বলা হয় কয়েকজন উত্তেজিত যুদ্ধ বন্দী কাপড়ের নীচে লুকায়িত অস্ত্রের সাহায্যে মাইক স্প্যানকে গুলী করবার সাথে অন্যান্য বন্দীরা নীচে অস্ত্রাগার লুঠ করে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটায়।

কিলা জঙ্গীতে যা হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ হয়ত সহজে জানা যাবেনা তবে ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধবন্দীদের হত্যা বিগত ২৭ বছরে আফগানিস্তানে এ প্রথম নয়। তবে ২০০১ এর এ হত্যা হয়েছে পশ্চিমা দেশ যারা নিজেদের আধুনিক সভ্যতার ধ্বজধারী বলে পরিচয় তাদেরই প্রচ্ছন্ন ইশারায় এবং ঘটনার বিবরণ থেকেই তাই প্রতীয়মান হয়।

২৩-২৪ নভেম্বর ২০০১ আত্মসর্মপণকারী তালেবান যুদ্ধ বন্দীদের আমেরিকা আর তার মিত্র ব্রিটেনের পরামর্শে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ী যেতে দেয়া হয়। বিগত ২৭ বছর আফগানিস্তানে যুবকদের জন্যে যুদ্ধই ছিল একমাত্র পেশা। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছে সেটা বড় বিষয় ছিলনা।

www.nagorikpathagar.org

বিষয়টি হল কোন দল জিতছে এবং কার পক্ষে থাকলে যুদ্ধের সাথে জড়িত থাকা যাবে। আর তাই কুন্দুজে যে সব আফগান তালেবানরা আত্মসর্মপণ করেছে তাদের অনেকেই দল বদল করে যুদ্ধেই রয়ে যায়। সমস্যা হয়ে পড়ল অ-আফগান তালেবানদের। আমেরিকা ইতিপূর্বে এদের সবাইকে ওসামা বিন লাদেনের আল- কায়দার সদস্য বলে আগাম বক্তব্য দিয়ে বসে। প্রকৃতপক্ষে সবার বেলায় তেমনটা নয়। এখানে পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবকরা ১৯৯৭ সন থেকে মাজার-ই-শরিফ দখল আর পাল্টা দখলের যুদ্ধে কুন্দুজে ঘাঁটি পেতেছিল। পরে সে সাথে যোগ দেয় অনেক আরব, চেচেন আর উজবেকরাও।

তালেবান কমাণ্ডার আর উত্তর জোটের সাথে সমঝোতায় বলা হয়েছিল যুদ্ধ শেষ করবার লক্ষ্যে কুন্দুজ ছেড়ে দিলে অ-আফগান যুদ্ধবন্দীদের জাতি সংঘ অথবা নিজ নিজ সরকারের হাতে তুলে দেয়া হবে। অন্তত উত্তর জোট ও বর্তমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহর মতামত তাই ছিল। আর ঐ সমঝোতার প্রেক্ষিতে আত্মসমর্পণ করানো হয়।

পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী এসব যুদ্ধবন্দীদের কিলা-ই'জঙ্গি যেটি দোস্তামের সামরিক সদর হিসেবে কাজ করছিল সেখানে নিয়ে এসে বন্দী করা হয়। এ ব্যবস্থায় বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ আত্মসমর্পণের ব্যবস্থার সাথে জড়িত কমাণ্ডার আমির জানের মতে, এসব বন্দীদেরকে নিরস্ত্র করবার পর মাজার-ই-শরিফের বিমান বন্দরের নিকটে রাখবার সিদ্ধান্ত হলে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের নির্দেশে এদেরকে দূর্গে নিয়ে আসা হয়।

ঐ রাতেই একজনকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিতে গেলে সে গ্রেনেড ফুটিয়ে আত্মহত্যা করে এবং তার সাথে দোস্তামের দুজন সহকারীও নিহত হয়। অনুরূপভাবে আরও কয়েকজন অত্যাচারের বদলে গ্রেনেড ফুটিয়ে মৃত্যুকে বেছে নেয়। এর পরের দিন, নভেম্বর ২৫, ২০০১ রোজ রোববার দোস্তামের বাহিনী প্রায় দু'শ পঞ্চাশ জন বন্দীদের পেছনে হাতমোড়া দিয়ে দূর্গেস্থিত সি আই এ'র দু'কর্মকর্তার সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে আসে। আমির জানের নিজস্ব বক্তব্যে জানানো হয় যে, সি আই এ'র ঐ দু'কর্মকর্তার কথাবার্তায় এসব ভাগ্যাহত বন্দীরা মনে করে যে, তাদের গুলী করে হত্যা করা হবে, এরই মধ্যে একজন বন্দী ও সি আই এ'র কর্মকর্তা স্পেন কে গুলী করলে স্পেনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বন্দীদের অভ্যুত্থান শুরু হয়। অন্য সূত্রে বলা

www.nagorikpathagar.org

হয় সি আই এ'র কর্মকর্তা স্পেন জিজ্ঞাসাবাদের সময়েই চারজন বন্দীকে গুলী করে হত্যা করে অন্যদের ভয় দেখালে বাকী বন্দীরা একযোগে স্পেনকে ধরাশায়ী করে হত্যা করে। এর পরপরই এসব বন্দীরা একযোগে উত্তর জোটের সৈনিকদের আক্রমণ করলে এ বিদ্রোহ শুরু হয়।

সি আই এ'র প্রথম কর্মকর্তার হত্যার পরপরই দ্বিতীয় কর্মকর্তা ডেভ সেটলাইটের ফোনের মাধ্যমে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের স্পেশাল ফোর্সকে তলব করে নিয়ে এলে দূর্গের ভেতরে সমস্ত বন্দীরা ঐ দূর্গে রক্ষিত অস্ত্রের ভাণ্ডার লুট করে মরণপণ যুদ্ধ শুরু করলে বিমান হামলা চালিয়ে অত্যন্ত অমানবিক ভাবে দূর্গের ভেতরে ফাঁদে পড়া সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করে। প্রতিটি বন্দীকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে মাটির তলার কক্ষগুলোতে দাহ-পদার্থ ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। বিবিসি তার নভেম্বর ২৯, ২০০১ এর এক রিপোর্টে আমেরিকার সৈন্যদের যুদ্ধবন্দীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে অংশগ্রহণ করার দৃশ্য দেখায়। ওয়াশিংটনে এ ঘটনা সম্বন্ধে প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামস্‌ফিল্ডকে এ ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞাত নয় বলে পাশ কাটিয়ে যায়।

এ ঘটনা আফগানিস্তানের রক্তঝরা ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ে পরিণত হবে। সমস্ত তথ্য উদ্‌ভাটন করতে হয়ত আরও সময় লাগবে তবে কোন দিন হয়ত ভিয়েতনামের ঘটনাগুলোর মত এ সমস্ত ঘটনাও খোদ আমেরিকানদের বিবেককে নাড়া দেবে।

এ হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রায় চারদিন পর পর্যন্ত রেডক্রস দূর্গ থেকে মৃত্যুদেহ সরিয়ে নেয়। চারদিন পর একটি সুড়ঙ্গ থেকে প্রায় ৮০ জনকে অর্ধমৃত্যু আহত যুদ্ধবন্দীদের টেনে বের করে আনলে আমেরিকানদের জন্যে এক বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটে। এ বিষয়টি হল আমেরিকান যুবক ২০ বছর বয়স্ক জন ওয়াকার ওরফে আব্দুল হামিদ নামক নির্ভেজাল আমেরিকান তালেবান এর উদ্ধার।

আমেরিকান তালেবানঃ আব্দুল হামিদ ওরফে জন ওয়াকার

'ইসলাম মানুষের ধর্ম, এতে কোন বর্ণের বা গোত্রের প্রাধান্য নেই।'

আলহাজ্ব মালেক এল সেহবাজ জন্ম ১৯২৫ সনের আমেরিকান আফ্রিকান সে। বাপ মার প্রদত্ত নাম ছিল ম্যালকম এক্স (ম্যালকম-X (১০))। এই কালো আমেরিকান জন্মসূত্রে মুসলমান না হলেও ষাটের দশকে আমেরিকায় বর্ণবাদী দাঙ্গা আর কু ক্লাক্স ক্লান (কে কে কে) নামক সাদা বর্ণবাদী সন্ত্রাসীদের কালো মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদগার এসবই তাকে ধর্মান্তর করতে প্রভাবিত করে। বিশ্বে ম্যালকম-এক্স নামে পরিচিত এ মানুষটি ইসলাম ধর্মের ভেতরে খুঁজে পায় সাম্যের আহ্বান যেখানে ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে জাত আর বংশের ভেদাভেদ নেই। ধর্মান্তরের পর নেশন অব ইসলামে যোগ দেয় তবে পরবর্তীতে হজ্জ্বব্রত পালনের পর নিজে একটি সংগঠন গড়ে তোলে যেখানে শুধুমাত্র আফ্রিকান আমেরিকান ছাড়াও অনেক সাদা বর্ণের আমেরিকানরাও এ মানববাদীর দ্বারা প্রবাবিত হয়ে ধর্মান্তর করে মুসলমান হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৫ সনে এ মানববাদী কিংবদন্তীতে পরিণত হওয়া মানুষ মালেক এল সেহবাজ ওরফে ম্যালকম এক্স আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়। ম্যালকম-এক্স এর মৃত্যুর ৩৬ বছর পরেও বিশ্ববিখ্যাত লেখক এলেক্স হেইলি রচিত ম্যালকমের জীবন গাঁথা 'দি অটোবায়গ্রাফি অব ম্যালকম এক্স' আমেরিকার গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর যুবককে আজও আকৃষ্ট করে। এদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে যায়।

এমনি এক ষোল বছরের যুবক জন ফিলিপ ওয়াকার লিনধ ম্যালকম-এক্স এর জীবনী পড়ে ইসলাম ধর্মের দিকে ঝুকে ধর্মান্তারিত হয়। জন ওয়াকারের বাবা ফ্রাংক লিনধ অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী আইরিশ ক্যাথলিক খ্রীষ্টান আর মাতা

www.nagorikpathagar.org

মেরিলীন ওয়াকার একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী স্বাস্থ্যকর্মী। শৈশব থেকেই জন ওয়াকারের ধর্মের দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়াতে বসবাসরত জন ওয়াকার একদিন আবরদের ভেশভুষা ধারণ করে ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ খাদ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে তার ধর্ম বদলিয়ে মুসলমান হবার সিদ্ধান্তটি বাবা মাকে জানিয়ে দেয়। সাথে তার একজন ধর্মযাজক হয়ে গরীবদের সেবায় আত্মনিয়োগের কথাও জানিয়ে দেয়। শুরু হয় এ তরুণের পরিবর্তিত জীবন।

জনের বাবা মা ১৯৯১ সনে ক্যালিফোর্নিয়া চলে আসে এবং পরে জন সুলেমান নাম ধারণ করে বে এরিয়ার একটি মসজিদে কোরআনের উপর তালিম নিতে থাকে। এক পর্যায়ে ধর্মবিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে সুলেমান সৌদী আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার ইচ্ছাও রাখে। ১৭ বছর বয়সে সুলেমান ইয়ামেনে কোরআন এবং আরবী ভাষায় দখল অর্জনের জন্যে চলে আসে। প্রায় বছর খানেক ইয়েমেনের রাজধানী সানায় কাটিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরে আসে। ফেব্রুয়ারী ২০০০ সনে সুলেমান আবার ইয়েমেনে ফিরে যায়। ঐ বছরের ১৭ ই অক্টোবরে ইয়েমেনী বন্দর এডেনের জলসীমায় ইউ এস এস কোল নামক নেভীর জাহাজে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৭ জন নাবিকের মৃত্যু হয় এবং নৌ জাহাজের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনার জন্যে আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দাকে সন্দেহ করে। সানা সরকার বেশ কিছু সংখ্যক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। এরা এখনও ইয়েমেনে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

এ ঘটনার সময়ে সুলেমান ইয়েমেনে তার বাবা তার সাথে যোগাযোগ করে এ ঘটনার জন্যে পিতৃত্বের স্বভাবসুলভ উদ্বেগের কথা জানালে সুলেমান তার বাবাকে ভিন্ন ধরনের উত্তর দেয়। তার উত্তরে সে তার মতামত ব্যক্ত করে বলে যে, আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ একটি ইসলামী দেশের জলসীমায় নোঙ্গর করে থেকে অন্যায় করেছে। এ কার্যকলাপের মাধ্যমে আমেরিকা 'যুদ্ধানুরূপ গর্হিত কাজটি করেছে।' সুলেমান আরও বলেছে, এ ধরনের গর্হিত কার্যকলাপ প্রতিহত করা যে কোন ইসলামী দেশের ধর্মীয় কর্তব্য। সেদিনই বাবা লিনধ বুঝতে পারে যে, তার ছেলে অন্য এক জগতে পা দিয়েছে যে জগৎকে তার দেশে ইসলামিক মৌলবাদ বলে অভিহিত করে। সুলেমান ওরফে জন ফিলিপ ওয়াকার পরে আব্দুল হামিদ নামে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

www.nagorikpathagar.org

বান্নু জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে মাদ্রাসার তালেব বা ছাত্র। আব্দুল হামিদ কোরআন ছাড়াও উর্দু আর পশতুন ভাষাও চর্চা করতে থাকে। এরই মাঝে ক্রমেই সে জেহাদে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে এবং ভারত অধীকৃত কাশ্মীরেও 'জেহাদে' শরিক হয়ে হাতে খড়ি নেয়।

কাশ্মীর থেকে ফিরে আব্দুল হামিদ ওরফে সোলেমান ওরফে জন ওয়াকার এক পত্রে তার বাবা-মাকে জানায় যে, সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কোন এক ঠাণ্ডা জায়গায় যাবে এবং সেখানে বেশ কিছু সময় কাটাবে। আব্দুল হামিদ পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ছয় মাস পূর্বে আফগানিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কুন্দুজের প্রতিরক্ষায় যোগ দেয়।

এ ধর্মান্তরিত যুবকের মতে তালেবানরা সঠিক ইসলামের চর্চা এবং প্রসারে নিয়োজিত কাজেই তাদের হয়ে বিধর্মী এবং ইসলাম প্রসারের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত। নভেম্বর ২৪/২৫, ২০০১ এ কিলা -ই-জঙ্গীতে অন্যান্য অ-আফগান তালেবানদের সাথে তাকে পায়ে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় তিনদিন পর উদ্ধার করা হলে, সে নিজেকে আব্দুল হামিদ এবং ওয়াশিংটনের বাসিন্দা বলে জানায়। পায়ে গুলীবিদ্ধ হবার পূর্বে তাকেও সি আই এ'র কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পরে উত্তেজিত বন্দীদের দ্বারা জনি পাইককে নিহত হতে দেখে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে জানায় যে, তার প্রশিক্ষণের সময়ে সে কয়েকবার ওসামা বিন লাদেনকে দেখেছে।

এ তরুণ আরও অন্যান্য জীবিত যুদ্ধবন্দীদের সাথে দূর্গের মাটির নীচের এক প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকলে দোস্তামের সৈন্যরা আমেরিকার স্পেশাল সৈন্যদের উপস্থিতিতে সমস্ত জায়গায় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা প্রবাহিত করলে এরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তাকে প্রাথমিকভাবে নিউইয়র্কের ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলে এটি সঠিক হয়েছে বলে জানায়। বর্তমানে এ তরুণ (এ লেখা পর্যন্ত) আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈনিকদের হাতে রয়েছে।

আমেরিকার নিকট এ তরুণ এখন জন ওয়াকার নামেই পরিচিত। তার ইসলামিক নামটির ব্যবহার হচ্ছে না। জন ওয়াকারের ব্যাপারটি আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ তরুণ আমেরিকানকে কিভাবে দেখা হবে। তাকে নিজের দেশের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার অপরাধে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়া হবে, না তাকে শুধুমাত্র একজন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত

www.nagorikpathagar.org

যুবক হিসেবে দেখা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্ন থেকে যায়। তবুও তাকে আমেরিকান তালেবান বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। প্রশ্ন থাকে তাকে কি আল-কায়দা সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে? তা করা হলে অন্যান্য অ-আফগান তালেবানদেরও তাই করতে হবে। কিন্তু এদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করাও আইনসিদ্ধ হবেনা বলেই আমেরিকার বুশ প্রশাসন যুদ্ধকালীন ক্ষমতার বলে সামরিক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সেখানে খোদ জন্মসূত্রে নির্ভেজাল আমেরিকার নাগরিককে বিচার করতে হবে তা হয়ত কল্পনাও করতে পারে নি। আরও প্রশ্ন থাকে যে, তাকে অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদের সাথে কেন রাখা হয় নি? এখানেও কি বৈষম্য করা হচ্ছে? আব্দুল হামিদ ওরফে জন ওয়াকার বিবাদ আমেরিকার জন্যে বিব্রতকর হবে তাতে সন্দেহ নেই। জানা যায় যে, তালেবানদের পক্ষ হয়ে আব্দুল হামিদ ওরফে জন ওয়াকারের মত আরও কয়েকজন যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এরা কারা বা প্রকৃত পক্ষে জন ওয়াকারই বা কে? আগত দিনগুলোতে এ তরুণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকেই ক্রমেই এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আফগানিস্তানের তালেবান বিরোধী যুদ্ধ এ দেশের বিগত ২৭ বছরের ঐতিহাসিক জটিলতার রহস্যময় দিক হয়ে থাকবে যেমনি থাকবে তালেবান নামক সংস্থা।

www.nagorikpathagar.org

জাতিসংঘের বর্তমান ভূমিকা

'নতুন দিগন্তের উন্মোচ।'

নভেম্বরের প্রায় শেষের দিক। আফগানিস্তানে এবারের শীত মৌসুম ঘনিয়ে আসছে। ক্রমেই তালেবানরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। উত্তরাঞ্চল এখন বিদেশী সৈন্যদের উপস্থিতিতে উত্তরজোটের হস্তগত হয়েছে। পাঁচবছর পর কাবুলে বোরহানউদ্দিন রাব্বানী ফিরে এসেছে। তালেবানরা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে খোদ দক্ষিণের পশতুন এলাকাগুলোতেই। পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদসহ অনেকেই এত তাড়াতাড়ি তালেবানদের পরাজয় বরণ করাতে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছে। আশ্চর্য হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিশেষ করে জাতিসংঘ যার দায়িত্বে ছিল আফগানিস্তানের জন্যে একটি সর্বজনবিদিত অস্থায়ী সরকার গঠন করা। তালেবানদের এহেন সামরিক বিপর্যয়ের মুখে সরকার গঠনের জন্যে আফগান গোষ্ঠীগুলোকে একত্র করাই ছিল বড় সমস্যা। তবে এ সমস্যাটি যত জটিল মনে করা হয়েছিল ততটা হয় নি। এর প্রথম কারণ উত্তরজোটে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের উদয়। এরা ঐতিহাসিক পটভূমির প্রজন্ম তাই তারা ভাল করেই উপলব্ধি করেছিল যে, কাবুলে সংখ্যাগড়িষ্ঠ পশতুনদের প্রাধান্য না দিয়ে টিকে থাকা যাবেনা তাতে যতই আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা থাকুক না কেন। তেমনি আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষ করে আমেরিকার চাপের কারণেও এটা সম্ভব হবেনা। তালেবান বিরোধী পূর্বতন পশতুন যুদ্ধবাজ নেতারা বিদেশের মাটিতে রয়েছে, সে সাথে প্রচুর আফগান বিধ্বস্ত জনগণ বিগত ২৭ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত রয়েছে। এরা একটি শান্তিপূর্ণ দেশে আগমণে ইচ্ছুক এবং এরাই আফগানিস্তানের সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে পুরাতন যুদ্ধবাজ নেতাদের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারবে।

এসব চিন্তাভাবনার প্রেক্ষাপটে চারটি বড় গোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে জার্মানীর

www.nagorikpathagar.org

বনে প্রায় চারদিনের আলোচনা শেষে জাতিসংঘের আফগান বিষয়ের বিশেষ দূত ফ্রান্সিস ভেণ্ড্রেল আর প্রাক্তন আলজেরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাখতার ব্রাহিমির কষ্ট সার্থক হয়। আলোচনায় দেশান্তরী বাদশাহ জহির শাহের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। উত্তর জোটের হয়ে ইউনুস কানুনী এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। জাতিসংঘের জন্যে আশার বিষয় হল যে, দু'দশকেরও উপরে এই প্রথম আফগানিস্তানের যে কোন বিষয়ে সফলতা অর্জন করা। ইতিপূর্বে জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নি, এর বেশ কিছু উদাহরণও আমরা পেয়েছি।

আফগানিস্তানে মূলতঃ বড় গোত্রের মধ্যে চারটি হল পশতুন, তাজিক, উজবেক আর হাজারা। এরা ছাড়াও আরও ছোট ছোট গোত্রও রয়েছে। পশ্চিম আফগানিস্তানে এবং কিছুটা উত্তরেও 'দাবী' নামে পরিচিত পারসিয়ান ভাষার আফগান রূপান্তরই ব্যবহার করা হয় আরেকটি বড় ভাষা হল পশতুন যা ভারতীয় এবং পারসিয়ান ভাষার সংমিশ্রণ। পশতুনদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু উপগোত্র। এদের মধ্যে প্রধান দুররানী, ঘিলজাই, পপুলাজাই এবং কাকারস্। পুপুলাজাই, দুররানী পশতুনদের একটি উপ-গোত্র। এমনি অন্যান্য বড় গোত্রের মধ্যেও রয়েছে উপদলের অস্তিত্ব। এ পর্যন্ত দুররানী পশতুনরাই কাবুলে শাসন করেছে। বাদশাহ জহির শাহ্ এবং তার পূর্ব পুরুষরাও এই দুররানী পশতুন। তেমনি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান হামিদ কারজাই ও পুপুলাজাই হামিদ কারজাইয়ের দাদা বাদশাহ্ জহির শাহের দরবারে নিয়োজিত ছিল। তার বাবা আব্দুল আহাদ কারজাই এক সময় আফগান পার্লামেন্টের সদস্য ছিল পরে প্রায় এক দশক আগে পেশাওয়ারে আততায়ীর হাতে নিহত হয়।[১] হামিদ কারজাই শিমলাতে পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে কিছু দিন সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে পেশাওয়ারে থেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে। পরে অল্প কিছু দিনের জন্যে মুজাদিদ্দীর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে বহাল থাকে। গৃহযুদ্ধের সময় আফগানিস্তান ত্যাগ করে আমেরিকায় বসবাস করতে থাকে। মাত্র দু'মাস আগে দেশে ফিরে আসে। তালেবানদের আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ছিল ঘিলজাই পশতুন।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম জালালাবাদ, কান্দাহারের পশতুনদের নিয়েই

www.nagorikpathagar.org

আন্তর্বর্তীকালীন আফগান প্রেসিডেন্ট
হামিদ কারজাই

আন্তর্বর্তীকালীন আফগান
পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক আফগানিস্তানের পরিচিতি। এদের অনেক গোত্রই পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের বাসিন্দা। তাই তালেবানদের দ্বারা বিতাড়িত হলে তালেবান বিরোধী পশতুনরাও পাকিস্তানেই চলে এসে ঠাঁই নিয়েছিল যদিও সরকারীভাবে পাকিস্তানই তালেবানদের প্রধান সমর্থক হয়ে পড়েছিল। কোথা থেকে এ পশতুনদের উৎপত্তি হয়েছিল তা নিয়ে অনেক মতবাদ থাকলেও প্রচলিত মতবাদে দেখা যায় পশতুনরা ইসলামের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই এ ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। বলা হয় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ট সহচর কায়েস এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করলে ক্রমেই পশতুনদের বিস্তৃতি ঘটে। আরও বলা হয় কায়েসের প্রথম ছেলের বংশধররাই এখনকার দুররানী আর দ্বিতীয় ছেলের বংশধররা ঘিলজাই এমনি ভাবে তৃতীয় ছেলের বংশধররা কান্দাহারের কাকার পশতুন।

বন সম্মেলনে পশতুনদের প্রতিনিধিত্বে বিশেষ করে দুররানী আর ঘিলজাইরাই ছিল। বন সম্মেলনে বহু আলোচনার পর জাতিসংঘের পূর্ব পরিকল্পনাকে অপরিবর্তিত রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তে বলা হয় ২৬ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাবুলে আগামী ৬ মাসের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সরকারের সকল গোত্রের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, এতে আরও থাকবে দু'জন মহিলা। এ দু'জন মহিলার একজনকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মহিলাদের সরকারের উচ্চপদ আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম। এ সরকারের প্রধান কাজ হবে আফগানিস্তানে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা আর জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করা। ছয় মাস পরে আফগানিস্তানের প্রাক্তন বাদশাহ জহির শাহের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার নিয়োগ করা হবে তবে এ নিয়োগকে 'লোয়া জিরগা' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। আর এ জিরগা প্রাক্তন বাদশাহ ডাকবে। 'লোয়া জিরগা' প্রথমে ১৭৪৭ সনে বাদশাহ আহমেদ শাহ্ আবদালী আফগানিস্তানে একতা এবং তার কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্যে নেয়া অত্যন্ত সচতুর ব্যবস্থা ছিল। এতে সমস্ত দেশের প্রতিটি গোত্র উপ-গোত্রের প্রধান এবং বয়স্কদের নিয়ে এক সম্মেলন যাতে বাদশাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ছাড়াও দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের অনুমতি ও উপদেশ উপস্থাপনের এক সমাবেশে পরিবর্তিত হয়। 'লোয়া জিরগা' কোন আইন সম্মত বিধি নয় বরং দুশ বছরের উপরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রীতি। শেষ 'লোয়া জিরগা' তলব করা হয়েছিল জহির

www.nagorikpathagar.org

মন্ত্রী ইউনুস কানুনী

আন্তর্বর্তীকালীন আফগান
প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফাহিম

www.nagorikpathagar.org

শাহের আমলে। কাজেই জাতিসংঘও তাদের ফরমুলায় 'লোয়া জিরগা'কে পাশ কাটাতে চায় নি। এর পরের পদক্ষেপ 'লোয়া জিরগা' আরেকবার তলব করা হবে দেশের শাসনতন্ত্রকে বৈধতা দিতে এবং শেষ পদক্ষেপ হিসেবে এ শাসনতন্ত্রের আওতাতেই অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন যার মধ্যে আফগানিস্তান পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে । এ কাজটি সমাধা করতে হবে আগামী দু'বছর ছয় মাসের মধ্যে। জাতিসংঘের এ পরিকল্পনাটি ১৯৯২ সনেই বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু আমারা যেমনটা দেখেছি তা হয় নি। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ঐ সময়ে আফগানরা বহিঃবিশ্বের সাহায্য পায় নি, এবার হয়ত পাবে। তবুও জাতিসংঘের মতেই এ পরিকল্পনা যত সহজ মনে হয় বস্তুতঃ একে বাস্তবায়ন করতে হয়ত প্রচুর সংযমের প্রয়োজন হবে। আর এ পরিকল্পানার সাথে জড়িত আছে কয়েক বিলিয়ন ডলারের পুনঃনির্মাণের আশ্বাস।

জাতিসংঘ অন্ততঃ প্রথম পর্যায় উৎড়িয়ে গেছে। ডিসেম্বর ২২, ২০০১ সন থেকে পশতুন নেতা হামিদ কারজাই এর নেতৃত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাবুলে অধিষ্ঠিত রয়েছে তবে আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে উত্তর জোটের সদস্যদের মধ্যে। এদের হাতে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব-বৈদেশিক, প্রতিরক্ষা আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আফগান গৃহযুদ্ধের সময়কার কোন নেতাই কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই। তবুও এসব যুদ্ধবাজ নেতারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এখনও অত্যধিক শক্তি নিয়ে বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ মাজারে দোস্তাম, হেরাতে ইসমাইল খান, জালালাবাদে আব্দুল কাদের আর কান্দাহারে গুল আগা। তবে এসব যুদ্ধবাজ নেতারা ভাল করেই জানে যে, যতদিন কাবুলে শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং জাতিসংঘের তৎপরতা রয়েছে ততদিন তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তালেবানদের আত্মসমর্পণ ও একটি বিশ্লেষণ

'তোমরা সীমালঙ্ঘন করিওনা। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।'

উত্তরাঞ্চল হাতছাড়া হবার সাথে সাথে তালেবানদের দিন শেষ হয়ে আসতে লাগল। ক্রমেই তালেবান বিরোধী শক্তির উত্থানের সাথে প্রচুর তালেবান সৈন্য এবং কমাণ্ডাররা বিরোধী দলে যোগ দিতে শুরু করে। এদের অনেকেই অর্থ আর ক্ষমতার লোভে আবার অনেকে নিজস্ব বাহিনীকে আয়ত্ত্বে রাখার জন্যে দল বদল করতে থাকে। ঠিক এমনিভাবে তালেবানরাও তাদের উত্থানের সময় অনেক কমাণ্ডারদের অর্থের বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করিয়েছিল। অনেককে বিভিন্ন পদের লোভের বশ করে নিজেদের দল ভারী করেছিল এখন আবার একই ভাবে অন্য দলে যোগদান করছে। এতে সি আই এ আবার প্রচুর অর্থ ঢেলেছে যার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নি। এ ছাড়াও অনেক বাড়াবাড়ির কারণেই তালেবানরা জনসাধারণের মধ্যে ন্যূনতমও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি তার উপরে রয়েছে প্রচলিত সমরবিদ্যা, বিশ্বের উন্নত দেশের আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রয়োগের উপরে অজ্ঞতা আর বহিঃবিশ্ব সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণার অভাব। অল্প কথায় সব বিষয়ে অজ্ঞতা ছিল বিরাজমান।

ক্রমেই তালেবান যোদ্ধারা ক্রমাগত মানসিক চাপে ভেঙ্গে পড়তে থাকে সে সাথে উপর্যুপরি আমেরিকান জঙ্গী বিমান হালমা জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। নভেম্বরের শেষের দিকে পূর্বের শহর ও প্রদেশ জালালাবাদ, উরুগজান, পাখতিয়া, খোস্ট এসব প্রদেশ এবং শহর বিরোধীদের হাতে তুলে দিলে কান্দাহার এলাকা মাত্র হাতে থাকে। জালালাবাদের মোল্লা ওমর তথা প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় তালেবান নেতাদের গুরু বলে পরিচিত সতীর্থ মুজাহিদ কমাণ্ডার মৌলভী ইউনিস খালিস আর তার সহযোগিরা পুনঃপ্রবেশ করে দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। এরপরে সকলের নজর পড়ে কান্দাহারে। জাতিসংঘের উদ্যোগে নিয়োজিত অন্তরবর্তীকালীন

www.nagorikpathagar.org

সরকার প্রধান হামিদ কারজাই তার দলবল নিয়ে সীমান্ত শহর স্পীন বোলদাক তালেবান মুক্ত করতে সক্ষম হয়। কান্দাহারে অবস্থান নিয়ে মোল্লা ওমরের সাথে কারজাইয়ের প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আলাপ আলোচনা চলে এ সংঘাতকে প্রশমিত করবার। হামিদ কারজাই বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তালবানদের দিন শেষ। বাহ্যত তাবৎ বিশ্বই তাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে। আর আফগানরা বিশেষ করে তালেবান বিরোধীরা বিদেশী আল-কায়দার উপস্থিতিকে আর সহ্য করতে পারছেনা তার উপরে আমেরিকার চাপ ত রয়েছেই। অবশেষে ডিসেম্বর ৭, ২০০১ সনে তালেবানদের আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, 'আমীরুল মোমেনীন' তার পছন্দের পশতুন কমাণ্ডার মোল্লা নকিবুল্লাহ্‌র বাহিনীর হাতে কান্দাহার ছেড়ে দিয়ে অন্তর্নিহিত হয় (অন্তত এ পাণ্ডুলিপি লেখা পর্যন্ত)। অপর দিকে কারজাই সমর্থিত অপর নেতা গুল মোহাম্মদ আগাও কান্দাহারে প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উৎপত্তি হয়। তবে তেমন ব্যাপক সংঘর্ষ বাধবার পূর্বেই কারজাইয়ের মধ্যস্থতায় কাবুলের সমর্থন পর্যন্ত গুল মোহাম্মদ আগাকে কান্দাহারের গভর্ণর নিযুক্ত করে মোল্লা নকিবুল্লাহ্‌কে সৈনিক কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এর পর থেকে ওমরের হদিস না পাওয়া গেলেও আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওমরের অন্তর্নিহিত হবার ব্যাপারে কারজাই এর সাথে আমেরিকার কোন পূর্ব সিদ্ধান্তের নীতিতেই ওমরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর পর থেকে আমেরিকার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রয়েছে জালালাবাদের দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল সাদা পাহাড় (White Mountain) বলে পরিচিত তোড়াবোড়া নামক অঞ্চলে। ধারণা করা হয়েছিল এখানেই লুক্কায়িত রয়েছে ওসামা বিন লাদেন কোন এক সুরম্য গুহায়। আফগানিস্তানে আল-কায়দার শেষ দূর্গ বলে পরিচিত এলাকায় আমেরিকার সহায়তায় যুদ্ধ চালাচ্ছিল আফগান পশতুন কমাণ্ডাররা। ক্রমেই এরা সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তখনও খবর আসছে তবে ওসামা ওখানে আছে কিনা কিছুই নিশ্চিত নয়।

আফগান ইতিহাসে তালেবানদের মত কট্টরবাদী ইসলামবাদী বলে পরিচিত শক্তির উত্থান এবং পাঁচ বছরের এক নৈরাজ্যজনক অব্যবস্থার শাসন এক অতি আশ্চর্য এবং অনুসন্ধিৎষু বিষয় হয়ে থাকবে। এ অঞ্চলের উপরে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যারা লেখাপড়া করবে তাদের জন্যে বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। এ জন্যেও তাৎপর্যপূর্ণ হবে যে, ইসলামের নামে যে ভাবে এ

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ বছর আফগানিস্তান চলেছে তার বিশদ বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন রয়েছে অন্তত ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে। কারণ তালেবানদের অসহায়ত্ব আর প্রচণ্ড অজ্ঞতা আফগানিস্তানে ১৯৮৯ সনে সোভিয়েত বাহিনী ত্যাগের পরেও রক্তপাত বন্ধ হয় নি। বন্ধ ছিলনা প্রতিবেশীদের আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে নাক গলানো। এ সুযোগে জন্ম দিয়েছে সন্ত্রাসের আস্তানা। ইতিপূর্বে তালেবান শক্তির উত্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম তারই জের ধরে জানাবার চেষ্টা করছি কারা ছিল এ তালেবান? কেনই বা তারা ছিল নারী বিদ্বেষী আর অগ্রগামী না হয়ে ছিল পশ্চাদগামী, কেন তারা নিয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তানকে মধ্যযুগের ও আগের অবস্থায়।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কোন পরিস্থিতিতে তালেবানরা সংগঠিত হয়েছিল। তালেবানদের উত্থান যেমনি আভ্যন্তরীণ তেমনি ছিল বহিঃবিশ্বের প্ররোচনায়। মুজাহিদদের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে আফগানিস্তানের আপামর জন সাধারণের বিতৃষ্ণা এবং আফগান সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দেশ থেকে অনুপস্থিতি, বিদেশে বসতিস্থাপন এবং দেশের নেতৃত্বে অপারগতা ইত্যাদির কারণে আফগান সমাজ ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছিল আর সৃষ্টি করেছিল বিরাট শূন্যতার। আজ এদের অনেকেই পশ্চিমা বিশ্বের পৃষ্ঠপোষকতায় ফিরে আসছে ভবিষ্যৎ আফগানিস্তান গড়ার জন্যে।

তালেবানদের দলের সদস্যদের মধ্যেও ছিল তিন প্রজন্মের সমাবেশ। এদের প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সবাই ছিল নেতৃস্থানীয় যারা সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে যুবা বয়সে সাধারণ জেহাদী হিসেবে কোন না কোন মুজাহিদ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের অনেকে সন্মুখ যুদ্ধে আহত হবার কারণে অঙ্গহানিও হয়েছে। তালেবান নেতৃত্বই বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র শাসকগোষ্ঠী ছিল যাদের নেতাদের বেশীর ভাগই যুদ্ধাহত বিকলাঙ্গ। এদের মধ্যে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিজেই ডান চোখ হারিয়েছিল। কান্দাহারের প্রথম তালেবান গভর্ণর মোল্লা মোহাম্মদ হাসানের একটি পা এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর মাথাই ছিলনা। তাই হাসানের একটি পা ছিল কাঠের তৈরী। তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে অনেকটা রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' নামক কল্পকাহিনীর একপায়ে খোঁড়া জলদস্যু লংজন সিলভার এনার মত মনে হতো। হাসান তার পা টি কান্দাহারেই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে হারায়। তালেবান প্রশাসনের আরেক নেতা চার মন্ত্রী নুরুদ্দীন তোরাবী, পূর্বতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

গউস দু'জনই একটি করে চোখ হারিয়েছিল আফগান জেহাদে। কাবুলের তৎকালীন তালেবান মেয়র আব্দুল মজিদেরও ছিল একটি পা এবং ডান হাতের দুটি আঙ্গুল কাটা। এ ক'জন ছাড়া অনেক সামরিক কমাণ্ডারও ছিল যুদ্ধাহত পঙ্গু। এরাই ছিল তালেবানদের শীর্ষস্থানীয় নেতা। এসব নেতারা বেশীর ভাগেই ছিল গ্রাম্য জীবন আর মাদ্রাসায় কিঞ্চিত লেখাপড়া তাও আবার ব্যাহত হয়েছিল ছয় বছর দেশে সোসালিস্টদের বিরোধিতায়, দশবছর সোভিয়েত বিরোধিতায় আরও চার বছর গৃহযুদ্ধে। এ প্রজন্মের হাতে সেই সময় হতেই একে-৪৭ রাইফেল আর পি জি রকেট। কাজেই বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে এসব নেতৃবৃন্দের কোন ধারণাই জন্মায় নি। এদের বেশীরভাগেরই পাকিস্তানের পেশাওয়ার অথবা বেলুচিস্তানই ছিল বিদেশ। এসব অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মোল্লা মোহাম্মদ সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন যে নিজেই ছিল বকলম তাকে শিক্ষামন্ত্রী বানালে সে দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করাটাই স্বাভাবিক হয়েছেও তাই। তেমনি তালেবান নামক প্রশাসনের বাণিজ্য মন্ত্রী সাদেক আখন্দও বকলম ছিল আর আরিফউল্লাহ্ আরিফ হাক্কানী মাদ্রাসায় ষষ্ঠ ক্লাস পাশ ছিল ডেপুটি ফাইন্যান্স মিনিস্টার। এমনি অনেক নেতৃবৃন্দের ছিল জীবনের ইতিহাস।

এর পরের প্রজন্মের তালেবান সদস্যরা ছিল মাঠ পর্যায়ের কমাণ্ডার এবং এদের বেশীর ভাগই মিলিশিয়া বাহিনীর নেতৃত্বে। আর এরা বেড়ে উঠেছে যুদ্ধের পরিবেশে। এদের বেশীর ভাগ আফগান গৃহযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে সরাসরি এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে বেড়ে উঠেছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে অমানবেতর পরিবেশে এবং পরে এদের অনেকেই মাদ্রাসার নিম্ন ক্লাশগুলো ত্যাগ করে যুদ্ধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কাজেই এদের নিকট যুদ্ধ আর কমাণ্ডারের নির্দেশই ছিল ধর্ম।

তৃতীয় প্রজন্ম ছিল যাদের জন্মই হয়েছিল শরণার্থী শিবিরে অথবা সোভিয়েত দখলকৃত আফগানিস্তানে। কাজেই যুদ্ধ আর হানাহানি ছাড়া কিছুই দেখে নি এমনকি এদের অনেকে নিজের অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাবার সুযোগটিও পায় নি।

এই ছিল তালেবান নেতৃত্ব আর যোদ্ধাদের মোটামুটি চেহারা। সে সাথে তাদের পরিবেশ আর সামান্যতম মাদ্রাসা শিক্ষা যা তাদেরকে জীবনের প্রথম থেকেই নারী বিদ্বেষী করে তোলে। এদের বেশীরভাগ পশতুন যুবক যাদের

www.nagorikpathagar.org

জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরের সন্নিকটে কট্টরপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসায় হাতে খড়ি। লেখাপড়ার মধ্যে ছিল কোরআন পাঠ এবং অর্ধশিক্ষিত শিক্ষকদের কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা। এসব শিক্ষকদের বহির্বিশ্ব, বিজ্ঞান ইতিহাস বা ভূগোল সম্বন্ধে কোন ধারণাই রাখে নি। যে কোন আরবী ভাষাভাষী বা সৌদী আরবের বাসিন্দাকে পয়গম্বরের দেশের মনে করে প্রভাবিত হতো। এসব 'তালেব' (মাদ্রাসার ছাত্র) ছাত্রদের নিজের গোত্রীয় পরিচয়, ইতিহাস, দেশের ভূগোল এমনকি সোভিয়েত বিরোধী জেহাদ সম্বন্ধেও এদের কোন ধারণা ছিলনা বা তাদের শিক্ষকরাও দেয় নি, শুধুমাত্র ধর্ম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়া। এসব শিক্ষকরা ধর্মীয় যুদ্ধের পরিবেশ বা যৌক্তিকতার কথাও কোনদিন এদের বুঝিয়ে বলে নি।

এসব তালেবান এমন এক প্রজন্মের যারা তাদের দেশকে শান্তিতে দেখে নি। শান্তি কি জিনিস তাও তাদের জানা ছিলনা। এরা যেমন দেশের এবং নিজের অতীত সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ তেমনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ছিল নির্বিকার। এদের কাছে বর্তমানই ছিল সব কিছু। এরা ছিল যুদ্ধে এতিম, এদের কোন ভবিষ্যৎ ছিলনা, এরা ছিল অসহিষ্ণু, অশিক্ষিত এক যুবকগোষ্ঠী। এদের সামনে ছিলনা কোন কাজের সুযোগ। যুদ্ধই ছিল একমাত্র সহজলভ্য পেশা। এরা যুদ্ধকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ভালবাসত। ভালবাসত যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে। হারতে এরা রাজী নয় তাই সব সময়েই থাকতে চাইত বিজয়ী দলের সাথে। ক্রমেই আফগানদের কাছে যুদ্ধই হয়ে উঠে একমাত্র পেশা। এ পেশায় একজন সাধারণ যুবক হাতে হাতিয়ারের বলে হয়ে উঠে শক্তিশালী, নিরস্ত্র আর অসহায়দের বিরুদ্ধে তার শক্তি বৃদ্ধি হয় কয়েকশত গুণ। আর এ শক্তির বলে সে বশ্যতা স্বীকার করায় দুর্বল আর অসহায়দের। এহেন পরিবেশে এসব 'তালেব' দের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয় কট্টরপন্থীদের নিজেদের ধর্মীয় ভাষ্য। কাজেই এসব তরুণ ক্রমেই অন্য পেশাকে ঘৃণা করতে থাকে। কারণ তাদের ধারণায় যুদ্ধ বা 'জেহাদ' ই পুরুষের পৌরুষত্ব প্রকাশের একমাত্র উপায়, আর যুদ্ধে নারীদের স্থান নেই।

এসব প্রেক্ষাপটে পুরুষে পরিবেষ্টিত সমাজে বেড়ে উঠা যুবকরা শুধুমাত্র তাদের মা, বোনদের চিনতে শিখেছে এর বাইরে নারীর অন্য কোন রূপ দেখে তারা অভ্যস্ত নয়। মাদ্রাসায় পড়ার সময় কখনই এরা নারীর সংস্পর্শ তো দূর

www.nagorikpathagar.org

অবয়বও দেখে নি আর শেখানো হয়েছিল নারীর উপার্জন উপভোগ করা শরিয়ত বিরোধী। মাদ্রাসায় মোল্লা শিক্ষকরা শিখিয়েছে নারীরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করে কাজেই প্রতিটি পুরুষের দায়িত্ব এর থেকে নিবৃত্ত থাকার ব্যবস্থা করা।

এ পরিবেশের মধ্যে এসব 'তালেব'রা এ শিক্ষার বাইরে আর কোন বিষয়েই চিন্তা করতে পারে নি। ক্রমেই এদেরকে বুঝানো হয় একমাত্র এ পথে চললেই আল্লাহ তাদের সাথে থাকবে আর তালেবানদের ইসলামী পথই একমাত্র সত্যিকারের ইসলাম আর তাদের শাসিত দেশই বিশ্বে একমাত্র ইসলামিক শাসনতন্ত্রের দেশ। তাদের এ ইসলামী দর্শন এবং মতবাদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক কথায় আফগানিস্তানে প্রায় তিন দশকের হানাহানিতে তিনটি প্রজন্ম হারিয়ে যায়। এদের মধ্যে শুধু তালেবান সদস্যরাই নয় এ সমাজব্যবস্থায় গোটা আফগানিস্তান অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর এ পর্যন্ত বহির্বিশ্ব আফগানিস্তানে গত তিন দশক যত অর্থ ঢেলেছে তা দিয়ে প্রতিটি আফগানের হাতে তুলে ছিয়েছে মরণাস্ত্র।

১৯৭৯-৮৯ সনে সোভিয়েত দখলের সময় সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিবছর খরচ করেছে পাঁচ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার এবং নয় বছরে মোট পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার তারপরও তারা এদেশে থাকতে পারে নি। ছেড়ে গেছে এতগুলো অর্থের যুদ্ধ উপকরণ। অন্যদিকে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় মিত্র দেশ খরচ করেছে দশ বিলিয়ন ডলার আর এরই সমপরিমাণ অর্থ যোগান দিয়েছে সৌদী আরব। এতসব অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছে মারণাস্ত্র। এতসব অর্থের অস্ত্র মোট ২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশে সাধারণ কৃষকের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছে একের অধিক অস্ত্র। আজ সাধারণ আফগানদের পরিচয় হাতে ক্লাসনিকভ রাইফেল আর পিঠে আর পি জি (RPG) লাঞ্চার। এহেন পরিস্থিতিতে বন্দুকের জোরেই নির্ধারিত হয়েছে নেতাদের ভাগ্য।

এমনিভাবে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরেরও জন্ম । আমরা আগেও মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের পরিচয় পেয়েছি তবে নিম্নে তার ধর্মীয় উত্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

আজকের পৃথিবী যেখানে প্রতি মুহূর্তের খবর একনাগারে সমগ্র বিশ্বে একই সময়ে প্রচারিত হয়। সে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকার প্রধানদের ছবি প্রায় ঘরোয়া পর্যায়ে চলে গেছে। মুখে মুখে শোনা যায় এদের অতীত জীবনের কথা। আর এসবই সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রযুক্তির বদৌলতে। পৃথিবীকে বলা

www.nagorikpathagar.org

হয় গ্লোবাল ভিলেজ। এমনি গ্লোবাল ভিলেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের একজন নেতা যে সম্পূর্ণভাবে রয়েছিল রহাস্যাবৃত তারই নাম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তালেবানদের নেতা হবার পর তার ব্যক্তিত্বে অনেক পরিবর্তন আসে। মানুষের সামনে কথা বলতে তার লজ্জা হয় বলে সাধারণত তালেবানদের ছাড়া বাইরের কারও সাথেই সে দেখা করে নি। তার হয়ে কথা বলবার জন্যে নিয়োজিত ছিল এক তরুণ যার নাম ওয়াক্কিল আহমেদ। এ ওয়াক্কিল আহমেদই মোল্লা ওমরের হয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিল মাত্র।

কান্দাহার তালেবানদের হাতে আসার পর তাদের মাঠ পর্যায়ের কমাণ্ডারগণ আর সুরায় নিয়োজিত ধর্মীয় ওলেমাদের দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে মোল্লা ওমরকে 'আমীরুল মোমেনীন' হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তান।' এপ্রিল ৪, ১৯৯৬ তে মোল্লা ওমর ইসলামিক বিশ্বের দ্বিতীয় 'আমীরুল মোমেনীন' হবার শেষ অধ্যায়ে কান্দাহারের বাস ভবনের ছাদে উঠে ধর্মীয় ওলেমাদের সমাবেশে, কান্দাহারের বিশেষ স্থান খারকা মোবারকে রক্ষিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আলখাল্লা (পিরহান) বের করে গায়ে জড়িয়ে আবার খুলে অত্যন্ত ভক্তির সাথে উপস্থিত ওলেমা ও তালেবান কমাণ্ডারদের দিকে প্রসারিত করে ধরলে উপস্থিত সবাই সমস্বরে 'আমীরুল মোমেনীন' বলে ধ্বনি দিয়ে মোল্লা ওমরের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বলা হয়ে থাকে ঠিক অনুরূপ ভাবে 'বায়াতের' মাধ্যমে হযরত ওমর (রাঃ) কে মুসলমানদের খলিফা এবং আমীরুল মোমেনীন নিযুক্ত করা হয়েছিল। এটা ছিল মোল্লা ওমরের অত্যন্ত সুচতুর রাজনৈতিক চাল। এর মধ্য দিয়ে মোল্লা ওমর শুধু আফগানিস্তানেরই নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নেতা হবার দাবীদার হয়ে উঠে। 'আমীরুল মোমেনীন' হবার সুবাদে মোল্লা ওমর ইসলামী বিশ্বের পক্ষ হয়ে জেহাদের ঘোষণা দেবার ধর্মীয় ও নৈতিক অধিকার প্রাপ্ত হয় বলে তালেবানরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মোল্লা ওমর সেদিন কাবুলে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বোরহানউদ্দিন রাব্বানীর বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম জেহাদ ঘোষণা করে তালেবানদের প্রকৃত ইসলামের 'মুজাহিদ' আখ্যা দিয়ে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে। সে সাথে অন্যান্য মুসলিম দেশ এবং স্বেচ্ছাসেবক দলকে জেহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করে। উন্মুক্ত করে ওসামা বিন

www.nagorikpathagar.org

লাদেনের আল-কায়দাকে এ জেহাদে জড়িত করবার।

স্মরণযোগ্য যে, আমেরিকাই প্রথমে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছিল আর ইসলাম ধর্মের আওতায় যারা জেহাদে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে 'মুজাহিদ' (আল্লাহর সৈনিক) বলে সম্বোধন করা হয়। পশ্চিমা বিশ্ব এ বিষয়ে আজও অজ্ঞ। একদিকে যেমন তারা বর্তমানে তালেবান কর্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে 'জেহাদের' আহ্বানকে যুক্তিতর্ক দিয়ে নাকচ করে দিয়েছে অন্যদিকে আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী যোদ্ধাদের 'মুজাহিদ' বলে সম্বোধন করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। ইসলামিক বিশ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

আজ তালেবানরা আফগানিস্তানের দৃশ্যপট থেকে বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু তালেবান নামক এ শক্তি যে ইতিহাস রচনা করে গেছে তা আফগানিস্তানের হাজার বছরের ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য অধ্যায় রচিত হবে। তালেবানদের সৃষ্টির পেছনে আফগানদের অজ্ঞতাই নয় রয়েছে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যের প্রতি অবহেলার পরিচয়। যুগে যুগে আফগানিস্তান ব্যবহৃত হয়েছে অন্যের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, ভবিষ্যতেও হবে যদি আফগান সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিদেশের মাটি ছেড়ে জাতীয় বিপর্যয়ের মুখেও নেতৃত্বের হাল না ধরে। যেমনটা বিগত বিশ বছরে প্রতীয়মান ছিল।

www.nagorikpathagar.org

পর্যালোচনা

'অসম্মানের পূর্বে মৃত্যুই সম্মানজনক পরিণতি।'

ডিসেম্বর ১৮, ২০০১। আমেরিকা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বের একনম্বর সন্ত্রাসী বলে বিবেচিত ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করতে গিয়ে জালালাবাদ পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন ১৩,০০০ ফিট বরফে ঢাকা সুউচ্চ পাহাড়রাজিতে, পশতুতে যার নাম 'তোড়াবোড়া' কালো খিড়কি, অনবরত বোমা বর্ষণ করে চলেছে। এত বোমা হয়ত আমেরিকার বি-৫২ জঙ্গী বিমান সমস্ত আফগানিস্তানে নিক্ষেপ করে নি। তবুও ঐ পর্বতরাজিতে আল-কায়দা আর কিছুসংখ্যক তালেবান যোদ্ধারা আত্ম সমর্পণের আহ্বান উপেক্ষা করে পূর্বজোটের আক্রমণকেও প্রতিহত করে চলেছে। এখানেই ওসামা বিন লাদেনের শেষ ঘাঁটি বলে অনুমান করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ওসামা বিন লাদেন এখান থেকে ২০ মাইল পূর্বে পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে পলায়ন করে সাময়িক ভাবে আত্মগোপন করতে পারে। আর এ সন্দেহেই পাকিস্তান তার সীমান্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে তোড়াবোড়াই বোধ হয় ওসামার শেষ রণক্ষেত্র। ওসামার শেষ কিভাবে হবে তা নিয়েও অনেক খবর বের হচ্ছে। ওসামার নিকট যে কয়টি পথ খোলা রয়েছে তার মধ্যে একটি স্বেচ্ছায় ধরা দেয়া যা হয়ত টেলিভিশনের সামনে করতে চাইবে। দ্বিতীয়টি হবে নিজের সহচর এবং পুত্রদের হাতে মৃত্যুবরণ পুনরায় ভিডিওতে ধারণ করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে হয়ত মৃত্যুর পূর্বে তার নিজের নীতিগত বিশ্বাস সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য রেখে যাবে যা তার অনুসারীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আর এটা আমেরিকা হতে দিতে চায়না। তাই আমেরিকা চাইছে তাকে তোড়াবোড়াতেই নিধন করা হোক।

www.nagorikpathagar.org

তোড়াবোড়াতে যে সব গুহার কথা বলা হচ্ছে এগুলো সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময়ে এমন সুরম্যভাবে তৈরী যার প্রতিটি গুহার সাথে রয়েছে সংযোগ আর সংযোগগুলো এত চওড়া যে, একটি গাড়ী অনায়াসে চলে যেতে পারে। এসব গুহায় প্রায় পাঁচতলা সমান কোষে ভাগ করা রয়েছে। যার ভেতরে যুদ্ধের উপকরণ থেকে শুরু করে কয়েক বছরের রশদও জমা রাখা যায়। তাছাড়াও রয়েছে বৈদ্যুতিক আলো দেবার জন্যে জেনারেটর, পানির ব্যবস্থা। এক কথায় সয়ং সম্পূর্ণ হোটেল। এগুলো তৈরী শুরু করা হয়েছিল সি আই এ প্রদত্ত অর্থে পরে ওসামা বিন লাদেন ১৯৮৬ সনের দিকে নিজের নির্মাণ কোম্পানীর ভারী যন্ত্রপাতি এনে নিজস্ব অর্থে এগুলোকে আরও বৃহৎ আকারের করে তোলে। এগুলো এত সুদৃঢ় আর মজবুত যে, মাসের পর মাস শুধুমাত্র বোমা বর্ষণে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ এলাকাই ছিল সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদদের ট্রেনিং থেকে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধের সূচনাস্থল। একমাত্র আই এস আই 'এর কাছেই রয়েছে এসব গুহার বিশদ বিবরণ।

পেন্টাগন ভাল করেই জানে যে, এ দূর্গকে শুধুমাত্র প্রচলিত বোমা দ্বারা ধ্বংস করা যাবেনা। তবে এখানে আমেরিকার স্পেশাল ফোর্সও নিয়োগ করতে চাইছে না। কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে এধরনের টানেল এবং গুহার যুদ্ধে প্রচুর আমেরিক্কান সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে। ঐতিহাসিক শিক্ষা থেকে পেন্টাগন তৈরী করেছে এক নতুন ধরনের 'বোমা' যার নাম 'বেরিকথারমাল বোম্ব' (Baricthermal Bomb)। এ বোমার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হচ্ছে যে, এ বোমা বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে যে প্রচণ্ড তাপ এবং বাতাসে চাপের সৃষ্টি হবে তাতে ঐ স্থানের অক্সিজেন টেনে বের করে আনবে। এতে ঐ বোমার আওতায় জীবন্ত প্রাণীর অক্সিজেন টেনে নিয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটাবে। এসব বোমা গুহার ভেতরে ছাড়লে অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সকল প্রাণীর শ্বাসরোধ করে হয় বাইরে বেরুতে বাধ্য করবে অথবা মৃত্যু ঘটাবে। এটা অনেকটা নিষিদ্ধ থারমাল পারমাণবিক বোমার সস্তা সংস্করণ বলে মনে হয়। এসবের ব্যবহার কতখানি মানবিক তা বিশ্ব বিবেকই বলতে পারে।

ওসামা বিন লাদেনের উপরে রয়েছে পঁচিশ মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার। তবুও এখন পর্যন্ত তাকে ধরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেছে বলে শোনা যায় নি। ওসামা বিন লাদেনের পরিণতি সহজেই বোধগম্য। তবে মৃত্যুতে যাতে ওসামা

www.nagorikpathagar.org

বিন লাদেন মুসলমান কট্টরবাদীদের নিকট মহানায়ক বা কিংবদন্তীতে পরিণত হতে না পারে তার জন্যে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা জালালাবাদ থেকে উদ্ধারকৃত বলে প্রচারিত একটি ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে ওসামার নিজের মুখে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলায় তার সম্মতি ছিল বলে বলতে স্পষ্ট শোনা যাবে এমনটি সমস্ত বিশ্বের জন্যে প্রচার করবে। এর মাধ্যমে ওয়াশিংটন সমগ্রবিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ওসামা বিন লাদেন যে নেহায়তই একজন সন্ত্রাসী ছিল তার প্রমাণ করে মৃত্যুকে এক সন্ত্রাসীর পরিণতি বলে প্রচার করবার প্রয়াস করবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন খবরে প্রকাশ যে, ওসামা তার মৃত্যুর দৃশ্য ধারণ করে আল-জাজিরা (TV) চ্যালেনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচারের সকল নির্দেশই দিয়ে রেখেছে। তার মতে, মৃত্যু যেন মরণেও তাকে মহিমান্বিত করে রাখে।

বিগত দু'দশকের উপরে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলেছে কিন্তু এ যুদ্ধ আফগানদের দ্বারা সূচিত হয় নি। প্রতিবারই এসব যুদ্ধে কোন না কোন পক্ষে আফগানিস্তানের বাইরের শক্তি এতে যোগ দিয়েছে। কখন কখন কেন কার উদ্দেশ্যে আফগানরা লড়ছে তা সাধারণ আফগানরা অনেক সময়েই বুঝতেও পারে নি। এসব যুদ্ধ হয়েছে বহিঃশক্তির নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থে আর এসব স্বার্থের যুদ্ধে আফগানরা ব্যবহৃত হয়েছে দাবার ঘুঁটির মত। জন্ম দিয়েছে এমন পরিস্থিতির যেখানে ওসামা বিন লাদেন আর তালেবানদের মত শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার ক্রমেই এরাই হয়ে উঠে প্রতিপক্ষ, হয়ে উঠে সন্ত্রাসী আর অপাংক্তেয়। আজ বিশ্বের দরবারে আফগানিস্তানকে বলা হচ্ছে একটি 'অকৃতকার্য রাষ্ট্র' (a failing state) অথচ এদেশের ইতিহাস পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাস থেকে অধিক প্রাচীন আর সমৃদ্ধ। আফগানিস্তানের আজকের সংকটের উৎস ইসলামী কট্টরবাদ কিন্তু ধর্মপ্রাণ আফগানরা কোনদিনই কট্টরবাদী বলে পরিচিত ছিলনা। এ নতুন পরিচয় পায় ১৯৭৯-৮৯ সময়ে।

ইসলাম ধর্মের ঊষালগ্নে এ ধর্মের জন্মস্থান আরবের মক্কা আর মদীনা শরিফের বাইরে যে সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয় তার মধ্যে আফগানিস্তান অন্যতম। আফগানিস্তানে ইসলাম প্রচার শুরু হয় সপ্তম শতকে। সে থেকে ক্রমেই এদেশে এ ধর্ম দ্রুত প্রসারিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতেও আফগানিস্তান ধর্মীয় অনুভূতির দিক দিয়ে সর্বাগ্রে।

www.nagorikpathagar.org

শত শত বছর থেকেই আফগানদের জীবন ধারণ আর সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দুতেই পরিণত হয়েছে ইসলাম ধর্ম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সহ ধর্মীয় সমস্ত আচরণই নিষ্ঠার সাথে আফগানরা পালন করে। এ অনুভূতিই আজ পর্যন্ত বহু উপজাতিক দেশকে একত্রিত করে রেখেছে। বিগত বছরগুলোতে উপজাতীয় আর গোত্রীয় কোন্দলের মধ্যেও আফগানরা কখনই গোত্রীয় ভিত্তিতে দেশ ভাগ করতে চায় নি। আর তা হলে আজ আফগানিস্তান অন্ততঃ উত্তর দক্ষিণে ভাগ হয়ে যেত। এ ধর্মীয় অনুভূতির কারণে ব্রিটিশ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যরা এদেশে টিকতে পারে নি।

ধর্ম আফগান সমাজের সকলকে অভিভূত করে। রাস্তার গরীব থেকে শুরু করে বাদশাহ পর্যন্ত ধর্মীয় আচরণগুলোকে নিয়মিত পালন করে। এমনকি বর্তমানে রোমে নির্বাসিত বাদশাহ জহির শাহকে সাক্ষাৎকারের মাঝে উঠে গিয়ে সবার অজ্ঞাতে নামাজ আদায় করতে দেখা গেছে। এসব ধর্মীয় আচার আচরণ থেকে সোসালিস্ট কমিউনিস্টরাও বাদ যায় নি। সোসালিস্ট প্রেসিডেন্ট নুর মোহাম্মদ তারাকি হতে নজিবুল্লাহ পর্যন্ত সবাই অত্যন্ত নিবেদিত ধার্মিক বলে পরিচিত ছিল। যুদ্ধের মাঠেও নামাজের ওয়াক্তে যুদ্ধ বাদ দিয়ে নামাজ পড়বার দৃশ্য এখন পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে অহরহ দেখা যায়। এত সবের মধ্যেও আফগানরা কখনই ধর্মান্ধ ছিলনা। আফগাননিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু হিন্দু শিখ আর সামান্য সংখ্যক ইহুদীও ছিল। এরা ১৯৯২ সন পর্যন্ত আফগানিস্তানে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট অবদান রাখে। এরা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা নির্যাতিত হয় নি। অতীতে আন্তগোষ্ঠী সংঘর্ষ কখনই ধর্মের বিভেদকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় নি।

এতসবের মধ্যে আফগানরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কখনই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্যের উপরে চাপায় নি। উদাহরণ স্বরূপ, নামাজের ওয়াক্ত হলে পাশে দাঁড়ানো আফগান নিজের নামাজ আদায়ের সময়ে অন্য কাউকে নামাজ আদায় করবার ব্যাপারটি স্মরণও করায় না। এতখানি ধর্মীয় উদার আফগান সমাজে হঠাৎ করে ধর্মীয় কট্টরবাদের দিকে ঝুঁকে যাবার কারণটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ তালেবানদের সাথে ধর্মীয় কট্টরবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রায় আশিভাগ আফগান সুন্নী হানাফি সম্প্রদায়ের। এ সম্প্রদায় সুন্নীদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে উদারপন্থী বলে বিবেচিত। এর পরে রয়েছে শিয়াপন্থীরা, রয়েছে আগাখানী ইসমাইলী আরও রয়েছে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক শিখ, হিন্দু আর বোখারার ইয়াহুদী। ১৯২৫ এর পর থেকে আফগানিস্তানে কখনই সরকারীভাবে ধর্মকে বা ধর্মীয় অনুভূতি কখনই ব্যবহৃত হয় নি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলোতেই প্রচুর ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করলেও এরা কখনই ধর্মীয় কট্টরবাদকে বেছে নেয় নি। মাদ্রাসা শেষ করে বহু আফগান কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রীও অর্জন করেছে।

১৯২৫ সনে বাদশাহ আমানউল্লাহ প্রথমে আফগান সরকারের সংস্করণের মধ্য দিয়ে শরিয়া আইন বাতিল করে আধুনিক সিভিল কোড চালু করে। রাষ্ট্রই ট্রেনিং দিয়ে ওলেমা থেকে বিচারের জন্যে কাজীদের বহাল করে। আর এর জন্যেই ১৯৬৪ সনে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সিভিল কোড আর প্রচলিত শরিয়া আইনকে একত্রিত করবার জন্যে শরিয়া ফ্যাকাল্টি (বিভাগ) খোলা হয়। এই বিভাগের প্রথমদিকের এক ছাত্র মুসা সফিক বাদশাহ জহির শাহের শেষ প্রধানমন্ত্রী ছিল। ১৯৭৩ সনে জেনারেল দাউদ জহির শাহের সাথে মুসা সফিককেও উৎখাত করে। মুসা সফিক প্রথমে মাদ্রাসা থেকে পাশ করবার পর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়া বিভাগের ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করবার পর আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রীও অর্জন করেছিল। ১৯৭৯ সনে মুসা সফিককে পিডিপিএ সরকার হত্যা করে। মুসা সফিক আজও আফগানিস্তানে উদারপন্থী এবং বুদ্ধিজীবীদের নিকট সমাদৃত।

এতসব ধর্মীয় আচার আচরণ আর অনুভূতির মধ্যেও ১৯৭৯ সনে জেহাদের শুরুতে কোন নাম করা ওলেমা বা ধর্মীয় গুরুরা কট্টরবাদী বলে পরিচিত মুজাহিদী গোষ্ঠীগুলোর সাথে যোগ দেয় নি; বরং এসব বিখ্যাত ওলেমারা মধ্যমপন্থী দলগুলোতেই যোগ দিয়েছিল বেশী। এদের মধ্যে মৌলভী ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামী অন্যতম। কিন্তু এসব দলই ১৯৭৯ সনে শুরু হওয়া 'জেহাদে' সি আই এ এবং আই এস আই দ্বারা অবহেলিত হয়।

আফগানিস্তানে ইসলামকে কট্টরবাদীদের হাতে তুলে দেবার পেছনে সি আই এ আর আই এস আই এদু'টি সংস্থাই দায়ী। আর ই দু'সংস্থার পেছনে যে সব মুসলিম প্রধান দেশের নেতাদের নাম জড়িত রয়েছে তারা হল জিয়াউল

www.nagorikpathagar.org

হক, বাদশাহ ফাহাদ আর আনোয়ার সাদাত। সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে সৌদী আরব ওয়াহাবী আন্দোলনকে আফগানিস্তানে প্রাধান্য দিয়েছে আর তাই আব্দুল রসুল সাইয়াফের মত সৌদী আরবে বসবাসরত আফগান পশতুনকে দিয়ে ওয়াহাবী গরিষ্ঠ মুজাহিদ দল ইত্তেহা-ই -ইসলামী এর মত কট্টরপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। গত দশ বছরের সময়ের মধ্যে এ ওয়াহাবী আন্দোলন বেশ শক্তি সঞ্চার করে। এ ওয়াবী আন্দোলনকে সাধারণ আফগানরা সহজভাবে নেয় নি কারণ তাদের মতে এ আন্দোলন আফগানদের উপরে কৌশল চাপনোর প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। এ কারণে সৌদী সরকার প্রচুর অর্থ খরচ করেছে। উল্ল্যখ্য, ওসামা বিন লাদেন এবং তার সৌদী অনুগামীরা ওয়াহিবী সম্প্রদায়ভুক্ত।

অন্যদিকে সি আই এবং আই এস আই পেশাওয়ারে সাত বড় মুজাহিদ দল আর তেহরানের ছোট মুজাহিদ দলগুলো থেকে প্রচণ্ড কট্টরবাদ মুসলমান বলে পরিচিত দুটি দলকেই পক্ষপাতিত্ব করেছিল সবচেয়ে বেশী। এর একটি গুলবদিন হিকমতইয়ারের হিজব-ই-ইসলামী আর আরেকটি আহমেদ শাহ মাসুদের জামাত-ই- ইসলামী। প্রসঙ্গত জামাতের আরেক নেতা হল বোরহানউদ্দিন রাব্বানী। এ দুজনই ১৯৭৫ সনে আফগানিস্তান থেকে মস্কোপন্থী সরকারের বিরোধিতার কারণে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। এরাই ছিল পাকিস্তানে আফগান মুজাহিদ সংগঠনগুলোর পথিকৃত। জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলের পরই জিয়া এ দু'দলকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া শুরু করে। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের অতীত শাসকদের মধ্যে জিয়াই ছিল গোঁড়াপন্থী মুসলমান। জিয়ার আমলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মীয় কট্টরবাদীদের প্রাধান্য দেয়া হয় যার রাহুচক্র থেকে আজও বের হতে পারছেনা। জিয়ার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে পুরোদস্তর ইসলামিক শাসন কায়েম করা।[১]

সি আই এ আর আই এস আই কট্টরবাদকে প্রশ্রয় দেবার কারণেই হিকমতইয়ার আর মাসুদের শক্তি আর জনবলে সমৃদ্ধ হতে থাকে। অবশ্য পরের দিকে মাসুদ পাকিস্তানের সাথে মত বিরোধের কারণে আলাদা হয়ে যাওয়াতে একমাত্র হিকমতইয়ারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে যায়।

আফগান মুজাহিদ গোষ্ঠীর দুই দিকপাল আহমেদ শাহ মাসুদ আর হিকমতইয়ার নিজেরা উচ্চশিক্ষিত হলেও রাজনীতিতে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার

১। ১৯৮৮ সনে জিয়াউল হকের সাথে লেখকের সাক্ষৎকার ও কথোপকথনে থেকে।

www.nagorikpathagar.org

করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এরা পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামের থেকে প্রভাবিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলাম মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে অনুপ্রাণিত একটি ধর্মভিত্তিক দল। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হাসান বান্না (১৯০৬-১৯৪৯) আর জামাত-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নেতা মৌলনা আবুল আলা মৌদুদী (১৯০৩-১৯৭৮) সমসায়িক ছিল।

আজ আফগানিস্তান সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে জর্জড়িত হয়ে পড়েছে। বিগত দু'দশক ধরে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বদৌলতে আফগানিস্তানে প্রবেশ করানো হয়েছে ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদ। যুক্ত হয়েছে কট্টরবাদ ইসলামের। তালেবান শক্তির উত্থান ছিল সি আই এ আর আই এস আই সূচিত ধর্মীয় যুদ্ধ 'জেহাদের' প্রথম পর্ব। এর আরেক পর্ব হল সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় কট্টবাদের উত্থান। এ উত্থান শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি আরও বিশাল। এরই প্রেক্ষিতে বলকান অঞ্চলে চলেছিল বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম 'এথনিক ক্লিনসিং' যা এখন চলছে চেচনিয়াতে। আর সূচনার অপেক্ষায় রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইন বলে ভূখণ্ডে। আশির দশকে যে জেহাদের সূচনা আমেরিকা করেছিল তার মধ্যেই জন্ম দিয়েছিল তালেবান নামক জগদ্দল পাথরের। সেটাকে সরাতে গিয়ে ইসলামী বিশ্বের জন্যে যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হবে।

আফগানিস্তান নামক ভূখণ্ডটিতে বিগত দিনগুলোতে প্রচুর রক্ত ঝরেছে। কেন ঝরেছে এর জবাব আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোই দিতে পারবে। বর্তমানে আফগানিস্তানে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে সে সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে পুরাতন অভিজ্ঞতার। কাজেই শুধু আফগানিস্তানই নয় সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী আফগানিস্তানের এ নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে নতুন যাত্রার কামনা করছে। আফগানিস্তানে এ নতুন প্রজন্মের নেতারা ভাল করেই জানে যে, তালেবানদের উত্থান আফগানিস্তানের স্বীয় স্বার্থে হয় নি হয়েছে আমেরিকা আর পশ্চিমাদের স্বার্থে। তাই আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ এসব নেতাদেরই নির্ধারণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

শেষের কথা

'পৃথিবী কি সত্যই বদলে যাবে?'

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এ নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলা এবং এতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ হামলা যে কারণেই করা হোক না কেন এধরনের অমানবেতর কর্মকাণ্ড কখনই কোন মহৎ উদ্দেশ্যে হতে পারেনা। এর পেছনের কারণগুলো যতই ভাবাবেগের জন্মদিকনা কেন এ সন্ত্রাসীকে কিছুতেই সমর্থন দেয়া যায়না। কাজেই পৃথিবীর কোন দেশই সমর্থন দেয় নি।

আমেরিকা প্রথমে ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংস্থা আল-কায়দাকে সন্দেহ করেছিল এবং এর কয়েকদিন পরেই এ সংস্থাকে নিঃসন্দেহে দায়ী করেছে। কাজেই আফগানিস্তানের কাছে ওসামাকে হস্তান্তর করবার দাবীর বিপরীতে প্রমাণ চাইলে আমেরিকা তালেবানদেরকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রমেই আল-কায়দার বদলে তালেবান হয়ে উঠে প্রধান শত্রু আর আফগানিস্তান পুনরায় হয়ে উঠে আন্তর্জাতিক রণক্ষেত্র। আফগানরা বিগত একদশকের সোভিয়েত দখল আর গৃহযুদ্ধের খেসারত দিয়ে যাচ্ছিল এবং এ খেসারত দেয়া শেষ হবার আগেই বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আফগানিস্তানে 'ভিন্ন ধরনের' যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৎকালীন শীতল যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলো আমেরিকার নেতৃত্বে এক হয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ করে পাকিস্তানের সমর্থনে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এ জেহাদের ফসল স্বরূপ একদিকে যেমন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে ছিল অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপ মুক্ত হয় তথাকথিত কম্যুনিস্ট, সোসালিস্ট এবং 'গডলেস' সোসালিজম ও কম্যুনিজমের নাগপাশ থেকে। জয়জয়কার হয় পুঁজিবাদী পৃথিবীর। পৃথিবী পুনরায় অজান্তে

www.nagorikpathagar.org

শৃঙ্খলিত হয় একক বিশ্ব শক্তির কাছে। তাই আজ বিশ্ব শুনতে পায় 'হয় আমাদের সাথে নয় তাদের সাথে' এ ধরনের উক্তি, যার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এক ধরনের ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ।

এ একক পৃথিবী ক্রমেই স্বৈরাচারের দিকে চলে যাচ্ছে। পুনঃজন্ম দিচ্ছে একদা পুঁজিবাদী বিশ্বের ফ্রাঙ্কনস্টাইনের দৈত্য। পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম প্রেম ১৯৭৯-৮৯ পর্যন্ত জন্ম দিয়েছে শতের বেশী জেহাদী সংস্থার। সেগুলোকে আজ 'ইসলামিক সন্ত্রাস' বা 'ইসলামিক টেরোরিজম' বলে আখ্যায়িত করে পৃথিবী পশ্চিমা বিশ্বের তত্ত্ব অনুযায়ী 'সভ্যতার সংঘাতের' দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসব জেহাদী গ্রুপ নিজেদের দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিব্রত। অভিযোগ করছে আমেরিকার দ্বিমুখো নীতির। "আমেরিকা একদিকে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার কথা বললেও অনেক মুসলিম দেশগুলোতে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র নেই, রয়েছে তাদেরই (আমেরিকা) পছন্দসই গণতন্ত্র। আর এসব সরকারের পেছনে রয়েছে গণতান্ত্রিক আমেরিকার নৈতিক এবং আর্থিক সমর্থন।"

অন্যদিকে আমেরিকা স্বাধীনতার কথা বললেও পৃথিবীর অনেকখানেই স্বাধীনতার যুদ্ধ বছরের পর বছর চলছে আর এসব জায়গায় নিধন হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের লোক যাকে পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা বলছে 'এথনিক ক্লিনসিং।' এ 'এথনিক ক্লিনসিং' চলছে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে প্যালেসটাইনে, কাশ্মীরে আর এখন চেচনিয়াতে। এসব প্রত্যেক জায়গাতেই আমেরিকার নীতি মোটেও স্পষ্ট নয়। চেচনিয়াতে যতটুকুই বা আমেরিকার উদ্বেগ দেখিয়েছিল তা হয়ত ভবিষ্যতে আর দেখাবেনা। আমেরিকা অন্ততঃ প্যালেস্টাইন সমস্যা তার শক্তি আর প্রভাবের মধ্যেমে সমাধান করতে পারত বা পারে বলে পৃথিবীর বেশীরভাগ মুসলিম দেশগুলো বিশ্বাস করে। মধ্যপ্রাচ্যের এ সমস্যাকে ঘিরে ইসরায়েলের ঔদ্ধত্যের কারণে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা বিদ্বেষ চরমে উঠেছে। আর এ ঘৃণার বহিঃপ্রকাশে প্রাণ দিতে হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক নেতাদের। একের অধিক নেতৃবৃন্দ আততায়ীর আঘাতে জীবনাবসান হয়েছে। জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ; ইরাকের বাদশাহ ফয়সাল, মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ম্যানেহাম বেগিন প্রমুখ মাধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পক্ষে বিপক্ষের অবস্থানের কারণে জীবন দিয়েছে। এ একই সমস্যাকে ঘিরে জন্ম দিয়েছে হামাস, পি এফ এল পি ও আল-কায়দার মত বহুল আলোচিত বিতর্কিত সন্ত্রাসী সংগঠনের তেমনি জন্ম দিয়েছে বহু সন্ত্রাসী বলে পরিচিত নামের। আবু নিধাল, আব্দুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

আজ্জম, আবু মুগনিয়া এবং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী বলে পরিচিত ওসামা বিন লাদেন। মাত্র কয়েকটি নাম।

একক বিশ্বব্যবস্থা আর উন্মুক্ত বাজারের চাপে, সম্পদের অসম ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর বড় অর্থনীতির নিকট দুর্বল অর্থনীতিগুলো জিম্মি হয়ে পড়েছে। ধনী দেশগুলোর নানা ধরনের চাপে পড়ে গরীব দেশগুলোর আশাতীত অর্থনৈতিক মুক্তি আসে নি। বহিঃসম্পদের নির্ভরশীলতা কমবার বদলে ঋণের বোঝা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর বিপরীতে ক্ষুদ্র দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব বিশ্বের পুঁজিবাদ ব্যবস্থার নিকট লগ্নী হয়ে রয়েছে।

বিগত শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে আফগানিস্তানে ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিচালিত জেহাদের ফল স্বরূপ সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের পুনঃরুত্থান ঘটেছে। এর ধাক্কা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত দেশগুলোও দূরে থাকতে পারে নি। আমেরিকার মত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশেও দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমাদের এতদঅঞ্চলে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের উত্থান উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক অভিযান ‘এনডিওরিং ফ্রিডম’ (Enduring Freedom) এহেন বিশ্ব পরিস্থিতিতে অদূর ভবিষ্যতে আফগানিস্তান তথা মধ্যএশিয়ার কতখানি ফ্রিডম বা স্বাধীনতা থাকবে তা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

সংযুক্তি-১

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

DECREE OF AMIR-UL-MUMINEEN BANNING THE CULTIVATION OF CANNABIS AND ORDERING THE DESTRUCTION OF ANY PROCESSING PLANTS WITHIN AFGHANISTAN

Date: 6/5/1420 AH

To all military and civilian officials:

Peace be upon you all.

The use of cannabis is something hated and forbidden by Islamic law and harmful to mental and physical health.

In accordance with the prohibition of this repulsive act, we instructed the Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice to destroy all fields, harvested crops, and processing plants in the country.

We request that you cooperate fully with the Ministry in performing this Islamic and humanitarian duty, and that you help them to overcome any obstacles that they might face.

Wassalaam,

Servant of Islam
Amir-ul-Mumineen
Mullah Muhammad Umar Mujahid

www.nagorikpathagar.org

সংযুক্তি-১

তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের মাদক বিরোধী ফতোয়া (ক)

বাংলা অনুবাদ

আল্লাহ্‌তায়ালা যিনি সর্বময় ক্ষমাশীল, দয়াবান।
আমীরুল মোমেনীনের ফতোয়া।
মাদকদ্রব্য চাষ নিষিদ্ধকরণ এবং সমগ্র আফগানিস্তানে মাদক পরিশোধনাগারগুলো ধ্বংস করণ।
তাং : ৬ / ৫ / ১৪২০ হিজরি।

সমস্ত সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ঃ
সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
ইসলামের বিধানে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ। এর ব্যবহার মানব সন্তানের মানসিক এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।
এ দ্রব্যের উৎপাদন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে ন্যায় নীতির উন্নয়ন এবং অন্যায় প্রতিরোধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দেশের মজুদ উৎপাদিত মাদকদ্রব্য এবং পরিশোধনাগারগুলোকে ধ্বংস করবার জন্যে আমরা নির্দেশ দিয়েছি।
আমরা আপনাদের সকলকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ মানবিক এবং ইসলাম বিরোধী সমস্যা সমাধানে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতায় আমরা এ ব্যাপারে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারব।

ওয়াসাল্লাম

ইসলামের খেমতদগার
আমীরুল মোমেনীন
মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ

সূত্র : তালেবান মাসিক পত্রিকা : দি ইসলামিক আমিরাত : আগস্ট ২০০০ জামাদিউল আলা ১৪২১-১

www.nagorikpathagar.org

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful

DECREE OF AMIR-UL-MUMINEEN BANNING THE CULTIVATION OF OPIUM POPPY IN AFGHANISTAN

Number: 19
Date: 26/4/1421 AH

Article One:

-The cultivation of opium poppy is hereby forbidden in all areas of Afghanistan.

-Anyone violating this statute will be punished accordingly

Article Two:

-Officials of the Islamic Emirate are responsible for implementing this decree in the regions under their authority and making the necessary arrangements for that.

Wassalaam,

Servant of Islam
Amir-ul-Mumineen
Mullah Muhammad Umar Mujahid

www.nagorikpathagar.org

সংযুক্তি-২

তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের মাদক বিরোধী ফতোয়া (খ)

বাংলা অনুবাদ

আল্লাহ্‌তায়ালা যিনি সর্বময় ক্ষমাশীল, দয়াবান।
আমীরুল মোমেনীনের ফতোয়া।
সমগ্র আফগানিস্তানে আফিম, পপি উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ।
নাম্বার - ১৯
তাং : ২৬ / ৪ / ১৪২১ হিজরি।

আর্টিক্যাল এক :
- সমগ্র আফগানিস্তানে আফিমের চাষ এখন হতে নিষিদ্ধ করা হল।
- এ আদেশ লংঘনকারীকে যথাযথ কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

আর্টিক্যাল দুই :
- ইসলামিক আমিরাতের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এ আদেশকে তাদের নিজস্ব আওতাধীন এলাকায় প্রয়োগ করবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যয় নিতে হবে।

ওয়াসাল্লাম

ইসলামের খেদমতগার
আমীরুল মোমেনীন
মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ

সূত্র : তালেবান মাসিক পত্রিকা : দি ইসলামিক আমিরাত : আগস্ট ২০০০ জামাদিউল আলা ১৪২১-১

www.nagorikpathagar.org

BIBLIOGRAPHY

Ahmed Rashid : Taliban : Islam, Oil and the New Greatgame in Central Asia. I. B. Tausis Publications London & New York.

Barnett R. Rubin : Women & Pipeline; Afghanistans Proxy War : International Affairs, Washington.

Dixit JN : Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban. Kouak Publishig Pvt. Ltd., New Delhi

Edgar O'Balance : Afghan Wars. 1839-1992 Braorey's, London New York

Yousaf N. Lalljee : Ali The Magnifient Ansariyan Publication. Tehran

Griffin Michael : Reaping the Whirlwind Pluto Press : 2001 London.

Indarjit- Pikhye : ed : Afghanistan: Iran and Iragq Oxford, Lbh Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi.

www.nagorikpathagar.org

John K. Cooley : Unholy Wars:
Pluto Press, London

Larry Collins and Dominigne Laperre :
The Fifth Horseman
Vikas Publications House Ltd.
New Delhi.

Lohbeck, Kurt : Holy War Unholy Victory
Regnesy Inc
Washinglon

Olafcaroe : The pathans Oxford Unversity Press, USA.

The Encyclopedia Bitannica : 1994-2000; 1996-2002

WariKoo K. ed : Centeal Asia
Has- anaud Publications Pvt. Ltd.
New Delhi.

Yousaf Mohommad & Mark Adkin : The Bear Trap,
Afganistan's Untold Story
Leo Coobes, 1992 London.

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org